কুরআনে বর্ণিত আম্বিয়ায়ে কিরামের জীবনকথা

নবীদের সংগ্রামী জীবন

আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম

কুরআনে বর্ণিত আম্বিয়ায়ে কিরামের জীবনকথা

নবীদের সংগ্রামী জীবন

(পূর্ণাঙ্গ)

আলাইহিমুস সলাতু ওয়াস্ সালাম

আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

কুরআনে বর্ণিত আম্বিয়ায়ে কিরামের জীবনকথা

নবীদের সংগ্রামী জীবন (পূর্ণাঙ্গ)

আলাইহিমুস সলাতু ওয়াস্ সালাম

আবদুস শহীদ নাসিম

শ. প্র. ২৯

ISBN : 984-645-021-4

প্রকাশক

শতাব্দী প্রকাশনী

৪৯১/১ মগবাজার ওয়্যারলেস্ রেলগেইট, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৮৩১১৪৫১০, মোবা : ০১৭৫৩৪২২২৯৬

ই-মেইল : shotabdipro@yahoo.com

প্রকাশকাল

প্রথম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

পঞ্চম মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০১২

মুদ্রণ

আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য : ১৬০.০০ টাকা মাত্র

Qurane Bornito Ambia-e-Keramer Jibonkotha **Nabider Songrami Jibon** by Abdus Shaheed Naseem, Published by Shotabdi Prokashoni, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Phone : 8311292, Mob : 01753422296, E-mail: shotabdipro@yahoo.com Dhaka-1217, Ist Print : February 1997, 5th Print: December 2012.

Price : TK. 160.00 only

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
❖	এই বই সম্পর্কে কিছু কথা	০৫
❖	আম্বিয়ায়ে কিরামের জীবন কথা	০৭
১.	প্রথম মানুষ প্রথম নবী আদম আলাইহিস্ সালাম	১১
২.	উচ্চ মর্যাদার নবী ইদ্‌রিস আলাইহিস্ সালাম	২০
৩.	হাজার বছরের সংগ্রামী নূহ আলাইহিস্ সালাম	২৪
৪.	আ'দ জাতির নবী হূদ আলাইহিস্ সালাম	৩৩
৫.	সামুদ জাতির নবী সালেহ্ আলাইহিস্ সালাম	৪১
৬.	অগ্নি পরীক্ষায় বিজয়ী বীর ইবরাহিম আলাইহিস্ সালাম	৪৯
৭.	জর্ডান অঞ্চলের নবী লুত আলাইহিস্ সালাম	৬০
৮.	কুরবানির নবী ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম	৬৫
৯.	ইবরাহিম পুত্র ইসহাক আলাইহিস্ সালাম	৭৩
১০.	ইসরাঈলিদের পিতৃপুরুষ ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম	৭৭
১১.	মিশর শাসক ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম	৮৩
১২.	শুয়াইব আলাইহিস্ সালাম	৯৮
১৩.	ধৈর্যের পাহাড় আইউব আলাইহিস্ সালাম	১০৩
১৪.	যুলকিফ্‌ল আলাইহিস্ সালাম	১০৭
১৫.	মূসা কলিমুল্লাহ আলাইহিস্ সালাম	১০৯
১৬.	হারুণ আলাইহিস্ সালাম	১৫৭
১৭.	সম্রাট নবী দাউদ আলাইহিস্ সালাম	১৫৯
১৮.	বিশ্বের অনন্য সম্রাট সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম	১৬৬
১৯.	ইলিয়াস আলাইহিস্ সালাম	১৭৭
২০.	আলইয়াসা আলাইহিস্ সালাম	১৮২
২১.	মাছওয়ালা নবী ইউনুস আলাইহিস্ সালাম	১৮৪
২২.	যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম	১৯০
২৩.	শহীদ ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস্ সালাম	১৯৪
২৪.	ঈসা রূহুল্লাহ্ আলাইহিস্ সালাম	১৯৯
২৫.	বিশ্বনবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ আলাইহিস্ সলাতু ওয়াস্ সালাম	২১৫
❖	গ্রন্থপঞ্জি	২৪০

রসূলদের পাঠানো হয়েছে কেন?

"আমরা আমাদের রসূলদের স্পষ্ট নিদর্শন ও সঠিক পথের নির্দেশিকাসহ পাঠিয়েছি। আর তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি আল কিতাব এবং পক্ষপাতহীন সুষম জীবন ব্যবস্থা, যাতে করে মানুষ সুবিচার (justice)-এর উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাছাড়া আমরা লোহা অবতীর্ণ করেছি, যার মধ্যে রয়েছে বিরাট শক্তি আর মানুষের জন্য নানা প্রকার কল্যাণ ও উপকারিতা। এটা করা হয়েছে এ জন্য যে, আল্লাহ বাস্তবে জেনে নিতে চান, না দেখেও কারা তাঁকে আর তাঁর রসূলদেরকে সাহায্য করে? নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত শক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী।" সূরা ৫৭ আল হাদিদ ঃ আয়াত ২৫

এই বই সম্পর্কে কিছু কথা

নবী রসূলগণ শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁরা আল্লাহর মনোনীত ও নিযুক্ত। তাঁদের কাছে মহান আল্লাহ অহি পাঠিয়েছেন, কিতাব পাঠিয়েছেন। তাঁরা ছিলেন নিষ্পাপ আদর্শ মানুষ। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে বলছেন।

মহান আল্লাহ আল কুরআনে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ পঁচিশজন নবী রসূলের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁদের অনেকের কথা বার বার উল্লেখ করেছেন। তাঁদের আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ জীবনের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁদের আদর্শ অনুসরণের আহ্বান জানিয়েছেন। তাই নবীদের পথই মানুষের মুক্তির পথ।

আল কুরআনের আলোকে নবীগণের জীবনকথা ও জীবনাদর্শ লেখার বাসনা আমার অনেক দিনের। অবশেষে লেখার কাজে হাত দিলাম। কিশোর ও তরুণদের কথা সামনে রেখেই লেখার কাজ শুরু করেছি। '৯০-এর দশকে 'কিশোর কণ্ঠ' পত্রিকায় জীবনীগুলো ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হয়েছে। অতপর হযরত মুহাম্মদ সা.-এর পূর্বেকার চব্বিশ জন নবীর জীবনী দুই খণ্ডে প্রকাশ হয়।

কিন্তু দুই খণ্ডে প্রকাশ করলে গ্রন্থটি পাঠকগণের জন্যে সহজলভ্য হয়না। এখন তাই পাঠকগণের সুবিধার্থে তিন খণ্ডের পূর্ণাঙ্গ জীবনী একত্র করে এক ভলিউমে প্রকাশ করা হলো। হযরত মুহাম্মদ সা.-এর জীবনী সংক্ষিপ্ত আকারে সংযুক্ত করা হলো। তবে তাঁর জীবনীর উপর আলাদা একটি বইও লেখা হয়েছে। এ বইয়ের ধারাবাহিকতায় লেখা হয়েছে হযরত মুহাম্মদ সা.-এর জীবনীর উপর সে বইটি। সে বইটির শিরোনাম: বিশ্ব নবীর শ্রেষ্ঠ জীবন।

হ্যাঁ, যে কথাটি বলছিলাম, নবীগণের জীবনী লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা কুরআনের আলোকে। কুরআনের আলোকেই লিখেছি। তবে কয়েকজন নবীর জীবনকথা কুরআনে একেবারে

সংক্ষেপে আলোচনা হয়েছে। তাঁদের ক্ষেত্রে হাদিস, তাফসির ও ইতিহাস গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি।

আমরা এ গ্রন্থে নবীগণের ক্রমতালিকা সাজিয়েছি কুরআন, হাদিস ও ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র অনুযায়ী তাঁদের আগমন ও জীবনকালের ক্রমধারার ভিত্তিতে।

নবীগণের জীবনী লেখার ক্ষেত্রে রংঢং লাগিয়ে গল্প কাহিনী লেখার চেষ্টা করা হয়নি। কুরআনের আলোকে নিরেট জীবন কথাই লেখা হয়েছে। তাই এ বইতে কাহিনীগত রস পরিবেশনের পরিবর্তে জীবনাদর্শ পরিবেশনের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

বস্তুনিষ্ঠ জীবনকথা জানতে যারা আগ্রহী, বিশেষ করে কিশোর ও তরুণ সমাজের কাছে এ বই আশা করি অনেক ভালো লাগবে। কারণ এতে তারা কেবল ইতিহাসই জানবেনা, সেই সাথে নিজেদের জীবনাদর্শ এবং শ্রেষ্ঠ জীবন গড়ার ও জীবন চলার পথও খুঁজে পাবে।

এ বই পড়ে নবীগণের আদর্শে যদি উদ্বুদ্ধ হয় আমার দেশের কিশোর-তরুণ আর যুবকরা, তবেই পূর্ণ হবে আমার দিলের তামান্না, মনের স্বপ্ন সাধ। প্রভু! তুমি এই গ্রন্থটিকে কবুল করো। আমিন॥

আবদুস শহীদ নাসিম

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আম্বিয়ায়ে কিরামের জীবন কথা

মানুষকে সঠিক পথ দেখাবার জন্যে মহান আল্লাহ যুগে যুগে অনেক নবী-রসূল নিযুক্ত করেছেন। নবীরা মানুষ ছিলেন।[১] তবে তাঁদেরকে নবী নিযুক্ত করে তাঁদের কাছে আল্লাহ নিজের বাণী পাঠিয়েছেন। তাদের তিনি সব কিছু সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান করেছেন।

সুতরাং তাঁরা একদিকে ছিলেন সত্য ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। অন্যদিকে ছিলেন উন্নত চরিত্র ও নিষ্পাপ জীবনের অধিকারী। ছিলেন আদর্শ মানুষ। তাঁরা অহির মাধ্যমে আল্লাহর বাণী লাভ করতেন। তাঁরা কখনো আল্লাহর হুকুম অমান্য করতেন না।

আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর দাসত্ব করার জন্যে। তাঁর হুকুম পালন করার জন্যে। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করার জন্যে। সেই সাথে পৃথিবীটাকে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালনা করার জন্যে। এই হলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ নবীদের পাঠিয়েছেন মানুষকে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানিয়ে দিতে এবং কথাটা বার বার তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে।

মহান আল্লাহ যাঁদের নবী নিযুক্ত করেছেন, তাঁরা সারা জীবন মানুষকে আল্লাহর পথে ডেকেছেন। মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে বলেছেন। নফসের তাড়না এবং শয়তানের পথ পরিহার করে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলতে তাদের অনুপ্রাণিত করেছেন।

নবীরা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষ যদি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তাঁর সন্তুষ্টির পথে জীবন যাপন করে, তবে মৃত্যুর পর যে চিরন্তন জীবন আছে, সেখানে তারা মহাসুখের জান্নাত লাভ করবে। কিন্তু যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করবেন। মৃত্যুর পরের জীবনে তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি আর শাস্তি।

নবী শব্দের অর্থ 'সংবাদ বাহক'। রসূল শব্দের অর্থ 'বাণী বাহক'। নবী রসূলগণ আল্লাহর বাণী এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সঠিক পথের সংবাদ মানুষের কাছে পৌছে দিয়েছেন বলেই তাঁদের নবী এবং রসূল বলা হয়।

সকল রসূলই নবী ছিলেন। তবে সকল নবী রসূল ছিলেন না। অনেক নবীর কাছে আল্লাহ তা'আলা শুধু অহি পাঠিয়েছেন। আবার অনেক নবীর কাছে অহি এবং কিতাবও পাঠিয়েছেন। যাঁরা সাধারণভাবে অহি লাভ করা ছাড়া কিতাবও লাভ করেছেন, তাঁরাই ছিলেন রসূল।

প্রথম নবী ছিলেন পৃথিবীর প্রথম মানুষ হযরত আদম আলাইহিস সালাম। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর পরে পৃথিবীতে আর কোনো নবী আল্লাহ নিযুক্ত করবেন না।

পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা কতজন মানুষকে নবী নিযুক্ত করেছেন, সেকথা মানুষের জানার উপায় নেই। একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, আল্লাহ তা'আলা এক লক্ষ বিশ হাজার নবী পাঠিয়েছেন। এদের মধ্যে তিনশত পনেরজন ছিলেন রসূল। তবে তাঁদের প্রকৃত সংখ্যা আল্লাহই ভালো জানেন।

আল কুরআনে পঁচিশজন নবীর নাম উল্লেখ হয়েছে। তাঁরা সকলেই রসূল ছিলেন। কুরআনে উল্লেখিত নবী রসূলগণ হলেন ঃ

১. আদম, ২. নূহ, ৩. ইদরিস, ৪. হূদ, ৫. সালেহ, ৬. ইবরাহিম ৭. লুত, ৮. ইসমাঈল, ৯. ইসহাক, ১০. ইয়াকুব, ১১. ইউসুফ, ১২. শুয়াইব, ১৩. আইউব, ১৪. যুল কিফ্ল, ১৫. মূসা, ১৬. হারূণ, ১৭. দাউদ, ১৮. সুলাইমান, ১৯. ইলিয়াস্, ২০. আলইয়াসা, ২১. ইউনুস, ২২. যাকারিয়া, ২৩. ইয়াহ্ইয়া, ২৪. ঈসা, ২৫. মুহাম্মদ (আলাইহিমুস সলাতু ওয়াস্ সালাম)

বাকি নবী রসূলগণের নাম কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি। তবে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তিনি সকল জাতির কাছেই নবী পাঠিয়েছেন এবং প্রতিটি মানব বসতিতেই নবী পাঠিয়েছেন।[২]

নবী রসূলগণের প্রতি অবশ্যি ঈমান আনতে হবে। কুরআনে যে পঁচিশজনের নাম উল্লেখ আছে, তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি পৃথকভাবে ঈমান আনতে হবে। তাঁদের কারো প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ পোষণ করা যাবেনা। আর যেসব নবী রসূলের নাম কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি তাঁদের প্রতি সামগ্রিকভাবে ঈমান আনতে হবে।

সকল নবী একই দীনের বাহক ছিলেন। তাঁরা সকলেই আল্লাহর নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা মানুষকে–

১. এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিয়েছেন।
২. আল্লাহর সাথে কাউকেও শরিক করতে নিষেধ করেছেন।
৩. এক আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব করতে বলেছেন।
৪. আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে বলেছেন।

৫. আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী সমাজ পরিচালনা করতে বলেছেন। সুবিচার করতে বলেছেন।
৬. ঈমানের ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্ব গড়তে ও হানাহানি পরিহার করতে বলেছেন।
৭. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করতে বলেছেন।
৮. জাহান্নাম থেকে বাঁচতে এবং জান্নাতের পথে চলতে বলেছেন।

নবীগণ মানুষকে কল্যাণের পথে ডেকেছেন। কিন্তু মানুষ সব সময় দুনিয়ার অন্ধ মোহে লিপ্ত হয়ে নবীদের বিরোধিতা করেছে। তাঁদের অনেক দুঃখ কষ্ট দিয়েছে। অত্যাচার নির্যাতন করেছে। অনেক নবীকে লোকেরা নিজের মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। আল্লাহর এই মহান নবীগণকে মানুষ হত্যা করার কূট কৌশল করেছে। অগণিত নবীকে তারা হত্যা করেছে। কাউকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছে। কাউকে হত্যা করার জন্যে তারা তাড়া করেছে। কাউকেও হত্যা করার জন্যে বাড়ি ঘেরাও করেছে।

এতো চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও নবীগণ সত্য পথের দাওয়াত দেয়া থেকে কখনো বিরত হননি। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত তাঁরা প্রত্যেকেই মানুষকে সত্য পথে আসার আহ্বান জানিয়ে গেছেন। তাঁরা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সমাজ গড়বার সংগ্রাম করে গেছেন।

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর পরে আর কোনো নবী রসূল আসবেন না। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুসারীদের দায়িত্ব দিয়েছেন মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকবার। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জ্ঞানী লোকেরা নবীর সত্যিকার উত্তরাধিকারী। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব করার, আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করার এবং আল্লাহর বিধান মাফিক পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ার ও পরিচালিত করার দায়িত্ব পালন করবে।

এখন আমাদের কাছে একথা স্পষ্ট হলো যে, পৃথিবীতে মানুষের চলার পথ দু'টি। একটি হলো নবীদের দেখানো পথ। এটিই বিশ্ব জগতের স্রষ্টা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথ। এ পথের প্রতিদান হলো জান্নাত বা বেহেশ্ত।

অপরটি হলো আল্লাহদ্রোহীতার পথ। এটি আল্লাহকে অমান্য করার পথ। আল্লাহর অসন্তুষ্টির পথ। নবীদের অমান্য করার পথ। শয়তানের পথ। আত্মার দাসত্বের পথ। এ পথের পরিণাম হলো জাহান্নাম, চির শাস্তি, চির লাঞ্ছনা, চির অকল্যাণ আর ধ্বংস।

আমাদেরকে চলতে হবে আল্লাহর পথে। চলতে হবে নবীদের পথে। নবীদের দেখানো পথই আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ। নবীদের পথই দুনিয়ার কল্যাণের পথ।

নবীদের পথই জান্নাতের পথ। নবীদের পথ শান্তির পথ।

নবীদের দেখানো পথ সুন্দর পৃথিবী গড়ার পথ।

নবীদের দেখানো পথ আদর্শ মানুষ হবার পথ।

নবীদের পথ উন্নতির পথ, শ্রেষ্ঠত্বের পথ।

তাই আসুন আমরা নবীদের জীবনী পড়ি। তাঁদের আদর্শকে জানি। তাঁদের ভালোবাসি। তাঁদের আদর্শের অনুসরণ করি এবং তাঁদের দেখানো পথে চলি।

---

১. সূরা ১৪ ইবরাহিম ঃ আয়াত ১১। সূরা ১৮ আল কাহাফ ঃ আয়াত ১১০।

২. সূরা ৩৫ ফাতির ঃ আয়াত ২৪। সূরা ১৩ আর রা'আদ ঃ আয়াত ৭।

১

প্রথম মানুষ প্রথম নবী আদম

আলাইহিস্ সালাম

মহাবিশ্ব ও পৃথিবী

এই মহাবিশ্বে রয়েছে লক্ষ কোটি গ্রহ নক্ষত্র। মেঘমুক্ত আকাশে মাথার উপর শূন্যলোকে তাকিয়ে দেখুন, বলুন তো কী দেখতে পান? হ্যাঁ, দিনে প্রচণ্ড তেজদীপ্ত সূর্য। রাতে ঝলমল মিটমিটে তারার মেলা। এই তো আমরা দেখি দিবানিশি। বাপও দেখেছেন। দাদা দেখেছেন। পরদাদা দেখেছেন, পূর্ব পুরুষরা সবাই দেখেছেন। কবে থেকে ওদের শুরু আর কবে যে হবে শেষ, কেউ জানেনা তা। একই পথে, একই নিয়মে ওরা চলছে তো চলছেই। কে ওদের সৃষ্টি করেছেন? আপনি নিশ্চয়ই বলবেন, এক আল্লাহ ছাড়া আবার কে? হ্যাঁ, তিনি গোটা বিশ্ব জগত সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে[১]। ছয়দিনে মানে ছয়টি কালে। তিনিই গোটা বিশ্ব জগতের স্রষ্টা, শাসক ও পরিচালক। তিনিই সমস্ত ক্ষমতার উৎস।

মহাবিশ্বে এই যে লাখো কোটি গ্রহ নক্ষত্র, ওদের আবার ভিন্ন ভিন্ন পরিবার আছে। একেক পরিবারের অনেক অনেক সদস্য আছে। ওদের যে মোট কয়টি পরিবার আছে, আর একেক পরিবারে যে ক'জন সদস্য আছে, সে কথা কেউ বলতে পারবেনা। আমাদের এই পৃথিবীও কিন্তু একটি গ্রহ। একটি নক্ষত্র পরিবারের সদস্য। এবার নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পেরেছেন, মহান আল্লাহর গোটা সৃষ্টিলোকের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশই মাত্র আমাদের এই পৃথিবী।

তিনি এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন মনের মতো সুন্দর করে। সাজিয়েছেন অপরূপ সাজে। এখানে শান্ত সাগর গতিমান। চঞ্চল নদী বহমান। পর্বতমালা শির তুলে উঁকি মারে আকাশে। দিনে সূর্যের আলো। রাতে মিষ্টি হাসি চাঁদের। সবুজের বন। গাছের ছায়া। পাখির কলতান। ফুলের গন্ধ। ফলের সমারোহ। সবকিছু আছে অফুরান। নেই শুধু সেই.......।

প্রতিনিধি পাঠাবার সিদ্ধান্ত

নেই শুধু সেই মানুষ। সেই মানুষ, যার জন্যে এই পৃথিবীর সবকিছু বানিয়েছেন তিনি।[২] তিনি পৃথিবীতে তাঁর নতুন প্রতিনিধি পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। আরো সিদ্ধান্ত নিলেন, মানুষ সৃষ্টি করে তাকেই পৃথিবীতে তাঁর নতুন প্রতিনিধি বানিয়ে

পাঠাবেন। যেই সিদ্ধান্ত সেই কাজ। কে আছে তাঁর সিদ্ধান্ত নাড়াবার? তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের কথা ফেরেশতাদের জানিয়ে দিলেন। বললেন: "হে ফেরেশতারা! পৃথিবী নামের যে গ্রহটি আছে, সেখানে আমি এক নতুন প্রজন্মকে প্রতিনিধি নিয়োগ করবো।"

ঘোষণাটি শুনে তারা আঁৎকে উঠে।

ফেরেশতা কারা? হ্যাঁ তারাও আল্লাহর সৃষ্টি। তাঁর দাস। তাঁর সাম্রাজ্যের একান্ত বিনীত বাধ্যগত কর্মচারী। আল্লাহর নির্দেশে তারা গ্রহ নক্ষত্র পরিচালনা করে। পানি, বাতাস, মেঘমালা পরিচালনা করে। জীবন মৃত্যু দান করে। তাঁরই নির্দেশে আরো করে হাজারো রকমের কাজ। মোট কথা, তারা তাঁর দাস কর্মচারী। দাসত্ব করা ছাড়া তারা আর কিছুই জানেনা, বুঝে না।

তাইতো তারা প্রভুর বক্তব্যে 'প্রতিনিধি' শব্দটি শুনে আঁৎকে উঠে। কারণ, এ শব্দটির মধ্যে 'স্বাধীনতার' গন্ধ আছে। আর স্বাধীনতা পেলে সেচ্ছাচারিতার আশংকা থাকে। তাইতো তারা বলে উঠলো:

"আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যে সেখানকার ব্যবস্থাপনায় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে আর করবে হানাহানি রক্তপাত? আপনার প্রশংসা আর গুণগান করার জন্যে তো আমরাই নিয়োজিত রয়েছি।" (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ৩০)

আল্লাহ তাদের বলে দিলেন: "আমি যা জানি, তোমরা তা জাননা।"[৩]

সৃষ্টি করলেন আদমকে

তারপর কি হলো? তারপর তিনি সৃষ্টি করলেন প্রথম মানুষ। সৃষ্টি করলেন তাঁকে মাটি দিয়ে।[৪] মাটির দেহ তৈরি হয়ে যাবার পর তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন জীবন। তিনি হয়ে গেলেন এক জ্যান্ত মানুষ। আল্লাহ তাঁর নাম দিলেন 'আদম'। তিনি আদমকে শুধু জ্যান্ত মানুষই বানাননি। বরং "খালাকাল ইন্‌সান, আল্লামাহুল বায়ান- তাকে মানুষ বানালেন এবং কথা বলতে শিখালেন।"

আদম পৃথিবীর সব মানুষের পিতা।

জ্ঞানী আদম

তারপর মহান আল্লাহ "আদমকে সব কিছুর নাম শিখালেন।"[৫]

নাম শিখানোর মানে কি? নাম শিখানোর মানে- পরিচয় শিখানো। গুণবৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহার বিধি জানানো। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আদমকে সবকিছুর পরিচয় জানিয়ে দিলেন। জানিয়ে দিলেন ব্যবহার করবার নিয়ম কানুন। প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করবার জন্যে এ শিক্ষা লাভ করার প্রয়োজন ছিলো অপরিহার্য। এবার ফেরেশতাদের ডেকে বললেন:

"তোমরা যে ধারণা করছিলে, তা যদি সঠিক হয়ে থাকে, তবে বলো দেখি এই জিনিসগুলোর নাম!" (সূরা ২ আল বাকারা: আয়াত ৩১)

কী করে বলবে তারা? তাদের তো এগুলো সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই দেয়া হয়নি। তারা বিনীত হয়ে বললো: "প্রভু, ত্রুটিমুক্ত পবিত্র তোমার সত্তা! আমরা তো কিছুই জানিনা। কেবল তুমি যতোটুকু শিখিয়েছো, তাই জানি। সমস্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞতার মালিক তো তুমিই।" (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ৩২)

এবার তিনি আদমকে নির্দেশ দিলেন: "আদম, তুমি ওদের এই জিনিসগুলোর পরিচয় বলে দাও।" আদম আলাইহিস্ সালাম সবগুলো জিনিসের পরিচয় তাদের বলে দিলেন।[৬]

আদমের প্রতি সাজদাবনত হবার হুকুম

এই আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে আসলে ফেরেশতারা যে সন্দেহ করেছিল, তারই জবাব দেয়া হয়েছে। তাদের বুঝিয়ে দেয়া হলো, মানুষকে কেবল ক্ষমতা আর স্বাধীনতাই দেয়া হবে না, বরং তাদের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা প্রয়োগের জন্যে জ্ঞানও দেয়া হবে।

এবার আল্লাহ ফেরেশতাদের হুকুম দিলেন: "আদমের সামনে নত হও।" আল্লাহর নির্দেশে সবাই আদমের সামনে অবনত হলো।[৭]

ইবলিসের কাণ্ড

কিন্তু ইবলিস অবনত হতে অস্বীকার করলো। সে অহংকার করে বললো: "আমি আদমের চাইতে উত্তম। কারণ, তুমি আমাকে আগুন দিয়ে তৈরি করেছো। আর আদমকে তো তৈরি করেছো মাটি দিয়ে।"

- এভাবে ইবলিস তিনটি অমার্জনীয় অপরাধ করে বসলো। সে :

১. আল্লাহর হুকুম অমান্য করলো,

২. অহংকার করলো এবং

৩. নিজেই নিজেকে উত্তম বলে ঘোষণা করলো।

এই তিনটির চাইতে নিকৃষ্ট অসৎগুণ আর হয়না। সুতরাং আল্লাহ তাকে 'অভিশপ্ত শয়তান' বলে আখ্যা দিলেন। বললেন: "তুই এখান থেকে নেমে যা। এখানে থেকে অহংকার করবার কোনো অধিকার তোর নেই। যা, তুই বেরিয়ে যা। এখন থেকে তুই অপমানিত আর লাঞ্ছিতদেরই একজন।"[৯]

এবার সে সমস্ত কল্যাণ ও অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হলো। আর ইবলিস মানেই 'নিরাশ'। কিন্তু সে অহংকার ত্যাগ করলোনা। সে ভাবলো, আদমের কারণেই তো আমি বঞ্চিত আর অভিশপ্ত হয়েছি। সুতরাং আদম আর আদমের সন্তানদের ক্ষতি করার জন্যে আমি সর্বশক্তি নিয়োগ করবো। সে আল্লাহকে বললো:

"আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন।" এই 'অবকাশ দিন' বলে শয়তান আল্লাহর কাছে দু'টি সুযোগ চাইলো:

এক. কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকবার সুযোগ।

দুই. আদম সন্তানদের পথভ্রষ্ট করবার সুযোগ।

আল্লাহ বললেন: "যা, তোকে সুযোগ দিলাম।"[১১] শয়তান বললো:

"আদম সন্তানদের পথভ্রষ্ট করার জন্যে এখন থেকে আমি তোমার সরল সঠিক পথের বাঁকে বাঁকে ওঁৎ পেতে বসে থাকবো। সামনে পিছে, ডানে বামে, সব দিক থেকে আমি তাদের ঘিরে ফেলবো। ফলে তাদের মধ্যে খুব কম লোককেই তুমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ পাবে।" (সূরা ৭ আল আ'রাফ : ১৬-১৭)

আল্লাহ বললেন, আমার বান্দাদের উপর তোর কোনো প্রভাব প্রতিপত্তি চলবেনা। তুই জোর করে তাদের সঠিক পথ থেকে ফেরাতে পারবিনা। তুইতো পারবি কেবল চালবাজি করতে। মিথ্যা আশার লোভ দেখাতে। পাপের কাজকে চাকচিক্যময় করে দেখাতে। আর ভ্রান্ত পথের আকর্ষণ সৃষ্টি করতে। এই সুযোগই তো কেবল তোকে দেয়া হয়েছে। লোকদের জোর করে হিদায়েতের পথ থেকে গুমরাহির পথে টেনে নেবার ক্ষমতা তোকে দেয়া হয়নি। তবে যেসব মানুষ তোর প্রলোভনে পড়বে, আমি তাদেরকে আর তোকে দিয়ে জাহান্নাম ভর্তি করবো।[১২]

এবার নিশ্চয়ই আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি, যেসব মানুষ আল্লাহর হুকুম মেনে চলবে, শয়তান তাদের পথভ্রষ্ট করতে পারবেনা। সে ক্ষমতা শয়তানের নেই। শয়তান কেবল তাদেরই বিপথগামী করতে পারে, যারা আল্লাহর হুকুম মেনে চলেনা। কিংবা তাঁর হুকুম পালনে গাফলতি করে।

আদম ও হাওয়া জান্নাতে

তারপর কী হলো? - তারপর মহান আল্লাহ শয়তানকে লাঞ্ছিত করে তাড়িয়ে দিলেন। আর আদমকে থাকতে দিলেন জান্নাতে। প্রথমত আদম ছিলেন একা। তারপর আল্লাহ আদমের (পাঁজরের হাড়) থেকে তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন।[১৩]

এবার তিনি আদমের কাছে কিছু নির্দেশ পাঠালেন। বললেন: "হে আদম! তুমি আর তোমার স্ত্রী দু'জনেই জান্নাতে থাকো। যা খুশি ইচ্ছেমতো খাও। তবে শুনো, ঐ যে গাছটি, সেটির কাছেও যেয়োনা। সেটির ফল খেয়োনা। খেলে যালিমদের মধ্যে গণ্য হবে।"[১৪]

বাবা আদম আর মা হাওয়া দারুণ সুখে জান্নাতে থাকতে লাগলেন। কী চমৎকার জায়গা জান্নাত! সুখ আর আনন্দের অন্ত নেই এখানে। কিন্তু আদম হাওয়ার এই

আনন্দ, এই সুখ তো শয়তানের সহ্য হয়না। সে ভাবলো, আদমের কারণেই তো আমার এই লাঞ্ছনা। যে করেই হোক, আমি যেমন করে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে লাঞ্ছিত হয়েছি। সে রকমভাবে আদমকে দিয়েও আল্লাহর হুকুম অমান্য করাতে হবে। তখন সেও হবে আমার মতো লাঞ্ছিত, অপদস্থ!

শয়তান প্রতারণা করলো

আদম এবং হাওয়া তখন পর্যন্ত শয়তানের ধোকা প্রতারণা সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতা লাভ করেননি। এই সুযোগে শয়তান খুব ভালো মানুষের বেশে এসে তাদের ধোকা দিলো। সে বললো: তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে এই গাছের কাছে যেতে নিষেধ করেছেন কেন জানো? আসলে এই গাছের ফল খেলে উচ্চ মর্যাদা লাভ করা যায়। ফেরেশতা হওয়া যায়। তাছাড়া চিরদিন বেঁচে থাকা যায়। তোমরা যেনো আবার ফেরেশতা না হয়ে বসো, যেনো চিরকাল বেঁচে না থাকো, সে জন্যেই তোমাদের প্রভু এ গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন। সে কসম করে বললো : 'আমি তোমাদের ভালো চাই।' এভাবে সে দু'জনকেই তার প্রতারণার জালে বন্দী করে ফেললো।[১৫]

তারা দু'জনেই নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে বসলেন। আল্লাহর নিষেধের কথা ভুলে গেলেন তারা। শয়তানের ধোকায় পড়ে অমান্য করে বসলেন তারা মহান আল্লাহর নির্দেশ।

সাথে সাথে তাদের জান্নাতি পোশাক খসে পড়লো। তারা গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের লজ্জা আবৃত করতে থাকেন। এসময় আল্লাহ্ পাক তাদের ডেকে বললেন: আমি কি তোমাদের নিষেধ করিনি এ গাছটির কাছে যেতে? আমি কি বলিনি শয়তান তোমাদের সুস্পষ্ট দুশমন?'[১৬]

আদম ও হাওয়ার অনুতাপ

আদম ও হাওয়া দু'জনেই তাঁদের ভুল বুঝতে পারলেন। চরম অনুতপ্ত হলেন তাঁরা। অপরাধবোধ তাঁদের ভীষণ ব্যাকুল করে তুললো। কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন তাঁরা। অনুতপ্ত মনে কাতর কণ্ঠে তাঁরা ফরিয়াদ করলেন প্রভুর দরবারে :

"ওগো প্রভু! আমরা তো নিজেদের উপর অবিচার করে বসেছি। এখন তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না করো, আমাদের প্রতি রহম না করো, তবে তো আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো!" (সূরা ৭ আল আ'রাফ: আয়াত ২৬)

আল্লাহ ক্ষমা করে দিলেন তাঁদের

তাঁদের এই আন্তরিক অনুশোচনা ও তওবা আল্লাহ কবুল করলেন।[১৭] ফলে আদম ও হাওয়া শয়তানের প্রতারণার জালে আবদ্ধ হয়ে যে অপরাধ করে

ফেলেছিলেন, মহান আল্লাহ তা মাফ করে দিলেন। তাঁরা পুনরায় আগের মতো নিষ্পাপ হয়ে গেলেন।

এখানে একটি জরুরি বিষয় বুঝে নেয়া দরকার। সেটা হলো, প্রথমে আমরা দেখেছি, ইবলিস আল্লাহর হুকুম অমান্য করে অভিশপ্ত হয়েছে। আর এখানে দেখলাম আদম আলাইহিস্ সালাম এবং তার স্ত্রীও আল্লাহর হুকুম অমান্য করলেন। কিন্তু তাঁরা রয়ে গেলেন নিষ্পাপ এবং আল্লাহর প্রিয়। এর কারণ কি?- এর কারণ হলো, শয়তান আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছে:

১. বুঝে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে।
২. সে নিজেকে বড় মনে করেছে।
৩. সে নিজেকে উত্তম মনে করেছে।
৪. সে অহংকার করেছে।
৫. সে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেছে।
৬. এই অপরাধের জন্যে সে মোটেও অনুতপ্ত হয়নি এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনাও করেনি।

অপর পক্ষে আদম আলাইহিস্ সালাম এবং তাঁর স্ত্রী হাওয়া:

১. ইচ্ছাকৃতভাবে বুঝে শুনে আল্লাহর হুকুম অমান্য করেননি।
২. তাঁরা বিদ্রোহও করেননি।
৩. তাঁরা অহংকারও করেননি।
৪. তাঁরা অপরাধ করেছেন শয়তানের ধোকায় পড়ে ভুল করে।
৫. তাঁরা সচেতনভাবে মূলত আল্লাহর একান্তই আনুগত্য ছিলেন।
৬. তাঁরা ভুল বুঝবার সাথে সাথে অনুতপ্ত হন। আল্লাহর ভয়ে কম্পিত হন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

খিলাফতের দায়িত্ব নিয়ে পৃথিবীতে এলেন আদম

এভাবেই আদম আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর দাস ও খলিফা হবার মর্যাদা রক্ষা করেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন। তাই এবার আল্লাহ তাঁর মূল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার ইচ্ছা করলেন। অর্থাৎ তিনি আদম আলাইহিস্ সালামকে পৃথিবী নামক গ্রহে তাঁর প্রতিনিধি বানিয়ে দিলেন। কারণ এ জন্যেই তো তিনি তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন। মাঝখানে কিছুদিন জান্নাতে রেখে তো একটা পরীক্ষা নিলেন মাত্র। এ পরীক্ষার মাধ্যমে আসলে এক বিরাট অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন আদম আলাইহিস্ সালাম। প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠাবার কালে মহান আল্লাহ তাঁকে বলে দিলেন:

যাও, পৃথিবীতে অবতরণ করো। তোমার শত্রু শয়তানও সেখানে যাবে। সেখানে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমরা বসবাস করবে। সেখানে তোমাদের জীবন সামগ্রিরও ব্যবস্থা আছে। সেখানেই তোমাদের বাঁচতে হবে। সেখানেই তোমাদের মরতে হবে। আবার সেখান থেকেই তোমাদের বের করে আনা হবে, পুনরুত্থিত করা হবে।[১৮]

এ প্রসংগে তিনি আদম আলাইহিস্ সালামকে আরো বলে দিলেন: আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে জীবন যাপন পদ্ধতি যাবে। যে আমার দেয়া জীবন যাপন পদ্ধতির অনুসরণ করবে, তার কোনো ভয় থাকবেনা। থাকবেনা কোনো দুঃখ, কোনো বেদনা। অর্থাৎ সে অনায়াসে আবার জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং চিরকাল সুখে থাকবে।[১৯]

আল্লাহ আরো বলে দিলেন: তবে যারা আমার জীবন পদ্ধতি অমান্য করবে আর মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবে আমার আয়াতকে, চিরদিন তাদের আগুনে ফেলে রাখবো। তারা তাদের চির শত্রু অভিশপ্ত শয়তানের সাথে অনন্ত জীবন জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে।[২০]

এভাবে পৃথিবীর জন্যে সৃষ্টি করা মানুষ আদম আলাইহিস্ সালামকে আল্লাহ তাঁর খলিফা ও নবী বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে থাকেন। আদম আলাইহিস্ সালাম তাঁর সন্তানদের আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে শিখান। শয়তানের ধোকা প্রতারণা সম্পর্কে সতর্ক করেন। তাঁরা শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই জীবন কাটান।

আদম আলাইহিস্ সালাম ছিলেন পৃথিবীর প্রথম মানুষ। তিনিই ছিলেন পয়লা নবী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী ভদ্র ও রুচিবান। ছিলেন উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী। ছিলেন অত্যন্ত সম্ভ্রমশীল, আল্লাহভীরু ও আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পিত। পোশাক ছিলো তাঁর ভূষণ। এইসব মহান গুণাবলির অধিকারী একজন সভ্য মানুষের মাধ্যমেই পৃথিবীতে শুরু হয় মানুষের শুভযাত্রা। আমরা এবং আমাদের আগের ও পরের সমস্ত মানুষই আদম আলাইহিস্ সালামের সন্তান। মহান আল্লাহ বলেন:

"হে মানুষ! তোমাদের প্রভুকে ভয় করো। তিনিই তো একটি মাত্র প্রাণ থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। তার থেকেই তার জুড়ি তৈরি করেছেন। আর তাদের দু'জন থেকেই বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্য পুরুষ আর নারী।[২১]

জেনে রাখুন

শেষ করবার আগে কয়েকটি জরুরি কথা জানিয়ে দিই। জেনে রাখলে কাজে আসবে। কুরআন মজিদে–

১. 'আদম' আলাইহিস্ সালামের নাম উচ্চারিত হয়েছে পঁচিশবার।

২. আট স্থানে মানুষকে 'আদম সন্তান' বলা হয়েছে।

৩. 'ইবলিস' শব্দটি উল্লেখ রয়েছে এগার স্থানে।

৪. ৮৮ বার 'শয়তান' শব্দ উল্লেখ হয়েছে। এর মধ্যে সত্তরবার এক বচনে আর আঠার বার বহু বচনে। আল্লাহদ্রোহী মানব নেতাদেরকেও কুরআনে শয়তান বলা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বলা হয়েছে।

৫. নিম্নোক্ত সূরাগুলোতে আদম আলাইহিস্ সালামের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে : সূরা আল বাকারা, আল আ'রাফ, বনি ইসরাঈল, আল কাহাফ, তোয়াহা, আল হিজর, সোয়াদ।

আদম আলাইহিস্ সালামের জীবনকথা থেকে আমরা এই শ্লোগান নিতে পারি :

আল্লাহর হুকুম মানতে হবে,
শয়তানের পথ ছাড়তে হবে!
জান্নাতে মোদের যেতে হবে,
শয়তানের বিরুদ্ধে লড়তে হবে।

টিকা

১. দেখুন আল কুরআন : সূরা আ'রাফ : ৪৫, সূরা ইউনুস: ৩, সূরা হুদ: ৭, সূরা ফুরকান: ৫৯, সূরা সাজদা : ৪, সূরা কাফ: ৩৮, সূরা হাদিদ: আয়াত ৪।

২. দ্রষ্টব্য : সূরা ২ আল বাকারা: আয়াত ২৯।

৩. দ্রষ্টব্য : সূরা ২ আল বাকারা: আয়াত ৩০।

৪. সূরা ৬ আন'আম : আয়াত ২, সূরা মুমিনুন: আয়াত ১২, সূরা সাজদা: আয়াত ৭।

৫. সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ৩১।

৬. সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ৩৩।

৭. সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ৩৪।

৮. সূরা ৭ আ'রাফ : আয়াত ১২।

৯. সূরা ৭ আ'রাফ : আয়াত ১৩।

১০. সূরা ৭ : আ'রাফ আয়াত ১৪। সূরা হিজর : আয়াত ৩৬।

১১. সূরা ৭ আ'রাফ : আয়াত ১৫। সূরা হিজর : আয়াত ৩৭।

১২. সূরা ১৭ ইসরা : আয়াত ৬২-৬৫। সূরা ১৫ হিজর : আয়াত ৪২।

১৩. সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ১।

১৪. সূরা আল বাকারা : আয়াত ৩৫।

১৫. সূরা ৭ আ'রাফ : আয়াত ২০-২২।

১৬. সূরা ৭ আ'রাফ : আয়াত ২২।

১৭. সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ৩৭।

১৮. সূরা ৭ আ'রাফ : আয়াত ২৪-২৫।

১৯. সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ২৮।

২০. সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ২৯।

২১. সূরা আন নিসা : আয়াত ১।

❖

উচ্চ মর্যাদার নবী ইদরিস

আলাইহিস্ সালাম

আল কুরআনে যে পঁচিশজন নবীর নাম উল্লেখ আছে, তাঁদেরই একজন ইদরিস আলাইহিস্ সালাম। মহান আল্লাহ তাঁকে অনেক উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। আল কুরআনে তিনি ইদরিস আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে বলেছেন:

"এই মহাগ্রন্থে ইদরিসের কথা স্মরণ করো। সে ছিলো একজন বড় সত্যপন্থী মানুষ এবং নবী। আমি তাকে অনেক বড় উচ্চ স্থানে উঠিয়েছি।" (সূরা মরিয়ম : আয়াত ৫৬-৫৭)

দেখলেন তো, স্বয়ং আল্লাহ পাকই তাঁকে অনেক উঁচু মর্যাদা দান করেছেন। আর মহান আল্লাহ যাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন, তার চেয়ে বড় ভাগ্যবান ব্যক্তি আর কে?

তিনি কোন্ সময়কার নবী?

ইদরিস আলাইহিস্ সালাম প্রাগৈতিহাসিক যুগের নবী। তাই তিনি কোন্ সময়কার নবী, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে অনেক মুফাস্‌সির বলেছেন, কুরআনের বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, তিনি নূহ আলাইহিস্ সালামের পূর্বেকার নবী ছিলেন এবং আদম আলাইহিস্ সালামের সন্তান বা নিকট বংশধরদের একজন ছিলেন। ইতিহাস বিদ ইব্‌নে ইসহাক লিখেছেন, আদম আলাইহিস্ সালাম এক হাজার বছর বেঁচে ছিলেন। ইদরিস আলাইহিস্ সালাম তাঁর জীবনের তিনশ' আট বছর পেয়েছেন। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই ভালো জানেন।

তিনি কোন্ দেশের নবী ছিলেন?

তিনি কোন্ সময়কার নবী ছিলেন, কুরআনে যেমন সেকথা বলা হয়নি, ঠিক তেমনি তিনি কোন্ দেশের নবী ছিলেন সে কথাটিও বলা হয়নি। তবে কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন, তিনি বেবিলনের লোক। আবার কেউ কেউ বলেছেন মিশরের। আসলে দু'টি কথাই ঠিক। তিনি বেবিলনে জন্মগ্রহণ করেন। এখানে নবুয়্যত লাভ করেন, মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকেন। এখানে কিছু লোক ঈমান আনে আর বাকি লোকেরা ঈমান আনতে অস্বীকার করে। শুধু তাই নয়, বরং তারা হযরত ইদরিস ও তাঁর সংগি সাথিদের বিরুদ্ধে চরম শত্রুতা আরম্ভ করে। ফলে ইদরিস আলাইহিস্ সালাম তাঁর সংগি সাথিদের নিয়ে

মিশরের দিকে হিজরত করেন। এখানে এসে তিনি নীল নদের তীরে বসতি স্থাপন করেন এবং এখানকার মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকতে আরম্ভ করেন।

ইদরিস আলাইহিস্ সালামের নবুয়্যত

হযরত আদম ও শীস্ আলাইহিস্ সালামের পর আল্লাহ তায়ালা হযরত ইদরিসকে নবুয়্যত দান করেন। তিনি বড় জ্ঞানী লোক ছিলেন। তাঁকে প্রাচীনতম বিজ্ঞানী বলা হয়ে থাকে। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, তিনিই সর্বপ্রথম কলম ব্যবহার করেন।

ইসরাঈলি বর্ণনায় ইদরিস আলাইহিস্ সালামকে,'হনোক' বলা হয়েছে। তালমুদে বলা হয়েছে: 'হনোক তিনশত তিপ্পান্ন বৎসর পর্যন্ত মানব সন্তানদের উপর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁর শাসন ছিলো ন্যায় ও সুবিচারপূর্ণ শাসন। তাঁর শাসনামলে পৃথিবীতে আল্লাহর অফুরন্ত রহমত বর্ষিত হতে থাকে।"[১]

হযরত ইদরিস আলাইহিস্ সালাম এক সময় খারাপ লোকদের থেকে নি:সম্পর্ক হয়ে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি করছিলেন। এরি মধ্যে তাঁর কাছে আল্লাহর ফেরেশতা এসে তাঁকে ডেকে বললেন : ইদরিস। উঠো, একাকী থাকার জীবন ত্যাগ করো। মানুষের মাঝে চলাফেরা করো এবং তাদের সঠিক পথ দেখাও।' এ নির্দেশ পেয়ে হযরত ইদরিস বের হয়ে আসেন এবং মানুষকে ডেকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন।

বেবিলনের লোকেরা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য কিছু লোক হযরত ইদরিসের দাওয়াত কবুল করে আল্লাহর পথে চলতে আরম্ভ করেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক আল্লাহর পথে আসতে অস্বীকার করে। তারা হযরত ইদরিস ও তাঁর সাথিদের সাথে খুবই খারাপ আচরণ করে। তিনি যখন দেখলেন এদের আর সৎ পথে আসবার সম্ভাবনা নেই, তখন তিনি তাঁর সাথিদের নিয়ে মিশরের দিকে হিজরত করেন এবং নীল নদের তীরে বসতি স্থাপন করেন। হযরত ইদরিস এখানকার লোকদের সৎ পথে চলার উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। লোকেরা তাঁর প্রচেষ্টায় ব্যাপকভাবে আল্লাহর পথে আসতে থাকে। তিনি এসব লোকদের উপর আল্লাহর আইনের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ফলে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে শান্তি আর সুখের ফোয়ারা।

হযরত ইদরিস আলাইহিস্ সালাম মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকার কাজে এবং মানুষকে আল্লাহর আইন অনুযায়ী চালাবার কাজে যতো বিরোধিতার এবং দুঃখ মুসিবতেরই সম্মুখীন হয়েছেন, তাতে তিনি পরম ধৈর্য ও সবর অবলম্বন করেন। তাইতো মহান আল্লাহ তাঁর প্রশংসা করে আল কুরআনে বলেছেন :

"আর ইসমাঈল, ইদরিস, যুলকিফ্‌ল এরা প্রত্যেকেই ছিলো ধৈর্যশীল। আমি তাদের প্রবেশ করিয়েছি আমার রহমতের মাঝে। তারা ছিলো সৎ ও সংশোধনকামী।"[২]

হযরত ইদরিস আলাইহিস্ সালামের উপদেশ

ইসরাঈলি সূত্র এবং কিংবদন্তী আকারে হযরত ইদরিস আলাইহিস্ সালামের বেশ কিছু উপদেশ ও জ্ঞানের কথা প্রচলিত আছে। এখানে বলে দিচ্ছি তাঁর কিছু উপদেশ ও জ্ঞানের কথা:

১. আল্লাহর প্রতি ঈমানের সাথে যদি সংযোগ থাকে ধৈর্য ও সবরের, তবে বিজয় তার সুনিশ্চিত।

২. ভাগ্যবান সে, যে আত্মসমালোচনা করে। আল্লাহ প্রভুর দরবারে প্রত্যেক ব্যক্তির সুপারিশ হলো তার নেক আমল।

৩. সঠিকভাবে কর্তব্য পালনের মধ্যেই আনন্দ। শরিয়া দীনের পূর্ণতা দান করে। আর যে ব্যক্তি দীনের দিক থেকে পূর্ণ, সে-ই ব্যক্তিত্বশালী।

হযরত ইদরিস আলাইহিস্ সালাম মানুষকে আল্লাহর হুকুম পালন করতে বলতেন। তাঁরই ইবাদত ও দাসত্ব করতে বলতেন। তিনি মানুষকে উপদেশ দিতেন: পরকালে নিজেকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে, দুনিয়াতে নেক আমল করতে এবং এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করতে। তিনি নির্দেশ দিতেন সালাত কায়েম করতে, সিয়াম পালন করতে, যাকাত পরিশোধ করতে এবং পবিত্রতা অবলম্বন করতে।

কথিত আছে, হযরত ইদরিস আলাইহিস্ সালামের কালে বিরাশিটি ভাষা চালু ছিলো। তিনি সবগুলো ভাষাই জানতেন এবং সবগুলো ভাষাতেই কথা বলতে পারতেন। তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকদেরকে তাদের নিজেদের ভাষায় উপদেশ দিতেন। আল কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন :

"আমি যখনই কোনো রসূল পাঠিয়েছি, সে নিজ কওমের ভাষায় তাদের দাওয়াত দিয়েছে।" (সূরা ইবরাহিম : আয়াত ৪)

জানা যায়, ইদরিস আলাইহিস্ সালামই সর্বপ্রথম নগর রাজনীতি চালু করেন এবং নগর সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁর সময় ১৮৮টি নগর গড়ে উঠেছিল।

তাঁর মৃত্যু ও তাঁর মর্যাদা

আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইদরিস আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে বলেছেন : 'আমি তাকে অনেক উচ্চস্থানে উঠিয়েছি।' এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় অনেক তাফসিরকার বলেছেন, পৃথিবীতে ইদরিস আলাইহিস্ সালামের মৃত্যু হয়নি, বরং

আল্লাহ তায়ালা তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন। হতে পারে মহান আল্লাহ তাঁকে জীবন্ত উঠিয়ে নিয়ে গেছেন এবং অনেক উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। তবে আসল কথা আল্লাহই ভালো জানেন।

হ্যাঁ, এ প্রসংগে আরেকটি কথা বলে দিচ্ছি। তাহলো আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মি'রাজে গিয়েছিলেন, তখন চতুর্থ আকাশে ইদরিস আলাইহিস্ সালামের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। হযরত ইদরিস তাঁকে দেখে বলে উঠেন : 'শুভেচ্ছা স্বাগতম হে আমার মহান ভাই!'

কুরআন মজিদে ইদরিস আলাইহিস্ সালামের নাম দু'বার উল্লেখ হয়েছে। একবার সূরা মরিয়মে আর অন্যবার সূরা আম্বিয়াতে। উভয় স্থানেই আল্লাহ তায়ালা ইদরিস আলাইহিস্ সালামের উচ্চ গুণাবলি এবং বড় মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন। এই মহাপুরুষ ও মহান নবীর উপর বর্ষিত হোক চির শান্তি ও করুণাধারা।

টিকা

১. দ্রষ্টব্য : The Talmud Selections, pp. 18-21

২. সূরা ২১ আল আম্বিয়া : আয়াত ৮৫।

❖

৩

হাজার বছরের সংগ্রামী নূহ

আলাইহিস্ সালাম

অনেক অনেক বছর হলো আদম আলাইহিস্ সালাম বিদায় নিয়েছেন পৃথিবী থেকে। তাঁর স্ত্রী হাওয়াও আর বেঁচে নেই। তাঁদের মৃত্যুর পর শত শত বছরের ব্যবধানে অনেক বেড়ে গিয়েছিল তাঁদের বংশধারা। এখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়ে অসংখ্য নারী-পুরুষ আদম সন্তান। ইরাকসহ বর্তমান আরব দেশগুলোই ছিলো তাদের বসবাসের এলাকা।

আদম আলাইহিস্ সালামের মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন তাঁর সন্তানরা ইসলামের পথেই চলে। চলে আল্লাহর পথে। মেনে চলে আল্লাহর বিধান। অনুসরণ করে আল্লাহর নবী আদমের পদাংক। তাদের মাঝে জন্ম নেয় অনেক ইসলামি নেতা ও আলেম। তাঁরাও তাঁদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার চেষ্টা সাধনা করে যান। এরি মধ্যে হযরত ইদরিস আলাইহিস্ সালামও অতীত হয়ে যান।

কিন্তু কালক্রমে আদম সন্তানরা আদম আলাইহিস্ সালামের শিক্ষা ভুলে যায়। ভুলে যায় ইদরিস আলাইহিস্ সালামের উপদেশ। শয়তানের ধোকায় পড়ে যায় তারা। ইসলামের পথ থেকে তারা সরে পড়ে দূরে। বাঁকা পথে চলতে শুরু করে তারা। বিপথে এগিয়ে যায় অনেক দূর।

ফলে তারা শয়তানের অনুসারী হয়ে যায়। পরিণত হয় আত্মার দাসে। তারা অহংকারী হয়ে পড়ে। দুনিয়ার জীবনটাকেই বড় করে দেখতে শুরু করে। এখানকার লাভ ক্ষতিকেই তারা আসল লাভ ক্ষতি মনে করে নেয়। শুধু তাই নয়। বরং সবচাইতে বড় অপরাধটিও তারা করে বসে। সেটা হলো শির্ক। তারা শির্কে নিমজ্জিত হয়। মানে মনগড়া দেবদেবীদের তারা আল্লাহর অংশীদার আর প্রতিপক্ষ বানিয়ে নেয়। পূজা করার জন্যে মূর্তি তৈরি করে নেয়। তাদের কয়েকটি মূর্তির নাম বলছি।

হ্যাঁ, তাদের বড় মূর্তিটির নাম ছিলো 'অদ্দ'। এ ছিলো পুরুষ দেবতা। একটি মূর্তির নাম ছিলো 'সুয়া'। এটা ছিলো দেবী। একটির নাম ছিলো 'ইয়াগুস্'। এটির আকৃতি ছিলো সিংহের মতো। একটি মূর্তি ছিলো ঘোড়ার আকৃতির। এটির নাম ছিলো 'ইয়াউক'। আরো একটি বড় মূর্তি ছিলো। ঈগল আকৃতির এই মূর্তিটির নাম ছিলো 'নসর'।[১]

এইসব মূর্তির তারা পূজা করতো। এসব অসহায় দেব দেবীকে তারা আল্লাহর

অংশীদার বানিয়ে নিয়েছিল। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন মানুষ হয়েও তারা ডুবে গিয়েছিল কতটা অন্ধকারে!

তাদেরই এক উঁচু ঘরে জন্ম নেয় এক শিশু। সে বড় হয়ে উঠে তাদেরই মাঝে। কৈশোর, তারুণ্য পার হয়ে যৌবনে এসে উপনীত হয়। তার জ্ঞান, বুদ্ধি, যোগ্যতা, দক্ষতা দেখে সবাই ভাবে, ভবিষ্যতে সে-ই হবে তাদের নেতা। নেতৃত্বের সমস্ত যোগ্যতাই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার মধ্যে। সে কখনো মিথ্যে বলেনা। অন্যায় অপরাধে জড়িত হয়না। কারো প্রতি অবিচার করেনা। উন্নত পবিত্র চরিত্রের সে অধিকারী।

ফলে সকলেরই সে প্রিয় পাত্র। তার মতো বিশ্বস্ত দ্বিতীয় আর কেউ তাদের মাঝে নেই। কী সেই যুবকটির নাম? নাম তার নূহ। নূহ তাদের আশা ভরসার স্থল। তাদের পরিকল্পনা মতো নূহ-ই হবে তাদের প্রিয় নেতা। কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা ভিন্ন।

আল্লাহ নূহকে নবী মনোনীত করেন। তাঁর কাছে অহি পাঠান: "কঠিন শাস্তি আসার আগেই তুমি তোমার জাতির লোকদের সতর্ক করে দাও।"[২]

আল্লাহ নূহের কাছে তাঁর দীন নাযিল করেন। দীন মানে জীবন যাপনের ব্যবস্থা। আল্লাহর দীনের নাম 'ইসলাম'। আল্লাহর দীন অনুযায়ী জীবন যাপন না করলে যে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে, নিজ জাতিকে সে ব্যাপারে সতর্ক করার জন্যে আল্লাহ নূহকে নির্দেশ দেন।

নূহ তাঁর জাতির লোকদের বললেন: "হে আমার জাতির ভাইয়েরা! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো। তাঁর হুকুম মেনে চলো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ্ নেই। তোমরা কেবল তাঁকেই ভয় করো। আর আমার কথা মেনে চলো। আমার আনুগত্য করো। যদি তাই না করো, আমার ভয় হচ্ছে, তবে তোমাদের উপর একদিন কঠিন শাস্তি এসে পড়বে। আমি কিন্তু তোমাদের স্পষ্ট ভাষায় সাবধান করে দিচ্ছি।"

নূহ তাদের আরো বললেন : "আমি তোমাদের যেভাবে চলতে বলছি, তোমরা যদি সেভাবে চলো, তবে আল্লাহ তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। আর একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের বাঁচিয়ে রাখবেন। নইলে কিন্তু আগেই ধ্বংস হয়ে যাবে।" (সূরা নূহ : আয়াত ২৪-২৫)

নূহের এই কল্যাণময় হিতাকাংখী আহ্বানের জবাবে তাঁর জাতির নেতারা বললো: তুমি কেমন করে হলে আল্লাহর রসূল? তুমি তো আমাদেরই মতো একজন মানুষ![৩]

সাধারণ মানুষের উপর কিন্তু নূহের ছিলো দারুণ প্রভাব। তারা জাতির স্বার্থপর নেতাদের চাইতে নূহকেই বেশি ভালবাসতো। নেতারা যখন দেখলো জনগণ তো নূহের কথায় প্রভাবিত হয়ে পড়ছে। তার সাথি হয়ে যাচ্ছে। তাদের সমস্ত

কায়েমি স্বার্থ বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তখন তারা জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্যে কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়। তারা জনগণকে বলে:

"দেখো নূহের কাণ্ড! সে তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ মাত্র। কিন্তু সে নিজেকে আল্লাহর রসূল বলে দাবি করছে। আসলে ওসব কিছু নয়। সে এভাবে দেশের প্রধান নেতা এবং কর্তা হতে চায়। কোনো মানুষ যে আল্লাহর রসূল হতে পারে, এমন কথা তো আমরা আমাদের বাপদাদার কালেও শুনিনি। আল্লাহ যদি আমাদের কাছে কোনো রসূল পাঠাতেনই তবে নিশ্চয়ই কোনো ফেরেশতা পাঠাতেন। তোমরা ওর কথায় কান দিওনা। ওকে আসলে জিনে পেয়েছে।"[৪]

এভাবে বৈষয়িক স্বার্থের ধারক এই নেতারা জনগণকে বিভ্রান্ত করে দিলো। তারা নূহের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হলো। নূহ দিনরাত তাদের সত্য পথে আসার জন্যে ডাকতে থাকেন, বুঝাতে থাকেন। নূহ তাদের আল্লাহর পথে আনবার জন্যে যে কী আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তা আমরা নূহ আলাইহিস্ সালামের কথা থেকেই জানতে পারি। তিনি মহান আল্লাহর কাছে তাঁর কাজের রিপোর্ট দিতে গিয়ে বলেন:

"হে আমার প্রভু, আমি আমার জাতির লোকদের দিনরাত ডেকেছি তোমার দিকে। কিন্তু আমার আহ্বানে তাদের এড়িয়ে চলার মাত্রা বেড়েই চলেছে। আমি যখনই তাদের ডেকেছি তোমার ক্ষমার দিকে, তারা তাদের কানে আঙ্গুল ঠেসে দিয়েছে। কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নিয়েছে। এসব অসদাচরণে তারা অনেক বাড়াবাড়ি করে চলেছে। তারা সীমাহীন অহংকারে ডুবে পড়েছে। পরে আমি তাদের উঁচু গলায় ডেকেছি। প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি। গোপনে গোপনেও বুঝিয়েছি। আমি তাদের বলেছি, তোমরা তোমাদের মালিকের কাছে ক্ষমা চাও। তিনি বড় ক্ষমাশীল। তিনি আকাশ থেকে তোমাদের জন্যে পানি বর্ষণ করবেন। ধনমাল আর সন্তান দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন। তোমাদের জন্যে বাগবাগিচা সৃষ্টি করে দেবেন। নদী-নালা প্রবাহিত করে দেবেন।" (সূরা ৭১ নূহ : আয়াত ৫-১২)

নূহ তাদের বুঝালেন, কেন তোমরা আল্লাহর পথে আসবেনা? তিনি তাদের বললেন : "দেখনা, আল্লাহ কিভাবে স্তরে স্তরে সাতটি আকাশ বানিয়েছেন? চাঁদকে বানিয়েছেন আলো আর সূর্যকে প্রদীপ? আল্লাহই তো তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। আবার তিনি এই মাটিতেই তোমাদের ফিরিয়ে নেবেন। তারপর তোমাদের বের করবেন এই মাটি থেকেই। আল্লাহই তো পৃথিবীটাকে তোমাদের জন্যে সমতল করে বিছিয়ে দিয়েছেন, যাতে করে তোমরা উন্মুক্ত পথ ঘাট দিয়ে চলাচল করতে পারো।" (সূরা ৭১ নূহ : আয়াত ১৫-২০)

এতো করে বুঝাবার পরও তারা নূহের কথা শুনলনা। তারা নিজেদের গোঁড়ামি আর অহংকারে অটল রইল। তারা নূহকে বললো :

"আমরা কেমন করে তোমার প্রতি ঈমান আনি? তোমার অনুসারী যে ক'জন হয়েছে, ওরা তো সব ছোট লোক! আমরা তোমাদেরকে আমাদের চাইতে বেশি মর্যাদাবান মনে করিনা। বরং আমরা তোমাদের মিথ্যাবাদীই মনে করি।[৫] তারা আরো বললো : "আমরা তো তোমাকে দেখছি স্পষ্ট বিপথগামী।"[৬]

নূহ তাদের আবারো বুঝালেন : "হে আমার জাতির ভাইয়েরা! আমি মোটেও বিপথে চলছিনে। আমি তো বিশ্ব জগতের মালিকের বাণীবাহক। আমি তো কেবল আমার প্রভুর বাণীই তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। আমি তো কেবল তোমাদের কল্যাণই চাই। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন সব জিনিস জানি, যা তোমরা জানোনা। হে আমার দেশবাসী! তোমরা একটু ভেবে দেখো, আমি যদি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর থাকি আর তিনি যদি আমাকে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহও দান করে থাকেন, কিন্তু তোমরা যদি তা না দেখতে পেলে, তবে আমার কি করবার আছে? তোমরা মেনে নিতে না চাইলে আমি তো আর তোমাদের উপর তা চাপিয়ে দিতে পারিনা। হে আমার ভাইয়েরা! আমি যে দিনরাত তোমাদের আল্লাহর পথে ডাকছি, তার বিনিময়ে তো আমি তোমাদের কাছে কিছু চাইনা। আমি তো কেবল আল্লাহর কাছে এর বিনিময় চাই। এতেও কি তোমরা বুঝতে পারছনা যে, তোমাদের ডাকার এ কাজে আমার কোনো স্বার্থ নেই?"[৭]

এভাবে আল্লাহর মহা ধৈর্যশীল নবী নূহ আলাইহিস্ সালাম পঞ্চাশ কম হাজার বছর ধরে তাদের আল্লাহর পথে ডাকেন। তাদের সত্য পথে আনার অবিরাম চেষ্টা করেন। ধ্বংস ও শাস্তির হাত থেকে তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা তাঁর এই মহৎ কাজের জবাব দেয় তিরস্কার, বিরোধিতা আর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। তাদের সমস্ত বিরোধিতা আর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় হাজার বছর ধরে তিনি পরম ধৈর্যের সাথে আল্লাহ্ দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যান। অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় তাদের বুঝাবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু তাঁর হাজারো মর্মস্পর্শী আবেদন নিবেদনের পরও তারা তাঁর কথা শুনলনা। আল্লাহর দীন কবুল করলনা তারা। স্বার্থপর নেতারা জনগণকে বলে দিলো : "তোমরা কিছুতেই নূহের কথায় ফেঁসে যাবেনা। তার কথায় কোনো অবস্থাতেই তোমরা আমাদের দেব দেবীদের ত্যাগ করতে পারবেনা। ত্যাগ করতে পারবেনা অদ্দ আর সূয়াকে। ইয়াগুস, ইয়াউক আর নসরকেও পরিত্যাগ করতে পারবেনা। এভাবে তারা অধিকাংশ জনগণকে সম্পূর্ণ বিপথগামী করে দিলো।"[৮]

শুধু কি তাই? বরং তারা এর চাইতেও বড় ষড়যন্ত্র করলো। কি সেই ষড়যন্ত্র? তাহলো, তারা আল্লাহর নবী নূহ আলাইহিস্ সালামকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলো। কুরআনের ভাষায় : 'ওয়া মাকারূ মাক্‌রান কুব্বারা- তারা এক বিরাট

ষড়যন্ত্র পাকালো।'[৯] তারা নূহকে অহংকারী ভাষায় শাঁসিয়ে দিলো : "নূহ! তুমি যদি বিরত না হও, তবে বলে দিচ্ছি, তুমি হতভাগ্যদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[১০]

শুধু তাই নয়, তারা নূহকে ধমকের সুরে আরো বললো:

"তুমি তো এতোদিন আমাদের সাথে বড় বেশি বিবাদ করেছো। শোনো! তুমি যে আমাদের ধমক দিচ্ছিলে,তোমার কথা না শুনলে আমাদের উপর বিরাট শাস্তি নেমে আসবে, কোথায় সেই শাস্তি? তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তবে শাস্তিটা নিয়ে এসে দেখাও।" (সূরা হূদ : আয়াত ৩২)

নূহ আলাইহিস্ সালাম বললেন : "দ্যাখো, তোমাদের শাস্তি দেয়া তো আমার কাজ নয়। সেটা আল্লাহর কাজ। তিনি চাইলে তোমাদের শাস্তি দেবেন। আর তিনি শাস্তি দিতে চাইলে তোমরা কিছুতেই তা ঠেকাতে পারবেনা। শুধু তাই নয়, তখন যদি আমিও তোমাদের কোনো উপকার করতে চাই, করতে পারবনা। আল্লাহর ফায়সালা পরিবর্তন করবার সাধ্য কারো নেই।" (সূরা ১১ হূদ : আয়াত ৩৩-৩৪)

এবার মহান আল্লাহ অহির মাধ্যমে তাঁর প্রিয় দাস নূহকে জানিয়ে দিলেন, "হে নূহ! তোমার জাতির যে ক'জন লোক ঈমান এনেছে, তাদের পর এখন আর কেউ ঈমান আনবেনা। সুতরাং তুমি তাদের কার্যকলাপে দুঃখিত হয়োনা।" (সূরা ১১ হূদ : আয়াত ৩৬)

আল্লাহর বিচক্ষণ বান্দাহ ও নবী নূহ আলাইহিস্ সালাম এটাকে তাঁর অবাধ্য ও চরম অধপতিত জাতির উপর অচিরেই আল্লাহর আযাব আসবার সবুজ সংকেত মনে করলেন। তিনি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন : "আমার প্রভু! তুমি এই কাফিরগুলোর একজনকেও বাঁচিয়ে রেখোনা। তুমি যদি তাদের ছেড়ে দাও, তারা তোমার বান্দাদের বিপথগামী করে ছাড়বে। আর তাদের ঔরসের প্রজন্মও দুরাচারী আর কাফিরই হবে। প্রভু! তুমি আমাকে আর আমার বাবা মাকে মাফ করে দাও। আর সেসব নারী পুরুষকেও মাফ করে দাও, যারা মুমিন হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করেছে।" (সূরা ৭১ নূহ : আয়াত ২৬-২৮)

নূহ আরো বললেন, "প্রভু! এই লোকগুলোর মোকাবেলায় তুমি আমাকে সাহায্য করো। ওরা আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করছে। আমাকে অস্বীকার করছে। এখন আমার আর তাদের মাঝে তুমি চূড়ান্ত ফায়সালা করে দাও। তবে আমাকে আর আমার সাথি মুমিনদের তোমার পাকড়াও থেকে বাঁচাও।"[১১]

আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এবার কিন্তু একটা ফায়সালা হয়ে যাবে। কী সেই ফায়সালা? ফায়সালাটা হলো, আল্লাহ নূহের জাতির এই দুষ্ট লোকগুলোকে ধ্বংস করে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। এটাই আল্লাহর নিয়ম। কোনো জাতি বিপথগামী হলে আল্লাহ তাদের সত্যপথ দেখানোর জন্যে নবী বা সংশোধনকারী

পাঠান। নবীরা তাদের সত্য পথে আনার জন্যে সর্বোত্তম প্রচেষ্টা চালান। অসৎ লোকদের সাংঘাতিক বিরোধিতার মুখেও তারা জনগণকে সংশোধন করবার চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যান। কিন্তু তাদের সকল চেষ্টার পরও যখন আল্লাহ্ বাস্তবে দেখে নেন যে, এই লোকগুলো আর সত্য পথে আসবেনা, তখন তিনি তাদের ধ্বংস করে দেন।

নূহ আলাইহিস্ সালামের জাতির বাস্তব অবস্থাও ছিলো তাই। আল্লাহর নবী নূহ হাজার বছর ধরে তাদের আল্লাহর পথে আনার চেষ্টা করেন। দিনরাত তিনি তাদের বুঝান। গোপনে গোপনে বুঝান। জনসভা, আলোচনা সভা করে বুঝান। তারা শুনতে চায়না, তবু তিনি জোর গলায় তাদের ডেকে ডেকে বুঝান। তাঁকে দেখলে তারা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নিতো। তিনি কথা বলতে গেলে তারা কানে আংগুল চেপে ধরতো। হাজারো রকম তিরস্কার তারা তাঁকে নিয়ে করতো। বলতো এ-তো ম্যাজেসিয়ান।

কিন্তু তিনি তাদের সত্য পথে আনার অবিরাম চেষ্টা সাধনা চালিয়েই যান। কিছু যুবক অবশ্য ঈমান আনে। কিন্তু জাতির সর্দার নেতারা পরবর্তী সময় জনগণের আল্লাহর পথে আসার সমস্ত পথ বন্ধ করে দেয়। তখন তারা সবাই আল্লাহর চরম বিরোধী হয়ে যায়। তাদের সত্য পথে আসার আর কোনো সম্ভাবনাই বাকি থাকেনা। এমনকি তারা আল্লাহর নবীকে হত্যা করার পর্যন্ত ষড়যন্ত্র করে। অবশেষে আল্লাহ্ তাদের পৃথিবী থেকে ধ্বংস করার ফায়সালা করেন। তিনি নূহ্ আলাইহিস্ সালামকে নির্দেশ দেন: "নূহ আমার তদারকিতে তুমি একটি নৌযান তৈরি করো।"[১২]

আল্লাহ নূহ আলাইহিস্ সালামকে আরো বলে দিলেন : "চুলা ফেটে যখন পানি উঠবে, তখন তুমি নৌযানের মধ্যে সব রকমের জীবজন্তু এক জোড়া এক জোড়া উঠাবে। মুমিনদের উঠাবে। তোমার পরিবার পরিজনকেও উঠাবে। তবে তাদের উঠাবেনা যাদের ব্যাপারে আমি ফায়সালা দিয়ে দিয়েছি যে, তারা ডুবে মরবে।"[১৩]

আল্লাহর নবী নূহ আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর নির্দেশে তৈরি করতে শুরু করলেন এক বিরাট নৌযান। জাতির অসৎ নেতারা যখন সেখান দিয়ে যাতায়াত করতো, তারা নৌযান তৈরি নিয়েও নূহের প্রতি বিদ্রূপ করতো। তারা তাঁকে তিরস্কার করতো।[১৪] আসলে আল্লাহর ক্ষমতার প্রতি তাদের ঈমানই ছিলনা।

তারপর কি হলো? তারপর একদিন নৌযান তৈরি শেষ হলো। নূহ্ আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর নির্দেশের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

এরপর? এরপর একদিন হঠাৎ দেখা গেলো চুলা ফেটে মাটির নিচে থেকে অনর্গল পানি বেরুতে লাগলো। নূহ বুঝতে পারলেন আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে। নূহ ঈমানদারদের ডেকে বললেন : তোমরা জলদি করে নৌযানে উঠে

পড়ো। তিনি তাড়াতাড়ি করে সমস্ত ঈমানদার লোকদের নৌযানে তুলে দিলেন। সব রকমের জীবজন্তু একেক জোড়া তুলে নিলেন। দু'জন ছাড়া তাঁর পরিবারের সবাইকে তুলে নিলেন।

কে সেই দু'জন? এদের একজন নূহ আলাইহিস্ সালামের স্ত্রী। এই মহিলা কিন্তু বাপদাদার জাহেলি ধর্ম অনুসারীদের পক্ষ অবলম্বন করে। ফলে আল্লাহও তাকে প্লাবনের পানিতে ডুবিয়ে মারলেন। আরেকজন কে? আরেকজন হলো স্বয়ং নূহ আলাইহিস্ সালামের হতভাগ্য পুত্র। সেও ঈমান আনেনি।

নির্দেশ মতো সবাই যখন নৌযানে উঠে গেলো, তখন কি হলো? দেখতে দেখতে তখন ঘটে গেলো এক অবাক কাণ্ড! চারিদিকে জমিন ফেটে সৃষ্টি হলো অসংখ্য ঝর্ণাধারা। প্লাবনের বেগে মাটির নিচে থেকে উঠতে শুরু করলো পানি আর পানি! সাথে সাথে শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি। নিচে থেকেও উঠছে পানি। উপর থেকেও পড়ছে পানি। চারিদিকে পানি আর পানি। পানির উপর ভাসতে শুরু করলো নৌযান। নূহ আলাইহিস্ সালাম দোয়া করলেন :

"আল্লাহর নামে শুরু হচ্ছে এর চলা আর আল্লাহর নামেই থামবে এ নৌযান। আমার প্রভু অবশ্যি অতিশয় ক্ষমাশীল দয়াময়।" (সূরা ১১ হূদ : আয়াত ৪১)

অদূরেই নূহের কাফির পুত্রটি দাঁড়িয়ে ছিলো। নূহ দেখলেন পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে এক বিরাট পানির ঢেউ এগিয়ে আসছে। তিনি চিৎকার করে ছেলেকে ডেকে বললেন : "এখনো সময় আছে ঈমান এনে আমাদের সাথি হয়ে যা। কাফিরদের সাথি হইস্নে। এক্ষুনি ডুবে মরবি।"

অসৎ ছেলেটি বললো : "আমি পাহাড়ে উঠে যাবো। পানি আমাকে কিছুই করতে পারবেনা।" নূহ বললেন : "একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া আজ কেউ রক্ষা পাবেনা।" এরি মধ্যে এক বিরাট ঢেউ এসে ছেলেকে তলিয়ে নিয়ে গেলো।[১৫]

আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন, নবীর পথে না চলার পরিণতি কতো ভয়াবহ। ঈমানের পথে না এলে নবীর ছেলে হলেও আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাওয়া যায়না। নবীর স্ত্রী হলেও মুক্তি পাওয়া যায়না। দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তির একমাত্র পথ হলো ঈমানের পথ, নবীর দেখানো পথ।

এরপর ঘটনা কি হলো? এরপর পানিতে সমস্ত কিছু ভেসে গেলো। বড় বড় পাহাড় পানির মধ্যে তলিয়ে গেলো। দিন যায়, রাত আসে। মাস যায়, মাস আসে। আকাশ আর পাতালের পানিতে পৃথিবী তলিয়েই চলেছে। নূহ আলাইহিস্ সালামের নৌযানের মানুষ আর প্রাণীগুলো ছাড়া সমস্ত জীবজন্তু মরে শেষ। একটি মানুষও আর বেঁচে নেই। সব দুষ্ট লোক আর আল্লাহর নবীর শত্রুরা ধ্বংস হয়ে শেষ হয়ে গেছে।

আল্লাহ তায়ালা এভাবে তাঁর প্রিয় নবী নূহ ও তাঁর সাথিদেরকে রক্ষা করলেন যালিমদের অত্যাচার ও ষড়যন্ত্র থেকে। তাই তিনি নূহকে নির্দেশ দিলেন এই ভাষায় শোকর আদায় করতে:

"শোকর সেই মহান আল্লাহর, যিনি যালিমদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন।" (সূরা ২৩ আল মুমিনুন : আয়াত ২৮)

সেই সাথে আল্লাহ নূহকে এই দুয়া করতেও নির্দেশ দিলেন :

"প্রভু! আমাকে বরকতপূর্ণ স্থানে অবতরণ করাও, আর তুমিই তো সর্বোত্তম স্থানে অবতরণ করিয়ে থাকো।" (সূরা ২৩ আল মুমিনুন : ২৯ আয়াত)

অবশেষে আল্লাহ একদিন হুকুম দিলেন : "হে পৃথিবী! সমস্ত পানি গিলে ফেলো। হে আকাশ! বর্ষণ বন্ধ করো।"[১৬]

মহান আল্লাহর নির্দেশে আকাশ পানি বর্ষণ বন্ধ করলো। পৃথিবী তাকে ডুবিয়ে রাখা সমস্ত পানি চুষে খেয়ে ফেললো। তারপর কি হলো?

তারপর নূহ আলাইহিস্ সালামের নৌযানটি জুদি[১৭] পাহাড়ের চূড়ায় এসে ঠেকলো। জুদি পাহাড় কোথায় জানেন? আর্মেনিয়া থেকে কুর্দিস্তান পর্যন্ত রয়েছে এক দীর্ঘ পর্বতমালা। এই পর্বতমালারই একটির নাম হলো জুদি পর্বত। এটি কুর্দিস্তান অঞ্চলে ইবনে উমর দ্বীপের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। মুসলমানরা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফত আমলে যখন ইরাক এবং আল জাযিরা বিজয় করেন, তখন মুসলিম সৈনিকদের অনেকেই জুদি পাহাড়ের উপর নূহ আলাইহিস্ সালামের নৌযান দেখতে পান।

নৌযান জুদি পর্বতে ঠেকার পর কি হলো? এবার আল্লাহ নির্দেশ দিলেন : "হে নূহ! নেমে পড়ো! নেমে আসো পৃথিবীতে। এখন থেকে তোমার প্রতি আর তোমার সংগি সাথিদের প্রতি আমার নিকট থেকে রইলো শান্তি আর প্রাচুর্য।"[১৮]

তাঁরা নেমে আসেন পৃথিবীতে। সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকেন আল্লাহর অনুগত দাস হিসেবে। এভাবেই আল্লাহ সৎ লোকদের প্রতিষ্ঠিত করে দেন পৃথিবীর বুকে।

সবশেষে কয়েকটি খবর জানিয়ে দিচ্ছি:

১. কুরআনে নূহ আলাইহিস্ সালামের নাম উল্লেখ হয়েছে তেতাল্লিশ বার।

২. যেসব সূরায় নূহের কথা ও কাহিনী উল্লেখ হয়েছে, সেগুলো হলো : আলে ইমরান, আনয়াম, নিসা, আ'রাফ, তাওবা, ইউনুস, হূদ, ইবরাহিম, বনি ইসরাঈল, মরিয়ম, আম্বিয়া, হজ্জ, মুমিনুন, ফুরকান, শোয়ারা, আনকাবুত, আহযাব, সাফফাত, সোয়াদ, মুমিন, শূরা, কাফ, যারিয়াত, নাজম, কামার, হাদিদ, তাহরিম, নূহ।

৩. নূহ আলাইহিস্ সালামের বিস্তারিত কাহিনী জানা যাবে সূরা আ'রাফ, হূদ, মুমিনুন, শোয়ারা এবং নূহে।

টিকা

১. তাদের এই মূর্তি দেবদেবীদের নাম উল্লেখ হয়েছে সূরা নূহের ২৩ আয়াতে।
২. সূরা নূহ : আয়াত ১।
৩. সূরা ১১ হূদ : আয়াত ২৭।
৪. সূরা ২৩ আল মুমিনুন : আয়াত ২৩-২৫।
৫. সূরা ১১ হূদ : আয়াত ২৭।
৬. সূরা ৭ আল আ'রাফ : আয়াত ৬০।
৭. সূরা ৭ আল আ'রাফ : আয়াত ৬১-৬২। সূরা ১১ হূদ : আয়াত ২৮-২৯।
৮. সূরা ৭১ নূহ : আয়াত ২৩-২৪।
৯. সূরা নূহ : আয়াত ২২।
১০. সূরা ২৬ শোয়ারা : আয়াত ১১৬।
১১. সূরা ২৩ আল মু'মিনূন : ২৬ আয়াত। সূরা ২৬ আশ্ শোয়ারা : আয়াত ১১৭-১১৮।
১২. সূরা ১১ হূদ : আয়াত ৩৭।
১৩. সূরা ২৩ আল মু'মিনুন : আয়াত ২৭।
১৪. সূরা ১১ হূদ : আয়াত ৩৮।
১৫. সূরা ১১ হূদ : আয়াত ৪২-৪৩।
১৬. সূরা হূদ : আয়াত ৪৪।
১৭. সূরা হুদ : আয়াত ৪৪।
১৮. সূরা হুদ : আয়াত ৪৮।

❖

৪

আ'দ জাতির নবী হূদ

আলাইহিস্ সালাম

নূহ আলাইহিস্ সালামের পরে

আমরা আগেই জেনেছি, নূহ আলাইহিস্ সালামের সময় আল্লাহ তাঁর দীনের শত্রুদের প্লাবন দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। বাঁচিয়ে রেখেছিলেন কেবল নূহ আলাইহিস্ সালাম আর তাঁর ঈমানদার সাথিদের। এই বেঁচে থাকা মুমিনরা আর তাঁদের বংশধররা অনেকদিন আল্লাহর বিধান আর নবীর আদর্শ মাফিক জীবন যাপন করেন।

কিন্তু দীর্ঘদিন পর লোকেরা আবার ভুল পথে চলতে শুরু করে। তারা নবীর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়। এক আল্লাহকে ভুলে গিয়ে বহু মনগড়া খোদা বানিয়ে নেয়। এমনি করে ডুবে পড়লো তারা শিরক আর মূর্খতার অন্ধকারে।

আ'দ জাতি

সেকালে আরবের সবচে' শক্তিশালী জাতি ছিলো আ'দ জাতি। ইয়েমেন, হাজরামাউত ও আহকাফ অঞ্চল নিয়ে এরা এক বিরাট রাজ্য গড়ে তুলেছিল। তাদের ছিলো অগাধ দৈহিক শক্তি আর ছিলো বিরাট রাজশক্তি। তারা গড়ে তুলেছিল বড় বড় শহর, বিরাট বিরাট গম্বুজধারী অট্টালিকা আর বিলাস সামগ্রী। নূহ আলাইহিস্ সালামের পর আল্লাহ তায়ালা আ'দ জাতিকে ক্ষমতা প্রদান করেন। তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানান। নিজের অপার অনুগ্রহে তাদের চরম উন্নতি দান করেন। ফলে গোটা আরবের উপর চলতে থাকে তাদের দাপট।

কিন্তু এ উন্নতির ফলে তারা গর্ব আর অহংকারে নিমজ্জিত হয়। নূহ আলাইহিস্ সালামের দেখানো পথ থেকে তারা দূরে সরে যায়। মহান আল্লাহকে ভুলে গিয়ে তারা নিজেদের স্বার্থে বহু মনগড়া খোদা বানিয়ে নেয়। নূহ আলাইহিস্ সালামের তুফানের পর তারাই সর্ব প্রথম মূর্তি পূজা শুরু করে।

তাদের জাতীয় নেতা ও কর্তারা ছিলো যালিম, স্বৈরাচারী। জনগণকে তারা নিজেদের হুকুমের দাস বানিয়ে নিয়েছিল। তারা এতোই অহংকারী হয়ে উঠেছিল যে, কাউকেই পরোয়া করতোনা। তারা ঘোষণা করলো, "আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আর কে আছে?"[১] অথচ তারা ভুলে গেলো যে, আল্লাহই সর্বশক্তিমান। আল্লাহই তাদের এতো উন্নতি দান করেছেন।

মুক্তির বার্তা নিয়ে এলেন হূদ

আদ জাতিকে সুপথ দেখাবার জন্যে আল্লাহ তাদের মাঝে একজন নবী পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেন। এ জাতির সবচে' ভালো লোক হূদকে আল্লাহ তাদের নবী মনোনীত করেন। মহান আল্লাহ বলেন: "আমি আ'দ জাতির কাছে তাদের ভাই হূদকে রসূল বানিয়ে পাঠালাম। হূদ আমার বাণী পেয়ে তার জাতির লোকদের ডেকে বললো :

"হে আমার জাতির ভাইয়েরা! তোমরা আল্লাহর হুকুম পালন করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। তোমরা কি তোমাদের পাপ কাজের অশুভ পরিণতির ভয় করোনা?" (সূরা ৭ আল আ'রাফ : আয়াত ৬৫)

আল্লাহর নবী হূদ আলাইহিস্ সালাম তাদের বুঝালেন :

"ভাইয়েরা আমার! তোমরা তোমাদের দয়াময় প্রভুর কাছে ক্ষমা চাও। তাঁর দিকে ফিরে এসো। তাহলে তিনি তোমাদের বৃষ্টি বর্ষিয়ে পানি দেবেন। তোমাদের বর্তমান শক্তিকে আরো শক্তিশালী করবেন। দেখো! তোমরা অপরাধীদের মতো তাঁকে উপেক্ষা করোনা।" (সূরা ১১ হূদ : আয়াত ৫২)

দরদ ভরা হৃদয় নিয়ে হযরত হূদ তাদের আরো বললেন :

"তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করবে না? দেখো! আমি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত রসূল! সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো। আর আমার কথা মেনে চলো। আমি যে তোমাদের বুঝাবার এতো চেষ্টা করছি, এর বিনিময়ে তো আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাইনা। এতে কি তোমরা বুঝতে পারছনা, একাজে আমার কোনো স্বার্থ নেই? আমি তো কেবল তোমাদের কল্যাণই চাই। আমাকে প্রতিদান দেবেন তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন।" (সূরা ২৬ শোয়ারা : আয়াত ১২৪-১২৭)

হূদ আলাইহিস্ সালাম তাদের আরো বুঝালেন :

"তোমাদের একি হলো, প্রতিটি স্থানেই কেন তোমরা অর্থহীন স্মারক ইমারত (ভাস্কর্য) বানাচ্ছো? কেনইবা এতো অট্টালিকা গড়ে তুলছো? এগুলো কি তোমাদের চিরদিন বাঁচিয়ে রাখবে ভাবছো? তোমরা যখন কাউকেও পাকড়াও করো, তখন কেন নির্বিচারে অত্যাচারীর ভূমিকা পালন করো? এবার এসো আল্লাহকে ভয় করো আর আমার কথা মেনে নাও। সেই মহান প্রভুকে ভয় করো যিনি তোমাদের সব কিছুই দিয়েছেন। তোমরা তো জানোই তিনি তোমাদের দিয়েছেন অগণিত পশু, অসংখ্য সন্তান সন্তুতি। দিয়েছেন কতনা বাগ-বাগিচা, নদ-নদী, ঝর্ণাধারা। তোমাদের ব্যাপারে এক গুরুতর দিনের শাস্তির ভয় আমি করছি।" (সূরা ২৬ শোয়ারা : আয়াত ১২৮-১৩৫)

এভাবে হূদ আলাইহিস্ সালাম তাঁর জাতিকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করেন। তাদের তিনি মহান প্রভু আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেন। বস্তুগত উন্নতির

মোহে আল্লাহকে ভুলে থাকতে নিষেধ করেন। পরকালের খারাপ পরিণতির কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দেন। তাদের ক্ষমা চাইতে বলেন। আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে বলেন। আল্লাহর হুকুম পালন করতে এবং নবীর পথে চলতে বলেন। তিনি তাদের বলেন, এটাই পার্থিব কল্যাণ আর পরকালীন মুক্তির একমাত্র পথ।

নেতারা নবীর প্রতিপক্ষ হলো

এতো আন্তরিক আহ্বান আর কল্যাণময় উপদেশ সত্ত্বেও আদ জাতি নবীর কথা শুনলনা। আল্লাহর পথে এলোনা। দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করতে পারলনা। উল্টো তারা নবীর সাথে বিতর্ক শুরু করলো। তাদের শাসকরা নবীকে বললো :

"আমরা মনে করি তুমি বোকা। তোমার কোনো বুদ্ধি নেই। তাছাড়া আমাদের ধারণা, তুমি এসব মিথ্যে কথা বলছো।" (সূরা ৭ আল আ'রাফ : আয়াত ৬৬)

তারা আল্লাহর রসূলকে আরো বললো :

"তোমার উপদেশ আমরা মানিনা। তোমার এসব উপদেশ সেকেলে লোকদের অভ্যাস ছাড়া আর কিছু নয়। আসলে আমাদের উপর কোনো শাস্তিই আসবেনা।" (সূরা ২৬ শোয়ারা : আয়াত ১৩৬-১৩৮)

তাদের প্রতিবাদের জবাবে আল্লাহর নবী বললেন :

"হে আমার জাতির ভাইয়েরা! আমি কোনো বোকা নির্বোধ ব্যক্তি নই। বরং আমি বিশ্ব জগতের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রসূল। আমি তো কেবল তোমাদের কাছে আমার প্রভুর বার্তাই পৌছে দিচ্ছি। আর আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত কল্যাণকামী।" (সূরা ৭ আল আ'রাফ : ৬৭-৬৮)

হযরত হূদ তাদের আরো বললেন :

"তোমাদের সতর্ক করার জন্যে তোমাদের জাতিরই এক ব্যক্তির কাছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে 'উপদেশ বার্তা' এসেছে বলে কি তোমরা বিস্মিত হচ্ছো? স্মরণ করো, নূহের জাতির পর আল্লাহ তো তোমাদেরকেই পৃথিবীর প্রতিনিধি বানিয়েছেন। তোমাদের জনবল ও দেহবলের অধিকারী করেছেন। সুতরাং আল্লাহর দানশীলতাকে স্মরণ রেখো। আশা করা যায় তাহলে তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।" (সূরা ৭ আল আ'রাফ : আয়াত ৬৯)

পার্থিব কায়েমি স্বার্থ আর শয়তানের ধোকা আদ জাতির নেতাদের প্রতারিত করলো। তারা আল্লাহর নবীকে বলে দিলো :

"হে হূদ! তুমি কি এ জন্যে (নবী) হয়ে এসেছো যে, আমরা কেবল এক খোদার ইবাদত করবো আর আমাদের বাপদাদারা যেসব মাবুদের (দেব দেবীর) পূজা করতো, তাদের ত্যাগ করবো? তুমি তো আমাদের কাছে কোনো দলিল প্রমাণ নিয়ে আসোনি। আমরা কখনো তোমার কথায় আমাদের খোদাগুলোকে ত্যাগ করবোনা। আমরা বলছি, আমাদের খোদাদের কোনো একটির গজব তোমার উপর আপতিত হয়েছে।"[২]

এবার আল্লাহর নবী হূদ আলাইহিস্ সালাম তাদের বললেন :

"তোমাদের উপর তোমাদের মালিক আল্লাহর অভিশাপ আর গজব এসে পড়েছে। তোমরা কি আমার সাথে সেই সব মনগড়া খোদাদের ব্যাপারে বিতর্ক করছো, যেগুলোর নাম তৈরি করেছো তোমরা নিজেরা আর তোমাদের বাপ দাদারা? অথচ সেগুলোর পক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো প্রমাণ নেই। তোমরা যদি আমার কথা না শোনো, তবে অপেক্ষা করতে থাকো। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।" (সূরা ৭ আল আ'রাফ : আয়াত ৭১)

হযরত হূদ আলাইহিস্ সালামের দীর্ঘ দাওয়াতের ফলে জনগণের মধ্যে একটা নাড়া পড়েছিল। তারা শিরক করছিল ঠিকই, কিন্তু আল্লাহকে তারা জানতো। আর হূদ আলাইহিস্ সালাম যেহেতু তাদেরকে আল্লাহর দিকেই ডাকছিলেন, সুতরাং তাঁর দাওয়াতের একটা বিরাট প্রভাব জনগণের উপর পড়ছিল। তাই জনগণ হযরত হূদের প্রতি ঈমান এনে ফেলতে পারে এই ভয়ে ক্ষমতাসীন শাসক ও নেতারা ময়দানে নেমে এলো। জনসভা করে তারা হূদ আলাইহিস্ সালামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উথাপন করতে থাকলো। তারা জনগণকে বললো :

"এ ব্যক্তি তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ। তোমরা যা খাও, সেও তাই খায়। তোমরা যা পান করো, সেও তাই পান করে। কেমন করে সে নবী হতে পারে? তবে তার কথা মেনে নিলে তোমাদের দারুণ ক্ষতি হবে। হূদ যে তোমাদের বলছে, তোমরা যখন মরে মাটির সাথে মিশে গিয়ে হাড় গোড়ে পরিণত হবে, তখন তোমাদের আবার কবর থেকে বের করে আনা হবে। তার এই অঙ্গীকার অসম্ভব। আমাদের এই পৃথিবীর জীবনটাই তো একমাত্র জীবন। আমাদের মরণ বাঁচন সব এখানেই শেষ। আসলে আমাদের আর কখনো উঠানো হবেনা। আল্লাহর নাম নিয়ে হূদ মূলত মিথ্যে বলছে। আমরা তার কথা মানিনা।"[৩]

কিছু লোক ঈমান আনলো

বিবেকবান লোকদের মনে সত্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হলেও যালিম অত্যাচারী শাসকদের ভয়ে তারা সত্য গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেনি। কেবল কিছু সংখ্যক সাহসী যুবক যুবতীই আল্লাহর পথে এগিয়ে এলো। তারা নবীর সাথি হলো। জীবন বাজি রেখে তারা আল্লাহর পথে কাজ করতে থাকলো।

এখন জাতি সুস্পষ্টভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো। এক পক্ষে রয়েছেন আল্লাহর নবী আর তাঁর সাথি একদল যুবক যুবতী। গোটা জাতির তুলনায় এদের সংখ্যা ছিলো খুবই কম। প্রতিপক্ষে ছিলো শাসক গোষ্ঠী আর ঐসব লোক, বাতিল সমাজের সাথে জড়িত ছিলো যাদের স্বার্থ। নবীর নেতৃত্বে এ

সমাজ ভেঙ্গে নতুন সমাজ গঠিত হলে এদের স্বার্থ নষ্ট হবে বলে এরা সবাই নবী ও নবীর সাথিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললো।

সময় ঘনিয়ে এলো

আল্লাহর নবী হূদ আলাইহিস্ সালাম অবশেষে তাদের চরম বিরোধিতা ও প্রতিরোধের মোকাবেলায় বলে দিলেন :

"আমি তোমাদের সামনে স্বয়ং আল্লাহকেই সাক্ষ্য হিসেবে পেশ করছি। আর তোমরা সাক্ষী থাকো, আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতায় তোমরা যাদের অংশীদার বানাচ্ছো আমি তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছি। তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে যা করার করো। আমার ভরসা তো মহান আল্লাহর উপর। তিনি আমারও মালিক, তোমাদেরও মালিক। সমস্ত জীবের ভাগ্য নিয়ন্তা তিনিই। তিনি যা করেন তাই সঠিক।" (সূরা হূদ ১১: ৫৪-৫৬)

হযরত হূদ তাদের আরো বলে দিলেন :

"তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নিতে চাও, নাও। কিন্তু জেনে রাখো, আল্লাহ আমাকে যে বার্তা নিয়ে পাঠিয়েছেন তা আমি তোমাদের কাছে পুরোপুরি পৌঁছে দিয়েছি। এখন আমার প্রভু তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে বসাবেন এবং তোমরা তাঁর কোনোই ক্ষতি করতে পারবেনা।" (সূরা ১১ হূদ : আয়াত ৫৭)

অতপর সব ধরনের চেষ্টা শেষ করার পর হযরত হূদ আলাইহিস্ সালাম যখন দেখলেন এদের আর সঠিক পথে আসার সম্ভাবনা নেই, তখন মনে বড় কষ্ট নিয়ে তিনি দোয়া করলেন :

"আমার প্রভু! এরা তো আমাকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। এখন তুমিই আমাকে সাহায্য করো।" (সূরা ২৩ আল মু'মিনুন : আয়াত ৩৯)

জবাব এলো :

"অচিরেই এরা নিজেদের কৃতকর্মের (নিষ্ফল) অনুশোচনা করবে।"[৪]

ধ্বংস হলো আ'দ জাতি

আল্লাহর নবী হূদ আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে সংকেত পেলেন যে, তিনি এখন এ জাতিকে ধ্বংস করে দেবেন। বড় মনবেদনার সাথে তিনি তাদের জানিয়ে দিলেন : "আল্লাহর রোষ আর আযাব তোমাদের জন্যে অবধারিত হয়ে পড়েছে।" জাতির শাসকরা অহংকার করে বললো: "আমাদের চাইতে শক্তিশালী আর কে আছে?" তারা হযরত হূদকে আরো বললো : "তুমি যে আমাদের শাস্তি দেয়ার অংগীকার করছো, সত্যবাদী হলে সেই শাস্তি দিয়ে দেখাও!"

অবশেষে তাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়লো। উপত্যকার দিক থেকে আযাব তাদের দিকে ধেয়ে আসছিল। তারা বললো : "এ তো মেঘ! প্রচুর বৃষ্টি হবে!" হূদ বললেন :

"এই সেই অংগীকার, যার জন্যে তোমরা তাড়াহুড়া করছিলে। এটা প্রচণ্ড ঝড়। এতে রয়েছে চরম যন্ত্রণাদায়ক আযাব। এটা প্রতিটি বস্তুকে ধ্বংস করে রেখে যাবে।" (সূরা ৪৬ আহকাফ : আয়াত ২৪)

অল্প পরেই ধেয়ে এলো মেঘ। ধ্বংস করে দিয়ে গেলো সব কিছু। ধ্বংস হয়ে গেলো আল্লাদ্রোহী শক্তি। আল কুরআনে তাদের ধ্বংসের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এভাবে :

"আর আ'দ জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে ঠাণ্ডা ঝড় বায়ু দিয়ে। সে বায়ু তিনি তাদের উপর দিয়ে চালিয়ে দেন একাধারে সাত রাত আট দিন। অতপর সেখানে তারা চিৎপাত হয়ে পড়ে থাকলো, যেনো উপড়ানো খেজুর গাছের কাণ্ড। কোনো পাপীই তা থেকে রক্ষা পায়নি।" (সূরা ৬৯ আল হাক্কাহ : আয়াত ৬-৮)

"এক বিকট ধ্বনি এসে তাদের পাকড়াও করলো। আর আমি তাদের ধ্বংস করে দিলাম খড় কুটোর মতো।"[৫]

এভাবে ধ্বংস হয়ে গেলো তৎকালীন বিশ্বের প্রবল শক্তিশালী আ'দ জাতি। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দিলেন, ধ্বংস করে দিলেন তাদের দেশ ও সুরম্য শহর। ধূলিস্যাত হয়ে গেলো তাদের অহংকার। বিরান হয়ে গেলো তাদের জনবসতি। তাদের শহর 'আহকাফ' এখন এক বিরাট মরুভূমি। এখনো সেই ভূতুড়ে মরুভূমি অতিক্রম করতে লোকেরা ভয় পায়। শোনা যায়, সেই মরুভূমিতে যা কিছু পড়ে সবই তলিয়ে যায়।

প্রাচীনকালে আদ জাতি এতোই নাম করা জাতি ছিলো যে, এখনো লোকেরা তাদের নামানুযায়ী যে কোনো প্রাচীন জাতিকে 'আদি জাতি', 'আদি বাসি' বলে থাকে। প্রাচীন ভাষাকে 'আদি ভাষা' বলে থাকে। এতো প্রতাপশালী একটি জাতিকেও মহান আল্লাহ ধ্বংস করে দিলেন তাঁর আয়াতকে অস্বীকার করা ও তার নবীকে অমান্য করার ফলে। তাদের ধ্বংসের ইতিহাসের মধ্যে পৃথিবীর সকল জাতির জন্যেই রয়েছে উপদেশ।

হযরত হূদ ও তাঁর সাথিরা বেঁচে গেলেন

কিন্তু এই সর্বগ্রাসী ধ্বংস থেকে আল্লাহ পাক হযরত হূদ আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিলেন তাদের বাঁচিয়ে দিলেন। মহান আল্লাহ বলেন:

"যখন আমার হুকুম এসে গেলো, তখন আমি নিজ রহমতে হূদ ও তার সাথে ঈমান গ্রহণকারীদের রক্ষা করলাম আর এক কঠিন আযাব থেকে তাদের বাঁচালাম।" (সূরা ১১ হূদ : আয়াত ৫৮)

আযাব আসার পূর্বক্ষণে আল্লাহ পাকের নির্দেশে হূদ আলাইহিস্ সালাম তাঁর সাথিদের নিয়ে নিরাপদ এলাকায় আশ্রয় নেন। এভাবেই আল্লাহ তাদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন।

মহান আল্লাহ আ'দ জাতির যেসব পাপিষ্ঠদের আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছেন তারা ছিলো 'প্রথম আ'দ।'[৬] আর হূদ আলাইহিস্ সালামের সাথে যারা বেঁচে গিয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন 'দ্বিতীয় আ'দ'। পরবর্তীকালে এই দ্বিতীয় আ'দই আবার বড় আকার ধারণ করে।

হূদ আলাইহিস্ সালাম কিসের দাওয়াত দিয়েছেন?

হূদ আলাইহিস্ সালাম তাঁর জাতিকে কি দাওয়াত দিয়েছেন? আসুন, কুরআন মজিদ দেখি। কুরআন বলে হযরত হূদ তাঁর জাতিকে বলেছিলেন :

১. হে আমার জাতি! তোমরা কেবল এক আল্লাহর হুকুম পালন করো।
২. আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ (হুকুম কর্তা) নেই।
৩. নিজেদের অপরাধের জন্যে তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও।
৪. তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে এসো।
৫. আমি তো কেবল আমার প্রভুর বার্তা তোমাদের কাছে পৌছে দিচ্ছি।
৬. আমি কেবল তোমাদের কল্যাণ চাই।
৭. আমি বোকা নই, আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রসূল।
৮. কল্যাণ চাও তো মহান আল্লাহর দানসমূহের কথা স্মরণ করো।
৯. আমার প্রভু সঠিক পথে পরিচালিত করেন।
১০. সমস্ত প্রাণীর ভাগ্য আল্লাহর হাতে।
১১. আমি আমার মালিক ও তোমাদের মালিক আল্লাহর উপর ভরসা রাখি।
১২. তোমরা বিবেক খাটিয়ে চলো।
১৩. তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহ অন্য কোনো জাতিকে তোমাদের স্থানে বসাবেন।
১৪. আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতায় তোমরা যাদের শরিক করছো আমি তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছি।
১৫. আমি তোমাদের জন্যে একজন বিশস্ত রসূল। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো আর আমার আনুগত্য করো।
১৬. আমি তোমাদের উপর এক কঠিন দিনের শাস্তির ভয় করছি।
১৭. মহান আল্লাহই সমস্ত জ্ঞানের উৎস।
১৮. এ কাজের বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাইনা। আমাকে প্রতিদান দেবার দায়িত্ব আল্লাহর।[৭]

কুরআনে হযরত হূদ ও আ'দ জাতির উল্লেখ

কুরআন মজিদে হূদ আলাইহিস্ সালামের নাম উল্লেখ হয়েছে সাত বার। আ'দ জাতির নাম উল্লেখ হয়েছে চব্বিশ বার। হূদ আলাইহিস্ সালামের নাম উল্লেখ হয়েছে সূরা আ'রাফ আয়াত ৬৫; হূদ আয়াত ৫০, ৫৩, ৫৮, ৬০, ৮৯ এবং

সূরা শোয়ারা আয়াত ১২৪। হযরত হূদ আলাইহিস্ সালাম ও আ'দ জাতির কথা উল্লেখ হয়েছে যেসব সূরায় সেগুলো হলো : সূরা আ'রাফ, সূরা তাওবা, সূরা হূদ, সূরা ইবরাহিম, সূরা হজ্জ, সূরা শোয়ারা, সূরা ফুরকান, সূরা আনকাবূত, সূরা সোয়াদ, সূরা মু'মিন, সূরা হামিম আস সাজদা, সূরা আহকাফ, সূরা কাফ, সূরা যারিয়াত, সূরা আন নাজম, সূরা আল কামার, সূরা আল হাক্কাহ এবং সূরা আল ফজরে। এসব সূরা থেকেই হূদ আলাইহিস্ সালামের জীবন কথা লেখা হলো।

টিকা

১. সূরা ৪১ হামিম আস সাজদা : আয়াত ১৫

২. সূরা ৭ আ'রাফ : আয়াত ৭০, সূরা ১১ হূদ : আয়াত ৫৩-৫৪।

৩. সূরা ২৩ আল মু'মিনুন : আয়াত ৩৩-৩৮

৪. সূরা ২৩ আল মু'মিনুন : আয়াত ৪০

৫. সূরা ২৩ আল মু'মিনুন : আয়াত ৪১

৬. সূরা ৫৩ আন নাজম : আয়াত ৫০

৭. হূদ আলাইহিস্ সালামের এই আহ্বনাগুলো সবই কুরআন থেকে নেয়া হয়েছে।

❖

সামুদ জাতির নবী সালেহ্

আলাইহিস্ সালাম

আগেই বলেছি, নবীকে অমান্য করার ফলে কী যে ভয়াবহ ধ্বংস নেমে এসেছিল আ'দ জাতির উপর। সে জাতির অহংকারী লোকেরা পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়। বেঁচে থাকেন কেবল হূদ আলাইহিস্ সালাম আর তাঁর গুটি কয়েক অনুসারী। এঁরা এবং এঁদের সন্তানরা অনেক দিন আল্লাহর পথে চলতে থাকেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তারা মহান আল্লাহকে ভুলে যেতে থাকে। পার্থিব মোহ তাদের বিপথে পরিচালিত করে। দুনিয়ার আকর্ষণ তাদের পরকালীন সাফল্যের কথা ভুলিয়ে রাখে। ফলে পার্থিব উন্নতির জন্যে তারা নবীর পথ থেকে বিচ্যুত হয়।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় সুবিধা ভোগীরা সমাজের স্বার্থকে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়। এরা মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে 'যেমনি নাচাও তেমনি নাচি' ধরনের অনেক মূর্তি দেব-দেবী বানিয়ে নেয়। এভাবে একদিকে তারা শির্‌ক, কুফর ও জাহিলিয়াতের চরম অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে জৈবিক ভোগ বিলাসের জন্যে পাহাড় খোদাই করে প্রাচীন ভারতীয় ইলোরা অজন্তার মতো অসংখ্য মনোহরী প্রাসাদ পড়ে তোলে। এই আল্লাহ বিমুখ বৈষয়িক উন্নতি তাদেরকে চরম হঠকারী ও অহংকারী বানিয়ে তোলে। এই হঠকারী জাতির নাম কি আপনারা জানেন?

- হ্যাঁ, এদের নামই সামুদ জাতি।

সামুদ জাতির আবাস

হূদ আলাইহিস্ সালামের সাথে আ'দ জাতির যে লোকগুলো বেঁচে গিয়েছিলেন, সামুদ জাতি তাদেরই উত্তর পুরুষ। পরবর্তীকালে এ বংশের কোনো প্রভাবশালী নেতার নামে এরা 'সামুদ জাতি' নামে পরিচিত হয়। প্রথম আ'দের ধ্বংসের পর উত্তর দিকে সরে এসে এরা নিজেদের আবাস ও বসতি গড়ে তোলে। সেকালে এদের আবাস এলাকার নাম ছিলো 'হিজর'। এ কারণে কুরআনে তাদেরকে 'আসহাবুল হিজর' হিজরবাসী নামেও আখ্যায়িত করা হয়েছে।[১] তাদের সেই ঐতিহাসিক এলাকার বর্তমান নাম হলো 'ফাজ্জুন নাকাহ' এবং 'মাদায়েনে সালেহ'। এ স্থানটির অবস্থান হিজায ও সিরিয়ার গোটা মধ্যবর্তী অঞ্চল জুড়ে।

বৈষয়িক উন্নতি ও নৈতিক অধঃপতন

সামুদ জাতির বৈষয়িক ও নৈতিক অবস্থা ছিলো আ'দ জাতিরই অনুরূপ। সামুদ

জাতি সমতল ভূমি আর পাহাড়ের গাত্র খোদাই করে গড়ে তোলে ভুরি ভুরি সুরম্য অট্টালিকা। এগুলোর প্রযুক্তিগত কারুকাজ ছিলো অতি উন্নত। তাছাড়া এগুলো ছিলো অত্যন্ত বিলাসবহুল। ছিলো ঝর্ণাধারা, বাগবাগিচা, থরে থরে খেজুরের বাগান। এতো সব প্রাসাদ, মনোরম উদ্যান আর স্মৃতিসৌধ তারা কেন গড়ে তুলেছিল? কুরআন বলছে 'ফারেহীন' অর্থাৎ তারা এগুলো গড়ে তুলেছিল গর্ব অহংকার, অর্থ, ক্ষমতা আর প্রযুক্তিগত উন্নতির বাহার দেখাবার জন্যে।[২] কুরআন আরো বলছে, তারা সাধারণ জনগণকে যুলুম শোষণের মাধ্যমে দুর্বল করে রেখেছিল। গোটা জনগণের তুলনায় অল্প সংখ্যক লোকের হাতেই কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব।

মূর্তি পূজাকে তারা তাদের ধর্ম বানিয়ে নিয়েছিল। আর মূর্তিগুলোর উপর পৌরহিত্য করতো এসব নেতারা। দেব দেবীর মূর্তির নামেই জনগণকে করা হতো শোষণ। মনগড়া দেব দেবীর পূজা অর্চনার মাঝেই ছিলো তাদের যাবতীয় সুবিধা। ধর্মের মুখোশ পরেই তারা আল্লাহদ্রোহিতার নেতৃত্ব দেয়।

এর পয়লা সুবিধা ছিলো এই যে, দেব দেবীর নামে নেতাদের পক্ষে নিজেদের মনগড়া আইনই জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া ছিলো অত্যন্ত সহজ। দ্বিতীয় সুবিধা ছিলো, অসাড় দেব দেবীদের পক্ষে ঠাকুরগিরি করে জনগণকে শোষণ করার পথ ছিলো অতিশয় সুগম। তাছাড়া পুরোহিত সেজে জনগণের উপর কর্তৃত্ব করা ছিলো খুবই সহজ। এভাবে জনগণ ছিলো সমাজপতিদের দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ। অর্থাৎ জনগণ ছিলো সমাজপতিদের হুকুমের দাস। সমাজপতিরা ছিলো যালিম, প্রতারক আর শোষক। এই ঘুণেধরা নোংরা নৈতিক ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাদের শিল্প, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত উন্নতির বাহার। বাইরের চাকচিক্য দিয়ে ঢেকে রেখেছিল তাদের ভেতরের কলুষতা।

আলোর মশাল নিয়ে এলেন সালেহ

এই অধঃপতিত জাতিকে মুক্তির পথ দেখাবার জন্যে মহান আল্লাহ সামুদ জাতির সবচাইতে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি সালেহকে তাদের নবী নিযুক্ত করেন। আল্লাহর বাণী আর হিদায়াতের আলো নিয়ে হযরত সালেহ আলাইহিস্ সালাম হাজির হলেন জাতির জনগণ ও নেতৃবৃন্দের সামনে। অত্যন্ত দরদ ভরা হৃদয় নিয়ে তিনি তাদের আহ্বান জানালেন কল্যাণ ও মুক্তির দিকে। আহ্বান জানালেন তাদের প্রভু ও মালিক মহান আল্লাহর দিকে। বললেন :

"হে আমার জাতির ভাইয়েরা! তোমরা এক আল্লাহর হুকুম পালন করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। নেই কোনো হুকুমকর্তা। তিনিই তো যমীন থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। অতপর এখানেই তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুতরাং তোমাদের অপরাধের জন্যে তাঁর কাছে ক্ষমা চাও আর তাঁর

দিকে ফিরে এসো। তিনি অবশ্যি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবেন।" (সূরা ১১ হূদ : আয়াত ৬১)

তাদের ভাই সালেহ তাদের আরো উপদেশ দিলেন :

"তোমরা কি ভয় করবেনা? আমি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত রসূল। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো আর আমার কথা মেনে নাও। তোমাদের বুঝাবার জন্যে আমি যে এতো কষ্ট করছি, এর বিনিময়ে তো আমি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাইনা। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহর দায়িত্বে। তোমাদের এইসব উদ্যান, ঝর্নাধারা, ক্ষেত খামার, বাগান ভরা রসালো খেজুর আর অহংকার প্রদর্শনের জন্যে পাহাড় গাত্রে নির্মিত বালাখানাসমূহের মধ্যে কি তোমাদের চিরদিন নিরাপদে থাকতে দেয়া হবে? সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো আর আমার কথা মেনে নাও। এই সীমালংঘনকারী নেতাদের হুকুম মেনোনা। তারা তো পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। কোনো সংস্কার সংশোধনের কাজ তারা করছেনা।" (সূরা ২৬ শোয়ারা : আয়াত ১৪২-১৫২)

এসব মর্মস্পর্শী উপদেশের জবাবে জাতির নেতারা বললো :

"হে সালেহ! এতোদিন তোমাকে নিয়ে আমাদের কতই না আশা ভরসা ছিলো। আর এখন কিনা তুমি আমাদেরকে আমাদের দেব দেবীদের পূজা উপাসনা থেকে বিরত রাখতে চাও! তোমার কথায় আমাদের সন্দেহ সংশয় রয়েছে।" (সূরা ১১ হূদ : আয়াত ৬২)

সালেহ বললেন :

"ভাইয়েরা আমার! তোমরা একটু ভেবে দেখো। আমি যদি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এক উজ্জ্বল প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি আর তাঁর বিশেষ অনুগ্রহেও ধন্য হয়ে থাকি, তবে কে আমাকে তাঁর পাকড়াও থেকে রক্ষা করবে যদি আমি তাঁর নির্দেশের খেলাফ করি?" (সূরা ১১ হূদ : আয়াত ৬৩)

তাদের কল্যাণের পথে আনার জন্যে হযরত সালেহ এতোভাবে তাদের বুঝালেন। কিন্তু তারা বুঝলনা। তারা শলা পরামর্শ করলো : "আমাদের সবার মাঝে সে একজন মাত্র লোক। আমরা সবাই তার অনুসরণ করবো? তাহলে তো আমরা ভ্রান্তি আর অগ্নিতে নিমজ্জিত হবো। আমাদের সবার মাঝে কেবল কি তারই উপর উপদেশ অবতীর্ণ হলো? আসলে সে মিথ্যাবাদী।"

সাধারণ জনগণের মন হযরত সালেহর উপদেশে বিগলিত হচ্ছিল। কিন্তু এইভাবে তারা জনগণকে ডেকে এনে আবার বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলো।

নিদর্শন দেখাবার দাবি

জাতির নেতারা এবার হযরত সালেহর প্রতি এক বিরাট চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলো। তারা বললো :

"তোমার উপর কেউ যাদু করেছে। নইলে তুমি তো আমাদেরই মতো একজন মানুষ। হ্যাঁ, তবে যদি সত্যি তুমি নবী হয়ে থাকো, তাহলে কোনো নিদর্শন দেখাও।" (সূরা ২৬ শোয়ারা : আয়াত ১৫৩-১৫৪)

কেউ কেউ বলেছেন, একথা বলে তারা একটি বড় পাথর খণ্ডের প্রতি ইংগিত করে বললো, এই পাথরের ভেতর থেকে যদি একটি গাভীন উটনী বের করে আনতে পারো, তবে আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনবো এবং তোমার আনুগত্য করবো। তারা মনে করেছিল, তাদের এ দাবি পূরণ করা সালেহ্‌র জন্যে অসম্ভব। তারপর কি হলো? তারপর হযরত সালেহ তাদের নিদর্শন দেখাবার জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। তাঁর বুক ভরা আশা ছিলো, নিদর্শন দেখালে হয়তো তারা ঈমান আনবে।

আল্লাহ বললেন, হে সালেহ! আমি উটনী পাঠাচ্ছি ঠিকই। তবে এ উটনী হবে তাদের জন্যে চূড়ান্ত পরীক্ষা স্বরূপ। তুমি স্থির থাকো আর তাদের বলে দাও : "কূপের পানি পান করার জন্যে তাদের মাঝে পালা ভাগ করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ একদিন পুরো পানি পান করবে সেই উটনী আর অপরদিন পান করবে তারা সকলে এবং তাদের পশুরা।"[৩]

আল্লাহর নিদর্শনের উটনী

ব্যাস্, আল্লাহর নির্দেশে সমস্ত মানুষের চোখের সামনে পাথর থেকে উটনী বেরিয়ে এলো। হযরত সালেহ এবার উটনীর ব্যাপারে আল্লাহর ফরমান তাদের জানিয়ে দিলেন। একটি ছোট্ট ভাষণ তিনি তাদের সামনে পেশ করলেন :

"হে আমার জাতির ভাইয়েরা! সত্যিই আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা কেবল তাঁরই হুকুম পালন করো। দেখো, তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের সামনে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে পড়েছে। এটি আল্লাহর উটনী। এটি তোমাদের জন্যে চূড়ান্ত নিদর্শন। সুতরাং একে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও। আল্লাহর যমীনে সে মুক্তভাবে চরে বেড়াবে। কেউ তার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করবার চেষ্টা করোনা। তাহলে চরম পীড়াদায়ক শাস্তি তোমাদের গ্রাস করে নেবে। তোমরা সে সময়টার কথা স্মরণ করো, যখন মহান আল্লাহ আ'দ জাতির পর তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করেন এবং এমনভাবে এ ভূখণ্ডে তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করেন যে, তোমরা মুক্ত ময়দানে প্রাসাদ নির্মাণ করছো আর পাহাড় কেটে বিলাস গৃহ নির্মাণ করছো। সুতরাং মহান আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ করো। দেশে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের মতো সীমালংঘন করোনা।" (সূরা ৭ আল আ'রাফ : আয়াত ৭৩-৭৪)

জাতি বিভক্ত হয়ে গেলো দুইভাগে

মহান নবী হযরত সালেহ আলাইহিস্ সালামের আহ্বানে সত্য উপলব্ধি করতে পেরে জাতির কিছু লোক ঈমান আনলো। আল্লাহর পথে এলো। নবীর সাথি

হলো। তবে এদের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু জাতির নেতারা এবং তাদের অধিকাংশ অনুসারী ঈমান গ্রহণ করলোনা। এই হঠকারী নেতারা ঐ নির্যাতিত মুমিনদের লক্ষ্য করে বললো :

'তোমরা কি সত্যি জানো যে সালেহ তার প্রভুর রসূল।' (সূরা আল আ'রাফ : ৭৫)

মুমিনরা বললেন : "অবশ্যি আমরা জানতে পেরেছি এবং তার প্রতি ঈমান এনেছি।" (সূরা ৭ আল আ'রাফ : আয়াত ৭৫)

অহংকারী নেতারা বললো : "তোমরা যে বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছো আমরা তা মানিনা।" (সূরা ৭ আল আ'রাফ : আয়াত ৭৬)

তারা হত্যা করলো উটনীকে

দেখলেন তো, লোকগুলো কত বড় গাদ্দার। তারাই নবীর কাছে নিদর্শন দাবি করেছিল।' তারাই বলেছিল প্রমাণ স্বরূপ নিদর্শন দেখাতে পারলে তারা ঈমান আনবে। নবী নিদর্শন দেখালেন। তাদের চোখের সামনে এতো বড় কাণ্ড ঘটে গেলো। আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত নিদর্শন তাদের চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু অঙ্গীকার করেও তারা ঈমান আনলোনা।

আসলে সকল নবীর সমকালীন লোকেরাই এভাবে নবীর কাছে মুজিযা দাবি করতো। কিন্তু তা দেখার পর আর তারা ঈমান আনতোনা। এ জন্যেই আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামকে বলে দিয়েছেন, তোমার বিরোধীরা যতোই নিদর্শন দাবি করুক, নিদর্শন দেখার পর আর তারা ঈমান আনবেনা। ফেরেশতা এসেও যদি বলে, এমনকি মৃত ব্যক্তিও যদি ঘোষণা দেয় যে, ইনি আল্লাহর নবী, তবু তারা মানবেনা। যাই হোক আসল কথায় আসা যাক।

আল্লাহর উটনী স্বাধীনভাবে চরে বেড়াতে থাকলো। একদিনের সমস্ত পানিই উটনী পান করতো। তাদের ক্ষেত খামারে সে অবাধে বিচরণ করতো। এভাবে বেশ কিছুকাল অতিবাহিত হয়। ঈমান না আনলেও সম্ভবত এই অলৌকিক উটের ব্যাপারে তাদের মনে ভয় ঢুকে গিয়েছিল। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও উটনীকে তারা অনেক দিন বরদাশত করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর তারা ধৈর্য ধরে থাকতে পারলোনা।

তারা সলা পরামর্শ করলো। সিদ্ধান্ত নিলো উটনীকে হত্যা করবে। কিন্তু কে নেবে উটনীকে হত্যা করার দায়িত্ব? এক চরম হতভাগা এগিয়ে এলো। জাতির নেতারা তার উপর এ দায়িত্ব সঁপে দিলো। এর চরম ভয়াবহ পরিণতির ভয় তারা করলনা। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর উটনীকে তারা হত্যা করলো। এভাবে দ্রুত এগিয়ে এলো তারা নিজেদের করুণ পরিণতির দিকে। তারপর কি হলো?

আর মাত্র তিন দিন

উটনী হত্যার খবর পেয়ে, হযরত সালেহ কম্পিত হলেন,। আফসোস, তাঁর জাতি বুঝলনা। তাঁর আর কিছুই করার নেই। তিনি দৌড়ে এলেন। তারা বললো : সালেহ, তুমি তো অংগীকার করেছিলে একে হত্যা করলে আমাদের উপর বিরাট বিপদ নেমে আসবে। কোথায় তোমার সে বিপদ? যদি সত্যি তুমি রসূল হয়ে থাকো, তবে এনে দেখাও দেখি সে বিপদ। আল্লাহর নবী সালেহ এবার তাদের জানিয়ে দিলেন :

"এখন তোমাদের শেষ পরিণতির আর মাত্র তিন দিন সময় বাকি আছে। নিজেদের সুরম্য প্রাসাদগুলোতে বসে এই তিনদিন ভালো করে ভোগ বিলাস করে নাও। এ এক অনিবার্য অংগীকার।"[৪]

এবার নবীকে হত্যার ষড়যন্ত্র

উটনী হত্যার পর সামুদ জাতির নেতারা এবার স্বয়ং হযরত সালেহ আলাইহিস্ সালামকেই সপরিবারে হত্যা করার ফায়সালা করলো। তারা ভাবলো, সালেহ্ই তো আমাদের পথের আসল কাঁটা। সে-ই তো আমাদের ভোগ বিলাসে বাধা দিচ্ছে। আমাদের জীবন পদ্ধতি বদলে দিতে চাইছে। আমাদের ক্ষমতা হাতছাড়া করতে চাইছে। আমাদের সমালোচনা করছে। জনগণকে আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে। তার কারণেই তো আমাদের উপর এখন বিপদ আসার আশংকা দেখা দিয়েছে। সুতরাং তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেই সব চুকে যায়।

সামুদ জাতির নয়টি সম্প্রদায়ের নেতারা বসে শেষ পর্যন্ত নবীকে ঐ তিন দিনের মধ্যেই হত্যা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। তারা আরো সিদ্ধান্ত নেয়, হত্যার পর সালেহ্র অলি-অভিভাবক হিসেবে যিনি তার রক্তমূল্যের দাবিদার হবেন, তাকে বলবো, আমরা এ হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিলাম না। এঘটনা কুরআন মজিদে এভাবে বর্ণনা করেছে :

"শহরে ছিলো নয়জন দলপতি। তারা দেশকে অন্যায় অনাচারে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। কোনো প্রকার ভালো কাজ তারা করতোনা। তারা একে অপরকে বললো : আল্লাহর কসম খেয়ে অঙ্গীকার করো, রাতেই আমরা সালেহ ও তার পরিবারের উপর আক্রমণ চালাবো। তারপর তার অলিকে বলবো : তোমার বংশ ধ্বংস হবার সময় আমরা ওখানে উপস্থিতই ছিলাম না। আমরা সত্য সত্য বলছি।" (সূরা ২৭ আন নামল : আয়াত ৪৮-৪৯)

ওদের এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন :

"তারা একটা ষড়যন্ত্র পাকালো আর আমরাও একটা পরিকল্পনা বানালাম, যা তারা টেরই পেলোনা।" (সূরা ২৭ আন নামল : আয়াত ৫০)

ধ্বংস হলো সামুদ জাতি

আল্লাহর সে পরিকল্পনা কী? তা হলো সামুদ জাতির ধ্বংস। আল্লাহ বলেন :

"এখন চেয়ে দেখো, তাদের ষড়যন্ত্রের পরিণতি কি হলো? আমি তাদের ধ্বংস করে দিলাম, সেই সাথে তাদের জাতিকেও।" (সূরা ২৭ আন নামল : আয়াত ৫১)

আল্লাহ সামুদ জাতিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলেন। তাদের গর্ব অহংকার ও ভোগ বিলাস সব তলিয়ে গেলো। মুফাস্‌সিরগণ তাদের ধ্বংসের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, হযরত সালেহ যে তাদের তিন দিন সময় বেঁধে দিলেন, তাতে তাদের অন্তরে ভয় ঢুকে গেলো। প্রথম দিন তাদের চেহারা ফেকাশে হয়ে যায়। দ্বিতীয় দিন তাদের চেহারা লাল বর্ণের হয়ে যায়, আর তৃতীয় দিন তাদের চেহারা হয়ে যায় কালো।

অতপর তিন দিন শেষ হবার পরপরই রাত্রিবেলা হঠাৎ এক বিকট ধ্বনি এবং সাথে সাথে ভূমিকম্প শুরু হয়ে যায়। বজ্রধ্বনি আর ভূকম্পনে তারা সম্পূর্ণ বিনাশ হয়ে গেলো। মহান আল্লাহ বলেন :

"হঠাৎ বজ্রধ্বনি এসে তাদের পাকড়াও করলো। যখন ভোর হলো, তখন দেখা গেলো, তারা নিজেদের ঘর দোরে মরে উপুড় হয়ে পড়ে রইলো, যেনো এসব ঘরে তারা কোনো দিনই বসবাস করেনি।" (সূরা ১১ হূদ : আয়াত ৬৭-৬৮)

তাদের উন্নত প্রযুক্তির সুরম্য অট্টালিকা সমূহের ধ্বংসাবশেষ আজো তাদের অঞ্চলে শিক্ষণীয় হয়ে পড়ে আছে।

বেঁচে গেলেন সালেহ এবং তাঁর সাথিরা

তারা হযরত সালেহকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল যে রাতে, সে রাতেই মহান আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দিলেন। সে ধ্বংস থেকে আল্লাহ পাক হযরত সালেহ এবং তাঁর সাথিদের রক্ষা করলেন। তাদের নিরাপদে বাঁচিয়ে রাখলেন। মহান আল্লাহ বলেন :

"অতপর যখন ওদের ধ্বংস হবার নির্দিষ্ট সময়টি আসলো, তখন আমরা সালেহ আর সালেহর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমাদের বিশেষ রহমতে রক্ষা করলাম। সেদিনকার লাঞ্ছনা থেকে নিরাপদ রাখলাম। নিশ্চয়ই তোমার প্রভু দুর্দান্ত ক্ষমতার অধিকারী ও মহাপরাক্রমশীল।" (সূরা ১১ হূদ : আয়াত ৬৬)

সামুদ জাতি কেন ধ্বংস হলো?

সামুদ জাতি বৈষয়িকভাবে চরম উন্নতি লাভ করার পরও কেন ধ্বংস হলো? কেন তারা বিলীন হয়ে গেলো? কেন হলো তাদের এই অপমানকর বিনাশ? এর কারণ খুব সহজ। এর কারণ হলো :

১. তারা শিরকে লিপ্ত হয়েছিল।
২. তারা এক আল্লাহর আইন ও বিধান মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল।
৩. তারা নবী ও নবীর পথকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।
৪. তারা দুষ্কৃতকারী ও দুর্নীতিবাজ নেতাদের অনুসরণ করেছিল।
৫. পরকালের তুলনায় বৈষয়িক জীবনকে তারা অগ্রাধিকার দিয়েছিল।
৬. লাগামহীন ভোগ বিলাসে তারা নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল।
৭. তারা সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় বাধা দিয়েছিল।
৮. আল্লাহর নিদর্শন দাবি করেও তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল।
৯. তারা আল্লাহর নিদর্শন উটনীকে হত্যা করেছিল।
১০. তারা আল্লাহর নবীকে হত্যা করার চক্রান্ত করেছিল।
১১. তারা অহংকার ও স্বেচ্ছাচারিতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

কুরআনে হযরত সালেহ ও তাঁর জাতির উল্লেখ

এবার জানিয়ে দিচ্ছি কুরআন মজিদে হযরত সালেহ আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর জাতি সামুদের কথা কোথায় উল্লেখ হয়েছে। হ্যাঁ, আল কুরআনে হযরত সালেহর নাম উল্লেখ হয়েছে ৯ বার। যেসব সূরায় উল্লেখ হয়েছে সেগুলো হলো : সূরা আ'রাফ : আয়াত ৭৩, ৭৫, ৭৭, সূরা হূদ : আয়াত ৬১, ৬২, ৬৬, ৮৯, সূরা শোয়ারা : আয়াত ১৪২, সূরা নামল : আয়াত ৪৫।

আল কুরআনে 'সামুদ' জাতির উল্লেখ হয়েছে ২৬ স্থানে। সেগুলো হলো : সূরা আরাফ : ৭৩, তাওবা : ৭০, হূদ : ৬১, ৬৮, ৬৮, ৯৫, ইবরাহিম : ৯, ইসরা : ৫৯, হজ্জ : ৪২, ফুরকান : ৩৮, শোয়ারা : ১৪১, নামল : ৪৫, আনকাবুত : ৩৮, সোয়াদ : ১৩, মুমিন : ৩১, হামিমুস সাজদা : ১৩, ১৭, কাফ : ১৩, যারিয়াত : ৪৩, আন নাজম : ৫১, আল কামার : ২৩, আল হাক্কাহ : ৪, ৫, বুরুজ : ১৮, আল ফাজর : ৯, আশ শামস : ১১।

কুরআনের সূরাগুলো জানিয়ে দিলাম। সরাসরি কুরআন পড়লে আপনারা নিজেরাই এ ঘটনার আরো অনেক শিক্ষণীয় দিক জানতে পারবেন।

টিকা

১. সূরা ১৫ আল হিজর : আয়াত ৮০-৮৪।
২. সূরা ৪০ আল মুমিন : আয়াত ৮৩।
৩. সূরা ২৬ শোয়ারা : আয়াত ১৫৫।
৪. সূরা ১১ হূদ : আয়াত ৬৫।

অগ্নি পরীক্ষায় বিজয়ী বীর ইবরাহিম

আলাইহিস্ সালাম

জন্ম ও কৈশোর

হাজার হাজার বছর আগের কথা। আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগের কথা। নমরূদীয় ইরাকের উর নগরীতে জন্ম হয় এক শিশুর। একদিন সেই শিশুটিই হন কালের সাক্ষী এক মহাপুরুষ।

ওর বাবা আযর ছিলেন বড় একজন ধর্মীয় পুরোহীত। তিনি নিজের হাতে মূর্তি (ভাস্কর্য) তৈরি করতেন। আর ঐ মূর্তিগুলোকেই সারা দেশের মানুষ দেবতা বলে মানতো! ওদের পূজা উপাসনা করতো।

ছেলে জন্ম হওয়ায় বাবা আযর দারুণ খুশি। ভাবেন, আমার পরে আমার এই ছেলেই হবে ধর্মীয় পূরোহীত। নিজ হাতে সে দেবতা বানাবে। সে রক্ষা করবে আমার ধর্মীয় ঐতিহ্য। মনের খুশিতে আযর তার পুত্রের নাম রাখেন ইবরাহিম।

কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা ভিন্ন। তিনি ইবরাহিমকে দিয়ে মূর্তি ভাংগার পরিকল্পনা করেন। আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী ইবরাহিম বড় হতে থাকে। ইবরাহিমকে তিনি নিজ ভান্ডার থেকে দান করেন অগাধ জ্ঞান, বুদ্ধি আর দূরদৃষ্টি। কারণ তিনি তো তাকে নবী বানাবেন। তিনি তো তাকে এক বিরাট নেতৃত্বের আসনে বসাবেন। তাই ছোটবেলা থেকেই তার জ্ঞান বুদ্ধি দ্রুত বিকশিত হতে থাকে। কিশোর বয়স থেকেই ইবরাহিম সবকিছু যুক্তি দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করেন।

চিন্তা করেন ইবরাহিম

ইবরাহিম ভাবেন, নিজেদের হাতে মূর্তি বানিয়ে সেগুলোকে খোদা মানা তো বিরাট বোকামি। যারা কারো উপকারও করতে পারেনা, অপকারও করতে পারেনা, তারা খোদা হয় কেমন করে? কেউ যদি ঐ দেবতাগুলোর ক্ষতি করতে চায়, তা থেকেও দেবতাগুলো আত্মরক্ষা করতে পারেনা। তিনি বুঝতে পারেন, তাঁর পিতা এবং সমাজের লোকেরা বিরাট ভুলের মধ্যে রয়েছে। তিনি তার বাবাকে বলেন :

"বাবা! আপনি কি মূর্তিকে খোদা মানেন? আমিতো দেখছি, আপনি আর আপনার জাতির লোকেরা পরিষ্কার ভুলের মধ্যে আছেন।" (সূরা ৬ আল আনয়াম : আয়াত ৭৪)

ইবরাহিম দেখলেন, তার জাতির লোকেরা চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রেরও পূজা করছে। তারা মনে করলো এগুলো তো শক্তিশালী দেবতা। কিন্তু এরা যে খোদা হতে পারেনা তিনি যুক্তি দিয়ে তা বুঝিয়ে দিলেন। রাত্রিবেলা নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে ইবরাহিম বললেন, তোমরা বলছো এ আমার প্রভু! অতপর নক্ষত্র যখন ডুবে গেলো, তিনি বলে দিলেন, অস্তমিত হওয়া জিনিসকে আমি পছন্দ করিনা।

এরপর উজ্জ্বল চাঁদ উদয় হলো। তিনি বললেন, তবে এই হবে প্রভু! কিন্তু যখন চাঁদও ডুবে গেলো, তখন তিনি বললেন, এতো খোদা হতে পারেনা। আসল প্রভু মহাবিশ্বের মালিক নিজেই যদি আমাকে পথ না দেখান, তবে তো আমি বিপথগামীদের দলভুক্ত হয়ে পড়বো।

অতপর সকাল হলে পূবাকাশে ঝলমল করে সূর্য উঠলো। তবে তো এই হবে খোদা! কারণ এতো সবার বড়। তারপর সন্ধ্যায় যখন সূর্য ডুবে গেলো, তখন তিনি তাঁর কওমকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা যাদেরকে মহান সৃষ্টিকর্তার অংশীদার ভাবছো, আমি তাদের সকলের দিক থেকে মুখ ফিরালাম। আমি সেই মহান প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করছি, যিনি আসমান আর জমিনকে সৃষ্টি করেছেন। আমি তাঁর সাথে কাউকেও অংশীদার বানাবোনা।

শুরু হলো বিবাদ

এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর জাতির লোকেরা তাঁর সাথে বিবাদে লিপ্ত হলো। তিনি তাদের বললেন, তোমরা কি মহান আল্লাহর ব্যাপারে আমার সাথে বিবাদ করছো? অথচ তিনি তো সঠিক পথ দেখিয়েছেন। তোমরা যাদেরকে আল্লাহর অংশীদার মানো, আমি ওদের ভয় করিনা। আমি জানি, ওরা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা।

ইবরাহিম তাঁর বাবাকে বললেন : "বাবা, আপনি কেন সেইসব জিনিসের ইবাদত করেন, যেগুলো কানে শুনেনা, চোখে দেখেনা এবং আপনার কোনো উপকার করতে পারেনা? বাবা! আমি সত্য জ্ঞান লাভ করেছি, যা আপনি লাভ করেননি। আমার দেখানো পথে চলুন, আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাবো। বাবা! কেন আপনি শয়তানের দাসত্ব করছেন। শয়তান তো দয়াময় আল্লাহর অবাধ্য।" (সূরা ১৯ মরিয়ম : আয়াত ৪২-৪৪)

জবাবে ইবরাহিমের পিতা বললেন : "ইবরাহিম! তুই কি আমার খোদাদের থেকে দূরে সরে গেলি? শোন্ এই পথ থেকে বিরত না হলে আমি তোকে পাথর মেরে হত্যা করবো।" (সূরা ১৯ মরিয়াম : আয়াত ৪৬)

মূর্তি ভাংগার পালা

কোনো কিছুতেই যখন জাতির লোকেরা সত্য গ্রহণে প্রস্তুত হলোনা, তখন একদিন ইবরাহিম ঘোষণা করলেন : তোমাদের অনুপস্থিতিতে একদিন আমি

তোমাদের এই মিথ্যা খোদাদের বিরুদ্ধে একটা চাল চালবো।' ইবরাহিমের কথায় তারা তেমন একটা গুরুত্ব দিলনা। একদিন সব লোক এক ধর্মীয় উৎসবে যোগ দিতে চলে গেলো। ইবরাহিমকেও তারা উৎসবে যেতে বলে। কিন্তু অনেক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তিনি গেলেন না। নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি পীড়িত। আমি যাবোনা। সুতরাং তাঁকে রেখেই তারা চলে গেলো। শহর পুরুষ শূন্য হয়ে পড়লো।

এই সুযোগে ইবরাহিম ওদের ঠাকুর ঘরে এলেন। দেখলেন, সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে ওদের মূর্তি দেবতাগুলো। ওদের সামনে রয়েছে দামি দামি খাবার জিনিস। ইবরাহিম ওদের বললেন : তোমাদের কী হয়েছে? এসব স্বাদের জিনিস খাওনা কেন? কি হলো কথা বলছনা কেন? তারপর তিনি মূর্তিগুলোকে আঘাত করে ভেঙ্গে ফেললেন। কিন্তু ঠাকুর দেবতাটিকে ভাংলেন না। ওকে ওর জায়গায়ই রেখে দিলেন।

উৎসব শেষে লোকেরা ফিরে এলো। দেবতাদের অবস্থা দেখে সবার মাথায় হাত। তারা বলাবলি করতে লাগলো, কোন্ যালিম আমাদের খোদাদের সাথে এই ব্যবহার করলো! কেউ কেউ বললো, আমরা যুবক ইবরাহিমকে এদের সমালোচনা করতে শুনেছি।

নেতারা গোস্বায় ফেটে পড়লো। বললো, অপরাধীকে ধরে নিয়ে এসো সবার সামনে। ইবরাহিমকে আনা হলো। তারা বললো : ইবরাহিম! আমাদের খোদাদের সাথে এই ব্যবহার কি তুমি করেছো?'

ইবরাহিম ভাবলেন, ওদের খোদাদের অক্ষমতা প্রমাণ করার এটাই সুযোগ। তিনি বললেন : নয়তো ওদেরকেই জিজ্ঞেস করুন, কে মেরেছে ওদের? ঐ বড়টাকেই জিজ্ঞেস করুন, সে-ই ভেঙ্গেছে নাকি?

ইবরাহিমের কথা শুনে তারা লজ্জিত হলো। মনে মনে ভাবলো, আসলে আমরাই তো অন্যায়কারী। তারপর মাথানত করে তারা বললো: 'ইবরাহিম! দেবতাগুলো যে কথা বলতে পারে না, তাতো তুমি ভালো করেই জানো।'

ইবরাহিম সবাইকে সম্বোধন করে বললেন : "তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে কেন এমন সব জিনিসের পূজা উপাসনা করো, যেগুলো তোমাদের ভালোও করতে পারেনা, মন্দও করতে পারেনা? দুঃখ তোমাদের জন্যে, কেন তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এগুলোর ইবাদত করো? তোমাদের কি একটুও বিবেক বুদ্ধি নেই?"

এবার তারা ইবরাহিমকে ঘিরে ফেললো। চারদিকে হৈ হট্টগোল শুরু করে দিলো। ইবরাহিম জোর গলায় বললেন : 'তোমরা কি তোমাদের নিজেদের হাতে বানানো মূর্তির ইবাদত করবে? অথচ তোমাদেরকে তো সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ।'

রাজ দরবারে আনা হলো

তারা ইবরাহিমকে নিয়ে খুব চিন্তায় পড়লো। কী করবে তাকে নিয়ে! সেতো দেবতাদের আর কোনো মান-ইজ্জতই বাকি রাখলোনা। তারা বিভিন্ন রকম সলাপরামর্শ করতে থাকলো। শেষ পর্যন্ত ইবরাহিমের বিষয়টি তারা রাজার কানে তুললো। তাদের রাজা ছিলো নমরূদ। নমরূদকে তারা বুঝালো, ইবরাহিমের ব্যাপারে বড়ো কোনো সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে সে আমাদের ধর্মও বিনাশ করবে, আপনার রাজত্বও বিনাশ করবে।

রাজা বললেন, ইবরাহিমকে আমার কাছে নিয়ে এসো। অতপর ইবরাহিমকে নমরূদের সামনে হাজির করা হলো। নমরূদ তাঁর সাথে কথা বললেন। ইবরাহিম তাকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানান। কিন্তু নমরূদ ইবরাহিমের সাথে আল্লাহর ব্যাপারে বিতর্ক শুরু করলো। বললো : তোমার প্রভু কে?

ইবরাহিম : আমার প্রভু তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন।

নমরূদ : আমিও মানুষকে মারতে পারি, আবার জীবিত রাখতে পারি। (নমরূদ মৃত্যুদণ্ড দেয়া দু'জন কয়েদী এনে একজনকে হত্যা করলো, আরেকজনকে ছেড়ে দিলো।)

ইবরাহিম : 'আমার আল্লাহ তো সূর্যকে পূর্বদিক থেকে উঠান, তুমি যদি সত্যি সত্যি প্রভু হয়ে থাকো, তবে সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে উঠাও দেখি!' (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ২৫৮)

একথা শুনে রাজা হতভম্ব, হতবাক ও নিরুত্তর হয়ে গেলো। আল্লাহ তো যালিমদের পথ দেখান না। এভাবে ইবরাহিমের যুক্তির কাছে রাজা প্রজা সবাই পরাস্ত হলো। ইবরাহিম যুক্তির মাধ্যমে মূর্তিকে খোদা মানার অসারতা প্রমাণ করে দিলেন। চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রকে খোদা মানা ভুল প্রমাণ করে দিলেন। রাজা বাদশাহকে প্রভু মানার ভ্রান্তি স্পষ্ট করে দিলেন। তাদের ধর্ম এবং সব দেবতাই যে মিথ্যা, সেকথা দিবালোকের মতো পরিষ্কার করে দিলেন। সাথে তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানান। আল্লাহর পয়গাম তিনি তাদের কাছে পৌঁছে দেন।

অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ

কিন্তু তারা কিছুতেই ঈমান আনলনা। বরং নৈতিকভাবে ইবরাহিমের কাছে পরাজিত হয়ে তারা তাঁর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। অন্ধ বর্বরতায় মেতে উঠলো তারা। সিদ্ধান্ত নিলো ইবরাহিমকে হত্যা করার। কিন্তু কিভাবে হত্যা করবে তাঁকে? তারা ফায়সালা করলো বিরাট অগ্নিকুণ্ড বানাবে। তারপর তাতে পুড়িয়ে মারবে ইবরাহিমকে।

যে কথা সে কাজ। এক বিরাট অগ্নিকুণ্ডলি বানালো তারা। এটা ছিলো ইবরাহিমের জন্য এক বড় পরীক্ষা। আল্লাহও ইবরাহিমকে বাজিয়ে নিতে চাইলেন। তিনি দেখতে চাইলেন ইবরাহিম কি জীবন বাঁচাবার জন্যে ঈমান ত্যাগ করে, নাকি ঈমান বাঁচাবার জন্যে জীবন কুরবানি করে? কিন্তু ইবরাহিম তো অগ্নিপরীক্ষায় বিজয়ী বীর। তিনি তো কিছুতেই জীবন বাঁচাবার জন্যে আল্লাহকে এবং আল্লাহর দীনকে ত্যাগ করতে পারেননা। তিনি তো আল্লাহ্ এবং আল্লাহর দীনকে নিজের জীবনের চাইতে অনেক অনেক বেশি ভালবাসেন।

কাফিররা তাঁকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করার জন্যে নিয়ে গেলো। তিনি তাদের কাছে নত হননি। জীবন ভিক্ষা চাননি। জীবন বাঁচাবার জন্যে নিজের দীন এবং ঈমান ত্যাগ করেননি। তাঁর তেজদীপ্ত ঈমান তাঁকে বলে দিলো : ইবরাহিম! জীবন মৃত্যুর মালিক তো তোমার মহান প্রভু আল্লাহ! তাঁর ঈমান তাঁকে বলে দেয়, আল্লাহ যদি আমার ক্ষতি করতে না চান, তবে গোটা পৃথিবী এক হয়েও আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা। আর আল্লাহ্ যদি আমার কোন ক্ষতি করতে চান, তবে গোটা পৃথিবী এক হয়েও তা থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারবেনা।

নিশ্চিত মনে আল্লাহর উপর ভরসা করে তিনি অগ্নিকুণ্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন। ওরা তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে নিক্ষেপ করলো নিজেদের তৈরি করা নরকে। আল্লাহ ইবরাহিমের প্রতি পরম খুশি হয়ে আগুনকে বলে দিলেন :

"হে আগুন! ইবরাহিমের প্রতি সুশীতল এবং শান্তিময় হয়ে যাও।"

আগুনের কি সাধ্য আছে সৃষ্টিকর্তার হুকুম অমান্য করার?

সুতরাং অগ্নিকুণ্ডে ইবরাহিম সম্পূর্ণ নিরাপদ থেকে গেলেন। আগুন তাঁর কোনোই ক্ষতি করলোনা। বরং আল্লাহর হুকুমে সে ইবরাহিমের সেবায় নিয়োজিত হলো। ইবরাহিমের জাতি আবার তাঁর কাছে পরাজিত হলো। ইবরাহিম আবার তাদের কাছে প্রমাণ করে দিলেন, তাদের দেবতারা নিজেদের রক্ষা করতেই অক্ষম। আর তিনি যে মহান প্রভুর প্রতি তাদের ডাকছেন, তিনি যে কোনো ক্ষতি থেকে বান্দাদের রক্ষা করতে সক্ষম। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনিই একমাত্র সত্তা যার হুকুম পালন করা উচিত। যার ইবাদত উপাসনা করা উচিত।

হিজরত করেন ইবরাহিম

অগ্নিকুণ্ড থেকে রক্ষা পেয়ে ইবরাহিম আল্লাহর পথে আসার জন্যে তাদের অনেক বুঝান। কিন্তু তারা কিছুতেই নিজেদের পূর্বপুরুষদের ভুল পথ ত্যাগ করতে রাজি হয়নি। বরং ইবরাহিমের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকে। ইবরাহিম দেখলেন, এ মানুষগুলোর আর হিদায়াতের পথে আসার সম্ভাবনা নেই। তখন তিনি আল্লাহর হুকুমে হিজরত করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

নিজের প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে রওয়ানা করলেন। সাথে ছিলেন স্ত্রী সারাহ আর ভাতিজা লুত। জাতির লোকদের মধ্যে কেবল লুতই ঈমান এনেছিলেন।

প্রিয় জন্মভূমি থেকে হিজরত করেন ইবরাহিম। এবার তিনি উন্মুক্ত বিশ্বে দাওয়াতি কাজ বিস্তার করা শুরু করেন। মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকতে ডাকতে তিনি সিরিয়ার দিকে যাত্রা করেন। সেখান থেকে চলে যান ফিলিস্তিন এলাকায়। আল্লাহর বার্তা বইয়ে নিয়ে যান তিনি মানুষের দুয়ারে দুয়ারে। দীর্ঘ পথের ভ্রমণ, মানুষের বিরোধিতা, অত্যাচার নির্যাতন আর হাজারো রকমের কষ্ট তাঁকে ক্লান্ত করতে পারেনি। তিনি মানুষকে দাওয়াত দিয়েই চলেছেন।

এবার তিনি ফিলিস্তিন থেকে যাত্রা শুরু করেন মিশরের দিকে। কেবল মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার জন্যেই এ মহামানব ঘুরে বেড়ান দেশ থেকে দেশান্তরে। পাড়ি দেন মরু প্রান্তর, সমুদ্র পাথার। এসব কিছুই তিনি করেন তাঁর মহান প্রভু পরম দয়াময় আল্লাহকে খুশি করার জন্যে। তাইতো জন্মভূমি ত্যাগের সময় প্রশান্ত দিল ইবরাহিম বলেছিলেন :

"আমি আমার প্রভুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন।" (সূরা ৩৭ আস সাফফাত : আয়াত ৯৯)

মিশরে এসে এখানকার মানুষকে তিনি দাওয়াত দিতে শুরু করেন আল্লাহর দিকে। সাথে তাঁর স্ত্রী সারাহ আর ভাতিজা লুত। মিশরে এসে দেখেন এখানকার বাদশাহ বড়ই স্বৈরাচারী-যালিম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাদশাহ হযরত ইবরাহিম আর তাঁর স্ত্রী সারাহর আল্লাহ ভক্তিতে মুগ্ধ হন এবং ইবরাহিম ও সারার সেবা করার জন্যে নিজ কন্যা হাজেরাকে ইবরাহিমের নিকট বিয়ে দেন। ইবরাহিমকে অনেক ধন দৌলত প্রদান করেন।

আবার ফিলিস্তিনে

মিশর থেকে ইবরাহিম আলাইহিস্ সালাম আবার ফিরে আসেন ফিলিস্তিনে। এবার ফিলিস্তিনকেই তিনি নিজের দাওয়াতি কাজের মূল কেন্দ্র বানান। ভাতিজা লুতকে জর্ডান এলাকায় নিজের প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকেও নবুয়্যত দান করেন।

ইবরাহিমের মনে বড় দুঃখ! তিনি বৃদ্ধ বয়সে এসে উপনীত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর কোনো সন্তানাদি নেই। স্ত্রী সারাহ ছিলেন একজন বন্ধ্যা মহিলা। তাঁর কোনো সন্তানাদি হতো না। ইবরাহিম আল্লাহর কাছে দোয়া করেন : "হে প্রভু! আমাকে একটি সৎ সন্তান দান করো।" (সূরা ৩৭ আস সাফফাত: আয়াত ১০০)

পরম দয়াময় আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেন। স্ত্রী হাজেরার ঘরে তাঁর এক সুন্দর ফুটফুটে ছেলের জন্ম হয়। তিনি পুত্রের নাম রাখেন ইসমাঈল। বৃদ্ধ বয়সে শিশুপুত্রের হাসিতে তাঁর মন ভরে উঠে। কিন্তু এই পুত্রের ভালবাসা নিয়েও আল্লাহ তাঁকে পরীক্ষায় ফেলেন। আল্লাহ তাঁকে বাজিয়ে দেখতে চান, তিনি পুত্রের ভালবাসার চাইতে আল্লাহর হুকুম পালন করাকে বড় জানেন কিনা?

ইসমাঈলকে মক্কায় রেখে আসার নির্দেশ

এবার আল্লাহ ইসমাঈল ও তাঁর মা হাজেরাকে মক্কার জনমানব ও ফল পানি শস্যহীন মরুভূমিতে রেখে আসার নির্দেশ দেন। কিন্তু ইবরাহিম যে আল্লাহকে সবার চেয়ে বেশি ভালবাসেন! তিনি যে জানেন আল্লাহর হুকুম অমান্য করা যায়না। তাইতো তিনি হাজেরা আর শিশুপুত্র ইসমাঈলকে নিয়ে শত শত মাইল পথ পাড়ি দিয়ে মক্কায় এসে উপস্থিত হন। আল্লাহর ইংগিতে তিনি তাদের একটি নির্দিষ্ট স্থানে রেখে আবার ফিলিস্তিন অভিমুখে রওয়ানা করেন। হাজেরাকে বলে যান, আমি আল্লাহর হুকুমে তোমাদের এখানে রেখে গেলাম। হাজেরাকে কিছু খাদ্য ও এক মশক পানি দিয়ে আসেন। প্রশান্ত সমুদ্রের মতো প্রশস্ত হৃদয় আর হিমালয়ের মতো অটল ধৈর্যশীল ইবরাহিম আল্লাহ প্রদত্ত পরীক্ষায় বিজয়ী হয়ে ফিরে এলেন ফিলিস্তীনে।

আল্লাহর দীনের দাওয়াত নিয়ে ইবরাহিম ঘুরে বেড়ান ফিলিস্তিন, জর্ডান ও হিজাযের বিভিন্ন এলাকায়। একাজ করাই তাঁর মূল দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের ফাঁকে ফাঁকে তিনি মক্কায় যান। স্ত্রী-পুত্রকে দেখে আসেন। হাঁটি হাঁটি পা পা করে ছেলে বেড়ে উঠে। সাথে সাথে ছেলের প্রতি ইবরাহিমের মহব্বতও উপচে উঠে। ফলে আল্লাহ ইবরাহিমকে আবার বাজিয়ে নিতে চান।

পুত্র কুরবানির হুকুম

ইসমাঈলের এখন বুঝ বুদ্ধি হয়েছে। ইবরাহিমের সাথে পুত্র ইসমাঈল এখন ঘরে বাইরে যাতায়াত করেন। পিতা যদি বৃদ্ধ বয়েসে উদীয়মান কিশোর পুত্রকে নিজের সাহায্যকারী হিসেবে পান, তবে তার প্রতি যে পিতার মহব্বত কতটা বেড়ে যায়, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

ঠিক এমনি এক সময় আল্লাহ পাক স্বপ্নে ইসমাঈলকে কুরবানি করবার জন্যে ইবরাহিমকে নির্দেশ দেন। বলে দেন : 'ইবরাহিম তোমার প্রিয়তম পুত্রকে কুরবানি করো।' আল্লাহর হুকুম লংঘন করা যায়না। তাঁর হুকুম পালন করা অবধারিত।

পুত্রের প্রতি ভালবাসার বন্ধন ইবরাহিমকে আল্লাহর হুকুম পালন করা থেকে বিরত রাখতে পারেনা। তিনি পুত্রকে ডেকে নিয়ে জানালেন : 'পুত্র আমার! আল্লাহ আমাকে স্বপ্নে হুকুম করেছেন তোমাকে কুরবানি করতে। এ ব্যাপারে তোমার মত কি?'

'যেমন বাপ তেমন ছেলে'। উর্দু ভাষায় বলা হয়- 'বাপকা বেটা'। আর আরবি ভাষায় বলা হয়- 'হুয়া ইবনু আবীহি'। কথাটি যেনো ইসমাঈলের জন্যে একশ পার্সেন্ট প্রযোজ্য। আল্লাহর হুকুমের কাছে তিনি পিতার মতোই নুইয়ে দিলেন মাথা। বললেন : "আব্বু! আল্লাহর হুকুম আপনি কার্যকর করুন। ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে অটল ধৈর্যশীল পাবেন।"

দয়া ও করুণার সাগর মহান আল্লাহ তো তাঁদের পিতা পুত্র দু'জনের কথা শুনছিলেন। এসময় তাঁদের প্রতি যে তাঁর মহব্বত ও রহমতের স্রোতধারা কিভাবে বইয়ে আসছিল তা একমাত্র তিনিই জানেন। প্রভু রহমান এসময়টির কথা নিজ ভাষায় এভাবে বর্ণনা করেন :

"ওরা দু'জনেই যখন আমার হুকুমের কাছে নাথা নত করে দিলো আর ইবরাহিম পুত্রকে (জবাই করার জন্যে) উপুড় করে শুইয়ে দিলো, তখন আমি তাকে ডাক দিয়ে বললাম: ইবরাহিম! তুমি স্বপ্নে দেখা হুকুমকে সত্যে পরিণত করে দেখালে! পুণ্যবানদের এভাবেই আমি প্রতিফল দান করি। এটা ছিলো একটা বিরাট পরীক্ষা। অতপর একটি বড় কুরবানির বিনিময়ে আমি তার পুত্রটিকে ছাড়িয়ে নিলাম। আর পরবর্তী লোকদের মাঝে একথা স্থায়ী করে দিলাম যে, ইবরাহিমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।" (সূরা ৩৭ আস সাফফাত : আয়াত ১০৩-১০৯)

ব্যাপারতো বুঝতেই পেরেছেন। বাপ ছেলে দু'জনই আল্লাহর হুকুমটি পালন করার জন্যে তৈরি হয়ে গেলেন। ইবরাহিম পুত্রকে কুরবানি করার জন্যে উপুড় করে শুইয়ে দিলেন। চোখ বন্ধ করে পুত্রের গলায় ছুরি চালিয়ে দিতে উদ্যত হলেন। ঠিক এমনি সময় তাঁর প্রিয়তম প্রভু মহান আল্লাহ তাঁকে ডাক দিয়ে বললেন, ইবরাহিম! থামো! তুমি আমার হুকুম পালন করেছো বলে প্রমাণ দিয়েছো। ইবরাহিম চোখ খুলে দেখলেন সামনে একটি দুম্বা দাঁড়িয়ে আছে। আল্লাহ বলে দিলেন পুত্রের পরিবর্তে এবার এই দুম্বাটিকে কুরবানি করে দাও। আর তোমার এই কুরবানি হবে এক বিরাট ঐতিহাসিক কুরবানি।

এবার ইবরাহিম দুম্বাটিকে যবেহ করে দিলেন। প্রিয় পুত্রকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। আল্লাহ ইবরাহিমের ঐ বিরাট কুরবানিকে চির স্মরণীয় করে রাখার জন্যে মুসলিমদের মাঝে প্রতি বছর কুরবানি করার নিয়ম চালু করে দিলেন। আজো আমরা ইবরাহিম আলাইহিস্ সালামের সেই মহান কুরবানির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতি বছর ঐ তারিখে পশু কুরবানি করি। এভাবেই আল্লাহ ইবরাহিমকে বানিয়েছেন কালের সাক্ষী এক মহাপুরুষ।

এই চরম পরীক্ষাটিতেও ইবরাহিম যখন বিজয়ী হলেন, তখন একদিকে আল্লাহ তাঁকে নিজের বন্ধু বা খলিল বানিয়ে নিলেন। আর এ কারণেই আমরা ইবরাহিমকে "খলিলুল্লাহ" বা 'আল্লাহর বন্ধু' বলে থাকি। আর অপরদিকে তিনি ইবরাহিমকে বিশ্বনেতা বানিয়ে দিলেন। আল কুরআনে তাঁর নেতৃত্বের বিষয়টি এভাবে তুলে ধরা হয়েছে :

"স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন ইবরাহিমকে তার প্রভু বেশ ক'টি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন আর সব ক'টিতেই সে উত্তীর্ণ হলো, তখন তিনি তাকে বললেন: আমি তোমাকে সব মানুষের নেতা বানাতে চাই। ইবরাহিম জানতে

চাইল : এই প্রতিশ্রুতি কি আমার সন্তানদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য হবে? তিনি বললেন : আমার প্রতিশ্রুতি যালিমদের ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে না।" (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ১২৪)

এটাই আল্লাহর নীতি। তিনি কাউকেও বড় কোনো দায়িত্ব ও নেতৃত্ব দিতে চাইলে তাকে ভালভাবে বাজিয়ে নেন। সব পরীক্ষায় বিজয়ী হবার পর তিনি ইবরাহিমকে শুধু নেতৃত্বেই দেননি, সেই সাথে বৃদ্ধ বন্ধ্যা স্ত্রী সারাহর ঘরেও একটি পুত্র সন্তান দান করেন। তার নাম ইসহাক। শুধু তাই নয়, মহান আল্লাহ তাঁর দুটি পুত্রকেই নবী মনোনীত করেন।

আল্লাহর কুদরত দর্শন

ইবরাহিম আলাইহিস্ সালামের প্রতি আল্লাহর এতো বড় অনুগ্রহের কারণ কি? তা হলো, আল্লাহর প্রতি তাঁর পরম আস্থা ও প্রত্যয়। মহান আল্লাহ তাঁকে আসমান ও জমিনের সমস্ত নিদর্শন দেখিয়ে দিয়েছিলেন। সে কারণেই তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হয় আল্লাহর প্রতি মজবুত ও অটল প্রত্যয়। আল্লাহর প্রতি নিজের পরম আস্থাকে আরো মজবুত করে নেবার জন্যে তিনি একবার আল্লাহর কাছে একটি আবদার করেন। সে আবদারটি কুরআনের বর্ণনায় শুনুন :

"সে ঘটনাটি স্মরণ করো, যখন ইবরাহিম বলেছিল : আমার প্রভু! তুমি কেমন করে মৃতকে জীবিত করো আমাকে একটু চোখের সামনে দেখিয়ে দাও। তিনি বললেন : তুমি কি তা বিশ্বাস করোনা? ইবরাহিম বললো : অবশ্যি বিশ্বাস করি, তবে আমার মনের সান্ত্বনার জন্যে নিজের চোখে দেখতে চাই। তিনি বললেন: তবে তুমি চারটি পাখি ধরো। সেগুলোকে নিজের কাছে ভালোভাবে পোষ মানিয়ে নাও। তারপর সেগুলোকে (জবাই করে) সেগুলোর একেকটি অংশ একেকটি পাহাড়ের উপর রেখে আসো। অতপর তুমি ওদের ডাকো। দেখবে ওরা তোমার কাছে দৌড়ে আসবে। জেনে রাখো, আল্লাহ বড় ক্ষমতাশীল মহাবিজ্ঞানী।" (সূরা আল বাকারা : আয়াত ২৬০)

কুরআনের বিবরণ থেকে ঘটনাটি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। ইবরাহিম পাখিগুলোকে টুকরো টুকরো করে বিভিন্ন পাহাড়ে রেখে এসে ওদের ডাক দেন। সাথে সাথে ওরা জীবিত হয়ে ইবরাহিমের কাছে উড়ে আসে। আল্লাহ তাঁকে চাক্ষুস দেখিয়ে দিলেন, তিনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করতে পারেন। এভাবেই আল্লাহ কিয়ামতের দিন সব মানুষকে জীবিত করবেন এবং সবাই হাশরের ময়দানে দৌড়ে এসে একত্রিত হবে। বিষয়টি ইবরাহিম সচক্ষে দেখে পরম প্রত্যয় ও প্রশান্তি লাভ করেন।

কা'বা ঘর নির্মাণ

এবার আল্লাহ তাঁর প্রিয় ইবরাহিমকে আরেকটি বিরাট দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি তাঁকে কা'বা ঘর নির্মাণের নির্দেশ দেন। কোন্ জায়গাটিতে কা'বা ঘর নির্মাণ করতে হবে, তাও তিনি বলে দেন। সেই জায়গাটি তো এখন আমাদের সকলেরই জানা। কা'বা ঘর নির্মাণ করেছিলেন ইবরাহিম আলাইহিস্ সালাম পুত্র ইসমাঈলকে সাথে নিয়ে। এটিতো সেই জায়গা যেখানে তিনি রেখে এসেছিলেন শিশুপুত্র ইসমাঈল আর তার মা হাজেরাকে। এটি তো সেই স্থান, যার পাশে মিনাতেই কুরবানি করতে গিয়েছিলেন প্রিয়তম পুত্র ইসমাঈলকে। আল্লাহর নির্দেশে পিতা পুত্র দু'জনে মিলে নিপুণ কারিগরের মতো কাবার ভিত উঠালেন। তারপর নির্মাণ সম্পন্ন করলেন আল্লাহর ঘর কা'বা ঘরের। এ সময় দু'জনেই দয়াময় রহমানের দরবারে দোয়া করলেন :

"আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের এই কাজ কবুল করো। তুমি তো সবই শোনো সবই জানো। প্রভু! আমাদেরকে তোমার অনুগত রাখো। আমাদের বংশ থেকে তোমার অনুগত একটি উম্মাহ সৃষ্টি করে দাও। তোমার হুকুম পালন করার নিয়ম আমাদের জানিয়ে দাও। আমাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করো। তুমি তো মহা ক্ষমাশীল দয়াবান। আমাদের প্রভু! এদের মধ্য থেকেই এদের মাঝে একজন রসূল পাঠিয়ো...।" (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ১২৮-১২৯)

মহান আল্লাহ ইবরাহিমের তৈরি ঘরকে নিজের ঘর বলে ঘোষণা দিলেন। এ ঘরকে তিনি চিরদিন বাঁচিয়ে রাখলেন। তিনি ইবরাহিমকে বলে দিলেন:

"এই ঘরে হজ্জ পালন করার জন্যে মানুষকে সাধারণভাবে অনুমতি দিয়ে দাও। মানুষ বহু দূর দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে, উটে চড়ে তোমার কাছে আসবে।... এই প্রাচীনতম ঘরের তওয়াফ করবে।" (সূরা ২২ হাজ্জ: আয়াত ২৭-২৯)

এভাবে মহান আল্লাহ ইবরাহিম আলাইহিস্ সালামের কীর্তিসমূহ চির স্মরণীয় করে রাখলেন। তাঁর নির্মাণ করা ঘরকে কেন্দ্র করে হজ্জ, তাওয়াফ ও কুরবানির নিয়ম চিরস্থায়ী করে দিলেন। এই মহান ঘর ও ঘরের কাছে রেখে যাওয়া নিজ পরিবারের জন্যে তিনি আল্লাহর নিকট দোয়া করেছিলেন :

"প্রভু! এই শহরকে শান্তি ও নিরাপত্তার শহর বানাও।... আমার প্রভু! আমার সন্তানদের একটি অংশকে তোমার এই মহাসম্মানিত ঘরের কাছে এনে পুনর্বাসিত করেছি। এটাতো পানি ও তরুলতাশূন্য এক মরু প্রান্তর। প্রভু এদের এখানে রেখেছি যেনো ওরা সালাত কায়েম করে। সুতরাং তুমি ওদের প্রতি মানুষের মনকে অনুরক্ত বানিয়ে দাও।... শোকর সেই মহান আল্লাহর যিনি বৃদ্ধ বয়েসে আমাকে দুটি সন্তান ইসমাঈল আর ইসহাককে দান করেছেন। প্রভু, আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে সালাত কায়েমকারী বানাও।" (সূরা ১৪ ইবরাহিম : আয়াত ৩৫-৪০)

কুরআনে হযরত ইবরাহিমের প্রশংসনীয় গুণাবলি

মহান আল্লাহ তাঁর কিতাব আল কুরআনে ইবরাহিম আলাইহিস্ সালামের গুণবৈশিষ্ট্যের ভুয়সী প্রশংসা করেছেন। এখানে আমরা কয়েকটি উল্লেখ করলাম :

১. "পৃথিবীর কাজের জন্যে আমি ইবরাহিমকে বাছাই করেছিলাম।"
২. "তার প্রভু যখন বললেন : 'আত্মসমর্পণ করো'। সে বললো : সারা জাহানের প্রভুর নিকট আমি আত্মসমর্পণ করলাম।"
৩. "সে বললো : পুত্র আমার! মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পিত থাকো।"
৪. "তোমরা খাঁটিভাবে ইবরাহিমের পথ অনুসরণ করো"।
৫. "আল্লাহ ইবরাহিমকে তাঁর বন্ধু বানিয়েছেন।"
৬. "আমি ইবরাহিমকে আসমান ও জমিনের সমস্ত নিদর্শন দেখিয়েছি।"
৭. "সে বললো : আমি আসমান ও জমিনের স্রষ্টার দিকে মুখ ফিরালাম।"
৮. "ইবরাহিম ছিলো বড় ধৈর্যশীল কোমল হৃদয় আর আমার প্রতি অনুরক্ত।"
৯. "ইবরাহিম নিজেই ছিলো একটি উম্মাহ। সে একমুখী হয়ে আল্লাহর অনুগত ছিলো।"
১০. "আল্লাহর অনুগ্রহরাজির প্রতি সে ছিলো শোকরগুজার। তিনি তাকে পছন্দ করেছেন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন।"
১১. "ইবরাহিম ছিলো এক অতি সত্যবাদী মানুষ এবং নবী।"
১২. "ইবরাহিমকে আমি সতর্কবুদ্ধি ও জ্ঞান দান করেছি।"
১৩. "আমি বললাম : হে আগুন! তুমি ইবরাহিমের প্রতি সুশীতল, শান্তিময় ও নিরাপদ হয়ে যাও।"
১৪. "আমি ডেকে বললাম : হে ইবরাহিম! তুমি স্বপ্নে দেখা হুকুমকে সত্যে পরিণত করেছো।"
১৫. "তোমাদের জন্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে ইবরাহিমের মধ্যে...।"

জেনে নিন

এবার কয়েকটি তথ্য জেনে নিন। সেগুলো হলো : কুরআন মজিদে ইবরাহিম আলাইহিস্ সালামের নাম উল্লেখ হয়েছে ৬৯ বার। যেসব সূরাতে ইবরাহিম আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে আলোচনা আছে, সেগুলো হলো : সূরা আল বাকারা, আন নিসা, আনয়াম, তাওবা, হূদ, ইবরাহিম, হিজ্‌র, আন নহল, মরিয়ম, আম্বিয়া, আল হজ্জ, শোয়ারা, আনকাবূত, সাফফাত, যুখরুফ, যারিয়াত, মুমতাহিনা।

❖

৭

জর্ডান অঞ্চলের নবী লুত

আলাইহিস্ সালাম

হযরত লুতের পরিচয়

হযরত লুত আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর এক সম্মানিত নবী। তিনি সেইসব নবীদের একজন, যাদের জাতি ঈমান আনেনি। হযরত লুতের জাতি যে কেবল ঈমান আনেনি, তা নয়, বরং তাঁর জাতির লোকেরা ছিলো সেকালের সবচেয়ে পাপিষ্ঠ লোক। হযরত লুত আলাইহিস্ সালাম সেইসব নবীদেরও একজন, যাদের জাতিকে আল্লাহ্ ইসলামের বিরোধিতা করার কারণে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। হযরত নূহ, হযরত হূদ এবং হযরত সালেহ আলাইহিমুস সালামের জাতির মতোই লুত আলাইহিস্ সালামের জাতিকেও আল্লাহ্ পাক ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

হযরত লুত ছিলেন মহান নবী হযরত ইবরাহিম আলাইহিস্ সালামের ভাতিজা। হযরত ইবরাহিম যখন নিজ দেশ ইরাকে আল্লাহর দীন প্রচার শুরু করেন, সেখানে শেষ পর্যন্ত মাত্র দু'জন লোক তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। তাঁদের একজন তাঁর স্ত্রী সারাহ। অপরজন তাঁর ভাতিজা লুত। তিনি যখন ইরাক থেকে হিজরত করতে বাধ্য হন, তখন কেবল এ দু'জনই তাঁর হিজরতের সাথি হন।

হিজরত ও নবুয়্যত লাভ

রাজা নমরূদের অত্যাচারে যখন নিজ দেশে ইসলাম প্রচার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন লুত চাচা ইবরাহিম আলাইহিস্ সালামের সাথে দেশ ত্যাগ করেন। চাচার সাথে দীন প্রচারের কাজে তিনি ফিলিস্তিন, সিরিয়া হয়ে আফ্রিকার মিশর পাড়ি জমান। মহান নবী হযরত ইবরাহিমের ইসলাম প্রচারের সাথি হিসেবে লুত অগাধ জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ লাভ করেন। ফলে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁকেও নবুয়্যত দান করেন এবং জর্ডান এলাকায় একটি পাপিষ্ঠ জাতির কাছে ইসলাম প্রচারের গুরু দায়িত্বে নিযুক্ত করেন।

কোন্ সে জাতি?

কোন্ সে জাতি, যার কাছে দীন প্রচারের দায়িত্ব অর্পিত হয় লুত আলাইহিস্ সালামের উপর? কুরআনে এদেরকে 'কওমে লুত বা লুতের জাতি' বলা হয়েছে। এ জাতি যে অঞ্চলে বাস করতো, বর্তমানে সে অঞ্চলের নাম ট্রান্স জর্ডান। এ জায়গাটি ইরাক ও ফিলিস্তিনের মাঝামাঝিতে অবস্থিত। সেকালে এ জাতির প্রধান শহরের নাম ছিলো সাদুম। এছাড়াও তাদের আরো অনেকগুলো শহর

ছিলো। চরম পাপাচারের কারণে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের ধ্বংস করে দেন। তাদের শহরগুলোকে তলিয়ে দেন। বর্তমানে যাকে লুত সাগর বা Dead Sea (মৃত সাগর) বলা হয়, তাদের শহরগুলো তলিয়ে এতেই মিশে গিয়েছিল। লুত সাগরের পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলে আজো তাদের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। হযরত ইবরাহিম আলাইহিস্ সালামের প্রতিনিধি হিসেবে এ এলাকাতেই হযরত লুত আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর দীন প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

লুত জাতির পাপাচার

লুত আলাইহিস্ সালামের জাতির মতো পাপিষ্ঠ জাতি খুব কমই ছিলো। তাদের চরিত্র এতো খারাপ ছিলো যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তারা ছিলো সমকামী। তারা প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজ এবং জন সমাবেশে কুকর্মে লিপ্ত হতো। ডাকাতি-রাহাজানি ছিলো তাদের নিত্য দিনের কাজ।

তাদের এলাকায় কোনো ভালো মানুষ এসে নিরাপদে ফিরে যেতে পারতোনা। কোনো ব্যবসায়ী বণিক তাদের এলাকায় গেলে তাকে সব কিছু খুইয়ে আসতে হতো। তাদের মধ্যে সামান্যতম লজ্জা-শরম পর্যন্ত ছিলোনা। তাদের মাঝে একজন সৎ লোকও ছিলোনা। এমন একটি লোকও ছিলোনা, যে পাপ কাজে বাধা দেবে। এমন একটি প্রাণীও ছিলোনা, যে পাপকে ঘৃণা করতো। এমন একজন লোকও ছিলোনা, যে কোনো অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করতো।

হযরত লুতের আহ্বান

এই পাপিষ্ঠ লোকদের সত্য পথ দেখাবার জন্যেই মহান আল্লাহ হযরত লুত আলাইহিস্ সালামকে পাঠান। তিনি এসে তাদের আল্লাহর দিকে ডাকলেন। মহান আল্লাহকে ভয় করতে বললেন, কুরআন বলে :

"লুতের জাতি রসূলদের অস্বীকার করেছিল। লুত তাদের বলেছিল, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করবেনা? আমি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত রসূল। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর আমার কথা মেনে নাও।"

আল্লাহর পরম ধৈর্যশীল নবী তাদের আরো বললেন :

"তোমরা এমন পাপাচার করছো, যা তোমাদের আগে কোনো জাতি করেনি।... তোমরা একটি সীমালংঘনকারী জাতি।" (সূরা ৭ আল আ'রাফ : ৮০)

তিনি তাদের বলেছিলেন :

"কেন তোমরা নরদের সাথে নোংরা কাজ করো? কেন ডাকাতি রাহাজানি করো? আর জনসমাবেশে কুকাজে লিপ্ত হও?"

এভাবে লুত আলাইহিস্ সালাম দীর্ঘদিন ধরে তাদের অনেক উপদেশ দিলেন, আল্লাহর পথে আসতে বললেন। পাপাচার থেকে বিরত হতে বললেন। কুকর্মের প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু তাদের একটি লোকও উপদেশ গ্রহণ করলোনা। বরং....

হযরত লূতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

হ্যাঁ, ওরা হযরত লুতের উপদেশ তো গ্রহণ করলোই না, সৎ পথে তো এলোই না, বরং হযরত লুতের সংশোধন কাজের বিরুদ্ধে গড়ে তুললো বিরাট প্রতিরোধ। কেউ তাদের ভালো হবার কথা বলুক এটা তারা সহ্য করতোনা। পাপকাজ ত্যাগ করার কথা তারা শুনতে পারতোনা। ফলে লুত আলাইহিস্ সালামের বিরামহীন সংশোধন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তারা ক্ষেপে উঠলো। হযরত লুত যে তাদেরকে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখিয়েছেন এর জবাবে প্রথমে তারা হযরত লুতকে বললো : আমরা তো তোমাকে আর তোমার খোদাকে প্রত্যাখ্যান করেছি। কই তোমার খোদার আযাব? তুমি যদি সত্যি খোদার নবী হতে তবে তো আল্লাহর আযাব এনে দেখাতে পারতে! তারা আল্লাহর নবী হযরত লুতকে শাঁসিয়ে বললো :

"লুত! যদি তুমি তোমার সংশোধন কাজ থেকে বিরত না হও, তবে তোমাকে অবশ্যি আমাদের দেশ থেকে বের করে দেবো।" (সূরা ২৬ শোয়ারা : আয়াত ৬৭)

কিন্তু আল্লাহর কোনো নবী তো আল্লাহর দীন প্রচারের কাজ থেকে বিরত হতে পারেননা। মানুষকে সৎ পথে ডাকার ও সংশোধন করার কাজ থেকে বিরত হতে পারেননা। হযরত লুত তাঁর মিশন চালিয়ে যেতে থাকলেন। অবশেষে তারা আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে চরম সিদ্ধান্ত নিলো। নেতারা জনগণকে বললো :

"এই লুত আর তার পরিবার পরিজনকে দেশ থেকে বের করে দাও। ওরা বড় পবিত্র লোক!"

এলো ধ্বংসের ফেরেশতারা

আল্লাহর নবী লুত আলাইহিস্ সালামের পূত পবিত্রতা নিয়ে যখন ওরা তিরস্কার করতে থাকলো, আর তাঁকে দেশ থেকে বের করে দেবার ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করলো, তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ ঐ জাতিটিকে পৃথিবীর বুক থেকে নির্মূল করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্যে ফেরেশতা পাঠিয়ে দিলেন।

ফেরেশতারা প্রথমে হযরত ইবরাহিমের কাছে এলো। তাঁর স্ত্রী সারাহ্‌র ঘরে তাঁর একটি পুত্র সন্তান হবার সুসংবাদ দিলো। বিদায় নেবার সময় ইবরাহিম তাদের জিজ্ঞেস করলেন :

'হে দূতেরা! আপনারা কি কোনো অভিযানে এসেছেন?'

- হ্যাঁ, আমরা ঐ (সাদুম) অঞ্চলকে ধ্বংস করে দিতে এসেছি। আমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাদের পাথর মেরে ধ্বংস করে দিতে। আপনার মহান প্রভু আল্লাহর পক্ষ থেকে পাথরে চিহ্ন লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।

ইবরাহিম বললেন : সেখানে তো লুত রয়েছে। তার কি উপায় হবে?

ফেরেশতারা বললেন : আমরা জানি সেখানে কারা আছে? লুত আর তার পরিজনকে নিরাপদ রাখা হবে।

অতপর ফেরেশতারা চলে এলেন সে এলাকায় সুশ্রী মানুষের বেশ ধরে। এসে হযরত লুতের ঘরে উঠলেন। লুত তাদের চিনতে পারেননি। বললেন : আপনাদের তো চিনতে পারছিনে।

তারা বললেন : আমরা আপনার কাছে এসেছি। এই লোকেরা যে বিষয়ে সন্দেহ করছে আমরা সে বিষয়ে ফায়সালা করতে এসেছি।

এতোক্ষণে হযরত লুতের বাড়িতে নতুন মেহমানদের আগমনের খবর পেয়ে গেছে শহরের সব মন্দ লোকেরা। বদমাশ লোকগুলো দৌড়ে এলো মেহমানদের সাথে খারাপ কাজ করার মতলবে। লুত তাদের বাধা দিলেন। আফসোস্ করে বললেন, তোমাদের মাঝে কি একজন ভালো মানুষও নেই?

ফেরেশতারা লুতকে কানে কানে বলে দিলেন, আমরা আল্লাহর দূত ফেরেশতা। এরা আমাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবেনা। রাতের একটি অংশ পার হয়ে গেলে আপনি আপনার পরিবার-পরিজনকে নিয়ে এ এলাকা ত্যাগ করে চলে যাবেন। ওদের ধ্বংসের নির্ধারিত সময়টি হলো ভোর। ভোর তো ঘনিয়ে এলো।

তারপর কি হলো? তারপর ভোর হয়ে এলো। ভোর হবার আগেই হযরত লুত আল্লাহর নির্দেশে এলাকা ত্যাগ করে চলে গেলেন। এদিকে ফেরেশতারা গোটা এলাকার জমিনকে সম্পূর্ণ ওলট-পালট করে দিলেন। অবিরাম পাথর বর্ষণ করে সবকিছু ধ্বংস করে দিলেন। তাদের একটি লোককেও বাঁচিয়ে রাখা হলোনা। বিরান করে দেয়া হলো সবকিছু। সম্পূর্ণ বিনাশ হয়ে গেলো পাপিষ্ঠ জাতি। মহান আল্লাহ বলেন :

"আমি তাদের প্রচণ্ড বর্ষণের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিলাম। সতর্ক করার পরও যারা সংশোধন হয়না, তাদের উপর এমন নিকৃষ্ট বর্ষণই করা হয়ে থাকে।"

নবীর দুর্ভাগা স্ত্রী

যারা ধ্বংস হয়েছে, তাদের সাথে হযরত লুত আলাইহিস্ সালামের স্ত্রীও রয়েছেন। ইনি নবীর স্ত্রী হয়েও কুফরির পক্ষ ত্যাগ করেননি। নবীকে তাঁর দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করেননি। ফলে আল্লাহ তা'য়ালা কাফিরদের সাথে তাকেও ধ্বংস করে দেন। হযরত লুত যখন রাতে ঐ এলাকা ত্যাগ করেন, তখন তাঁর এই স্ত্রী তাঁর সাথে যাননি। কাফিরদের সাথে থেকে যান এবং আল্লাহর গজবে নিপতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যান। আল্লাহ বলেন :

"আমি লুত আর তার পরিবার পরিজনকে সেই ধ্বংস থেকে বাঁচালাম। তবে তার বৃদ্ধা (স্ত্রী) কাফিরদের সাথে রয়ে গেলো। আর আমি তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলাম।"

আল কুরআনের অন্য এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেন :

"আল্লাহ কাফিরদের উপমা বানিয়েছেন নূহ আর লুতের স্ত্রীকে। তারা দু'জন আমার দুই নেক বান্দাহর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলো। কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। স্বামী নবী হয়েও আল্লাহর আযাব থেকে তাদের বাঁচাবার ব্যাপারে উপকারে আসলো না। তাদের নির্দেশ দেয়া হলো : দোজখীদের সাথে প্রবেশ করো দোজখে।" (সূরা ৬৬ আত্ তাহরিম : আয়াত ১০)

লুত জাতি কেন ধ্বংস হলো?

হযরত লুত আলাইহিস্ সালামের জাতিকে আল্লাহ পাক কেন সমূলে ধ্বংস করলেন? কারণ, তারা–

১. আল্লাহর নবীকে অস্বীকার করেছিল।
২. চরম অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার মাঝে নিমজ্জিত হয়েছিল।
৩. নিকৃষ্ট ধরনের পাপ কাজে (সমকামিতায়) ডুবে গিয়েছিল।
৪. ডাকাতি, রাহাজানি ও লুণ্ঠনের রাজত্ব গড়ে তুলেছিল।
৫. চরম কৃপণতা ও নিষ্ঠুরতা তাদের স্বভাবে পরিণত হয়ে পড়েছিল।
৬. পূত পবিত্র জীবন যাপনকে তারা বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ করতো।
৭. তারা নবীকে দেশ থেকে বের করে দেবার ষড়যন্ত্র করেছিল।
৮. নবীকে বিদ্রূপ করে আল্লাহর আযাব আসার দাবি করেছিল।

কুরআনে লুত আলাইহিস্ সালাম

আল্লাহ তা'য়ালা আল কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন : "আমি ইসমাঈল, ইউশা, ইউনুস এবং লুতকে গোটা জগতবাসীর উপর মর্যাদা দান করেছি।" সত্যিই মহান আল্লাহ তাঁর এই নবীকে বিরাট মর্যাদা দিয়েছেন। কুরআন মজিদে লুত নামটি ২৭ (সাতাশ) বার উল্লেখ হয়েছে। যেসব সূরায় উল্লেখ হয়েছে সেগুলো বলে দিচ্ছি : আনআম : ৮৬, আ'রাফ : ৮০, হূদ : ৭০, ৭৪, ৭৭, ৮১, হিজর : ৫৯, ৬১, আম্বিয়া : ৭১, ৭৪, হজ্জ : ৪৩, শোয়ারা : ১৬০, ১৬১, ১৬৭, আন নামল : ৫৪, ৫৬, আনকাবুত : ২৬, ২৭, ৩২, ৩৩, সাফফাত : ১৩৩, সোয়াদ: ১৩, কাফ : ১৩, আল কামার : ৩৩, ৩৪, আত তাহরিম : ১০।

কুরবানির নবী ইসমাঈল

আলাইহিস্ সালাম

"এ কিতাবে ইসমাঈলকেও স্মরণ করো। সে ছিলো প্রতিশ্রুতি পালনকারী। ছিলো একজন রসূল ও নবী। সে তার লোকজনকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিতো। আর সে ছিলো তার প্রভুর অবারিত সন্তোষ প্রাপ্ত।" - আল কুরআন ১৯ : ৫৪-৫৫)।

কে এই ইসমাঈল?

আল্লাহর অবারিত সন্তোষ প্রাপ্ত এই মানুষটি কে? কী তাঁর পরিচয়? কেনইবা আল্লাহ তাঁর উপর নিজ সন্তোষের দুয়ার খুলে দিয়েছেন? হ্যাঁ, আসুন আমরা তাঁকে জানি! খুঁজে দেখি আল্লাহর কিতাবে তাঁর কি পরিচয় দেয়া হয়েছে?

ইনি হলেন বিশ্বনেতা আল্লাহর নবী ইবরাহিম আলাইহিস্ সালামের পুত্র। তাঁর মায়ের নাম হাজেরা। ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণ করেন। পরে মক্কায় মায়ের কোলে লালিত-পালিত হন। একটু বড় হলে আল্লাহ তাঁর পিতাকে নির্দেশ দেন তাঁকে কুরবানি করবার জন্যে। পিতার মতই তিনি আল্লাহর হুকুমের কাছে মাথা পেতে দেন।

এরপর তিনি পিতা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সাথে কা'বা ঘর নির্মাণ করেন। আল্লাহ তাঁকে নবূয়্যত দান করেন। তিনি আরবের হিজাযে সালাত এবং যাকাত ভিত্তিক একটি সুন্দর সমাজ নির্মাণ করেন। ইনিই হলেন আল্লাহর অবারিত সন্তোষ লাভকারী নবী ইসমাইল আলাইহিস্ সালাম।

মায়ের সাথে মক্কায় এলেন

ইবরাহিম আলাইহিস্ সালামের ছিলেন দু'জন স্ত্রী। বড়জন সারাহ আর ছোটজন হাজেরা। সারাহ বুড়ি হয়ে গেছেন, এখনো তাঁর কোনো ছেলেমেয়ে হয়নি। কিন্তু আল্লাহ হাজেরাকে চাঁদের মতো ফুটফুটে একটি ছেলে দান করেন। বুড়ো বয়েসে ছেলে পেয়ে যে ইবরাহিমের কি আনন্দ তা কি আর ভাষায় প্রকাশ করা যায়? তিনি ছেলের নাম রাখেন ইসমাঈল।

কিন্তু আল্লাহ ইবরাহিমকে নিজের বন্ধু বানাবার জন্যে কতো যে পরীক্ষা করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই! শিশুপুত্রের ব্যাপারে তাঁকে পরীক্ষায় ফেললেন। বললেন, শিশু ইসমাঈল ও তার মাকে মক্কার মরু প্রান্তরে রেখে এসো। ইবরাহিমের কাছে আল্লাহর হুকুম শিরধার্য। তিনি তাদের নিয়ে ফিলিস্তিন থেকে

রওয়ানা করলেন মক্কার দিকে। সহীহ্ বুখারিতে এ ঘটনার বিবরণ দিয়ে বড় একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে :

ইবরাহিম হাজেরা ও শিশুপুত্র ইসমাঈলকে সাথে নিয়ে রওয়ানা করেন। পথে হাজেরা শিশুকে দুধ পান করাতেন। অবশেষে একদিন তিনি তাদের নিয়ে মক্কায় এসে উপস্থিত হলেন। এখন যেখানে কা'বা ঘর ও যমযমের কূপ এখানেই একটি গাছের নিচে তাদের রাখেন। তখন মক্কায় কোনো মানুষ ছিলনা। পানিও ছিলনা। ইবরাহিম তাঁদের এক থলে খেজুর আর এক মশক পানি দিয়ে ফিরে চললেন ফিলিস্তিনের দিকে। হাজেরা তাঁর পিছে পিছে দৌড়ে এলেন। বললেন : আপনি কি আল্লাহর হুকুমে আমাদের এখানে রেখে যাচ্ছেন? ইবরাহিম জবাব দিলেন : হ্যাঁ। একথা শুনে হাজেরা বললেন : 'ঠিক আছে, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেননা।' একথা বলে তিনি ফিরে এলেন যথাস্থানে।

এদিকে ইবরাহিম যে প্রিয়তম পুত্র ও স্ত্রীকে রেখে ফিরে চলেছেন, তাঁর তো বুক ফেটে যাচ্ছিল। তাঁর হৃদয়ের কান্না তখন আল্লাহ ছাড়া আর কেউ দেখেননি। কিন্তু এ যে আল্লাহর হুকুম। আর তাঁর হুকুম পালন করাতো অপরিহার্য। আল্লাহর হুকুমে ইবরাহিম এতো বড় বিরহের কাজও করতে পারেন। বুকের মধ্যে মনকে চেপে ধরে নীরবে তিনি ফিরে চলেছেন। পিছনে ফিরে তাকাননি। তাকালে ওদের চেহারা আল্লাহর নির্দেশ পালনে তাঁকে বাঁধা দিতে পারে। তাঁর হৃদয় যেনো সমুদ্রের মতো উদার আর হিমালয়ের মতো অবিচল। সামনে অগ্রসর হয়ে চলেছেন তিনি। কিছুদূর এসে একটি টিলার উপর উঠে ফিরে দাঁড়ালেন। এখান থেকে আর ওদের দেখা যায়না। এখানে দাঁড়িয়ে ইবরাহিম দয়াময় প্রভু মহান আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুলে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে দোয়া করলেন:

"আমার প্রভু! এই দানা-পানিহীন মরুভূমিতে তোমারই সম্মানিত ঘরের পাশে আমার সন্তানের বসতি স্থাপন করে গেলাম। প্রভু ওদের এখানে রেখে গেলাম যাতে ওরা সালাত কায়েম করে। তাই, তুমি মানুষের মনকে ওদের প্রতি আকৃষ্ট করে দিও আর ফলফলারি দ্বারা ওদের জীবিকার ব্যবস্থা করে দিও, যেনো ওরা তোমার শোকরগুযার হয়ে থাকে।" (সূরা ইবরাহিম : ৩৭)

অতপর আল্লাহর ইচ্ছার উপর মনকে অটল রেখে ধীরে ধীরে ইবরাহিম চলে এলেন ফিলিস্তিনের দিকে। এ দিকে হাজেরা মশকের পানি আর থলের খেজুর খেয়ে দিন কাটাতে থাকেন। শিশু ইসমাঈল মায়ের বুকের দুধ পান করেন। কিন্তু অচিরেই মশকের পানি শেষ হয়ে গেলো। পিপাসায় তাঁর ছাতি ফেটে যায়। বুকে দুধ আসেনা। বাচ্চাও ক্ষুধায় পিপাসায় ধড়পড় করছে। মৃত্যু যেনো হাতছানি দিয়ে তাদের ডাকছে। চোখের সামনে অনাহারে শিশুপুত্রের করুণ মৃত্যু কোনো মা কি সহ্য করতে পারে?

পুত্রকে বাঁচানোর জন্য তিনি পানির খোঁজে দৌড়ালেন। সামনেই একটি পাহাড়। এই পাহাড়ের নাম সাফা পাহাড়। তিনি দৌড়ে সাফা পাহাড়ের উপরে উঠে গেলেন। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন কোনো মানুষ দেখতে পান কিনা? উদ্দেশ্য হলো মানুষ দেখতে পেলে কিছু পানি চেয়ে নেবেন। কিন্তু না কোথাও কোনো মানুষ দেখা যায়না।

এবার দ্রুত পাহাড় থেকে নেমে পড়লেন। সামনে মাঠের ওপাশেই আরেকটি পাহাড়। এর নাম মারওয়া পাহাড়। হাজেরা দৌড়ে এসে মারওয়া পাহাড়ের উপর উঠলেন। দুই পাহাড়ের মাঝে সাত চক্কর দৌড়াদৌড়ি করলেন। চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন, কোনো মানুষের সন্ধান পেলেন না। পানির কোনো সন্ধান পেলেন না। ছেলে মৃত প্রায় আর নিজের জীবন ওষ্ঠাগত। হাজেরা চোখের সামনে বাঁচার আর কোনো উপায় দেখেন না। এখন তিনি সম্পূর্ণ অসহায়।

আল্লাহর উপহার যমযমের কূপ

কিন্তু আল্লাহ যে অসহায়ের সহায়! হাজেরা হঠাৎ একটি আওয়ায শুনলেন। আশার আলো নিয়ে সেদিকে কান খাড়া করলেন। বললেন, তুমি যেই হওনা কেন, সম্ভব হলে আমাকে সাহায্য করো। হঠাৎ তিনি একজন ফেরেশতাকে দেখতে পেলেন। এখন যেখানে যমযমের কূপ, ফেরেশতা সেখানে দাঁড়িয়ে মাটির উপর পায়ের গোড়ালি দিয়ে একটি আঘাত করলেন। সাথে সাথে মাটির নিচ থেকে উপচে উঠতে লাগলো পানি।

হাজেরা দৌড়ে এসে চারপাশে বাঁধ দিলেন। অঞ্জলি ভরে পানি পান করলেন। মশকে পানি ভরে নিলেন। বুকে দুধ এলো। ইসমাঈলকে প্রাণ ভরে দুধ পান করালেন। এর নামই যমযম কূপ। সুপেয় অনাবিল পানির অবিরাম ধারা।

ফেরেশতা বলে গেলেন, আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই। এখানেই আল্লাহর ঘর রয়েছে। আপনার পুত্র বড় হয়ে তার পিতার সাথে আল্লাহর ঘর পুন নির্মাণ করবে। আপনারা নিরাপদ।

ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেন

আল্লাহর অসীম সাহায্য পেয়ে হাজেরা আল্লাহর শোকর আদায় করলেন। দিন যায় রাত আসে। ইসমাঈল ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেন। এদিকে পানির সন্ধান পেয়ে মক্কার আকাশে পাখি এলো। পানির সন্ধান পেয়ে ইয়েমেন দেশীয় জুরহুম গোত্রের একদল লোক মক্কায় বসবাস করার জন্যে হাজেরার অনুমতি চাইলো। তিনি তাদের অনুমতি দিলেন। ফলে মক্কায় জনবসতি গড়ে উঠলো। পানির ছোঁয়াচ পেয়ে মরুভূমিতে ফল ফলারি উৎপন্ন হতে থাকলো। আল্লাহ ইসমাঈল ও তার মায়ের সব অসুবিধা দূর করে দিলেন। এখানে যে জনবসতি গড়ে উঠেছে এর কর্তৃত্ব কিন্তু ইসমাঈলের মায়ের হাতেই থাকলো।

ইবরাহিম আলাইহিস্ সালাম প্রায়ই প্রাণপ্রিয় পুত্র ইসমাঈল ও স্ত্রী হাজেরাকে দেখার জন্যে মক্কায় আসেন। ইসমাঈলের হাঁটাহাঁটি দৌড়াদৌড়ি দেখে ইবরাহিমের মন ভরে যায়। ফুটফুটে টুকটুকে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি আনন্দে আল্লাহর শোকর আদায় করেন। যখন আশেপাশের মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকার জন্যে বের হন, ইসমাঈলকে সাথে নিয়ে যান। এভাবে কিছুদিন মক্কায় থেকে আবার চলে যান ফিলিস্তিন। আবার ফিরে আসেন মক্কায়। ইসমাঈল দিন দিন বেড়ে উঠেন। পিতা তাকে মনের মতো সুন্দর করে গড়ে তোলেন। যেমন বাপ, তেমনি আল্লাহর অনুগত হয়ে গড়ে উঠে ইসমাঈল। ফলে পিতার মহব্বত বেড়ে যায় পুত্রের প্রতি। আল্লাহর প্রতি তাদের পিতা পুত্রের ভালবাসাকে আল্লাহ্ পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেন।

যবাই হবার হুকুম পেলেন

ইবরাহিম একদিন স্বপ্ন দেখেন তিনি তার প্রাণপ্রিয় পুত্রের গলায় ছুরি চালাচ্ছেন। নবীদের স্বপ্নও একপ্রকার অহি বা আল্লাহর আদেশ। আল্লাহর হুকুম শিরধার্য। কিন্তু ইসমাঈল কি এ হুকুম মেনে নেবে? আসলে আল্লাহ তো সে পরীক্ষাই নিতে চান। আল্লাহতো দেখতে চান ইসমাঈল আল্লাহর হুকুমের সামনে মাথা নত করে দেয় কিনা? নিজের জীবনের চাইতেও আল্লাহর হুকুম পালন করাকে বড় কর্তব্য মনে করে কিনা? আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সে নিজের জীবনকে কুরবানি করতে প্রস্তুত আছে কিনা?

কিন্তু ইসমাঈল তো তাঁর পিতার মতোই আল্লাহর অনুগত। আল্লাহর সন্তুষ্টির চাইতে বড় কোনো কাম্য তাঁর নেই। পিতা ইবরাহিম আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরবানি করার হুকুম শুনিয়ে দেবার সাথে সাথে আল্লাহর অতি সম্মানিত দাস ইসমাঈল বলে উঠেন :

"আব্বা! আপনি আল্লাহর নির্দেশ পালন করুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে অটল অবিচল ও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী পাবেন।" (সূরা ৩৭ আস সাফফাত : আয়াত ১০২)

তারপর যখন পিতা পুত্র দু'জনই আল্লাহর হুকুমের সামনে মাথা নত করে দিলেন এবং ইবরাহিম পুত্রকে উপুড় করে শুইয়ে দিয়ে ছুরি চালাতে উদ্যত হলেন, তখন নিজের দুই 'প্রভু পাগল' দাসের জন্যে আল্লাহর মহব্বতের দরিয়া উথলে উঠে। সাথে সাথে তিনি ডাক দিয়ে বললেন :

"ইবরাহিম থামো, স্বপ্নকে তুমি সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছো।" (সূরা ৩৭ আস সাফফাত : আয়াত ১০৫)

বাস্, বাপ বেটা দু'জনই আল্লাহর পরীক্ষায় পাশ করলেন। আর আল্লাহর পরীক্ষায় পাশ করার চাইতে বড় বিজয় কি হতে পারে? আল্লাহর ফেরেশতারা ইবরাহিমের সামনে একটি দুম্বা এনে রেখে দিলেন এবং সেটিকে কুরবানি করে

দিতে বললেন। ইবরাহিম কৃতজ্ঞ মনে পুত্রের পরিবর্তে দুম্বাটি যবাই করে দিলেন। মহান আল্লাহ বলেন :

'আমরা একটি মহান কুরবানির বিনিময়ে ইসমাঈলকে ছাড়িয়ে নিলাম।' (সূরা ৩৭ আস সাফফাত : আয়াত ১০৭)

সত্যি এটা ছিলো একটা বিরাট কুরবানি। আল্লাহর হুকুম মতো পিতা পুত্রকে কুরবানি করতে রাজি হয়ে যান। আবার পুত্রও আল্লাহর হুকুমে যবাই হবার জন্যে ছুরির নিচে গলা পেতে দেন। তাইতো এটা একটা বিরাট কুরবানি, বিরাট আত্মত্যাগ। সে জন্যেই আল্লাহ তা'আলা এই বিরাট কুরবানিকে চিরদিন স্মরণীয় করে রাখার জন্যে সেই তারিখে যেনো মুমিনরা আল্লাহর হুকুমে নিজেদের আত্মত্যাগের প্রমাণ স্বরূপ পশু কুরবানি করে, এ নিয়ম চালু রেখেছেন।

বিগত প্রায় চার হাজার বছর থেকে মানুষ ইসমাঈল ও তার পিতার সেই বিরাট কুরবানিকে স্মরণ করে। প্রতি বছর ঐ তারিখে মুসলিমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু কুরবানি করে। যারা মক্কায় হজ্জ পালন করতে যায়, ঐ তারিখে সেখানে কুরবানি করা তাদের জন্যে অবশ্য করণীয় কাজ। যারা আল্লাহর হুকুমের সামনে বিনীত হয়ে মাথা নত করে দেন, আল্লাহ তাদের এভাবেই পুরস্কৃত করেন। পরীক্ষায় পাশের পর আল্লাহ ইসমাঈলকে নবুয়্যত দান করেন।

এর আগে ইসমাঈলের মা যে পানির সন্ধানে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করলেন মহান আল্লাহ সেই ঘটনাটিকেও চির স্মরণীয় করে রাখলেন। যারাই মক্কায় হজ্জ করতে যাবে, তাদের জন্যে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করার নিয়ম আল্লাহ চালু করে দিলেন। মা হাজেরার সেই কষ্টকে আল্লাহ স্মরণীয় করে রাখলেন কেন?

কারণ তিনি যে আল্লাহর ইচ্ছায় মক্কার জনমানবহীন মরুভূমিতে বসবাস করতে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর স্বামী ইবরাহিম যখন বললেন, আল্লাহর ইচ্ছায় তাকে এই মরুভূমিতে রেখে যাচ্ছেন, তখন তিনি একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে সেখানে থেকে গেলেন। তাঁর এই যে বিরাট আল্লাহনির্ভরতা, এরি বিনিময়ে আল্লাহ পাক তাঁকে চির স্মরণীয় ও সম্মানিত করে রাখলেন।

বিয়ে করলেন পিতা হলেন

দিন যায় রাত আসে। বছর ঘুরে আসে নতুন বছর। ইসমাঈল বড় হয়ে উঠেন। পাশেই বসবাস করছে জুরহুম গোত্রের লোকেরা। ইসমাঈল তার সুন্দর ও চমৎকার মানবীয় গুণাবলির জন্যে তাদের খুব প্রিয় হয়ে উঠেন। ইসমাঈল যৌবনপ্রাপ্ত হলে তারা তাদের এক মেয়েকে ইসমাঈলের কাছে বিয়ে দেয়। বিয়ের কিছুকাল পরই তাঁর মা হাজেরা ইহলোক ত্যাগ করেন। আল্লাহ পাক ইসমাঈলের মাকে নিজ রহমতের ছায়াতলে স্থান দিন।

এরই মাঝে ইবরাহিম এলেন প্রিয় পুত্র ও স্ত্রীকে দেখার জন্যে। ইসমাঈল এসময় মক্কার বাইরে ছিলেন। ইবরাহিম এসে পুত্রকে বাড়িতে পেলেননা। স্ত্রী হাজেরাও মৃত। ঘরে শুধু পুত্রবধু। কিন্তু পুত্রবধু একজন সত্যিকার মুমিন মহিলার মতো আচরণ করেননি। একজন নবীর স্ত্রী আরেকজন নবীর পুত্র বধু হিসেবে তো তার আদর্শ মুসলিম মহিলা হওয়া উচিত ছিলো। ফলে পিতার নির্দেশে ইসমাঈল এ মহিলাকে তালাক দেন এবং আরেকজন আদর্শ মুমিন মহিলাকে বিয়ে করেন। এ ঘরে তার কয়েকটি ছেলেমেয়ে জন্ম হয়। তারাও আদর্শ মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠেন।

কা'বা নির্মাণে অংশ নিলেন

একদিন পিতা ইবরাহিম ইসমাঈলকে ডেকে বললেন : 'আল্লাহ আমাকে একটি কাজের হুকুম দিয়েছেন। তুমি কি আমাকে সে কাজে সাহায্য করবে? ইসমাঈল বললেন: 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করবো।' ইবরাহিম সামনের উঁচু টিলাটি দেখিয়ে বললেন : 'মহান আল্লাহ্ আমাকে এখানে একটি ঘর বানাবার নির্দেশ দিয়েছেন।'

অতপর বাপ বেটা দু'জন মিলে আল্লাহর ঘর কা'বা ঘর নির্মাণ কাজ শুরু করলেন। ইসমাইল পাথর যোগান দেন আর ইবরাহিম গাঁথুনি গেঁথে দেয়াল নির্মাণ করেন, ছাদ নির্মাণ করেন। গাঁথুনি যখন উপরে উঠছিল, ইসমাঈল তখন একটি বড় পাথর এনে দিলেন। ইবরাহিম সে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। আজও সে পাথরটি কা'বা ঘরের পাশে বিদ্যমান আছে। আপনি যখন হজ্জ বা উমরা করতে যাবেন সে পাথরটি দেখতে পাবেন। ওখানে দু'রাকা নামায পড়তে হয়। সে পাথরটির নাম মাকামে ইবরাহিম।

বাপ ছেলে মিলে যখন বাইতুল্লাহ্ (আল্লাহর ঘর) নির্মাণ শেষ করলেন, তখন দু'জনে প্রভু দয়াময় আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, তিনি যেনো তাদের এই খিদমত কবুল করেন। মহান আল্লাহ্ তাদের এই বিরাট খিদমত কবুল করে নেন। তাঁদের নির্মাণ করা ঐ ঘরকে চিরদিনের জন্যে হজ্জ ও তাওয়াফের কেন্দ্রে পরিণত করে দেন। সারা পৃথিবী থেকে মানুষ আল্লাহর এই ঘরকে তাওয়াফ করার জন্যে মক্কায় ছুটে যায়। আপনি সেই ঘরের তাওয়াফ করার নিয়্যত করে রাখুন। হয়তো আল্লাহ্ একদিন সুযোগ করে দিবেন। অতপর ঐ ঘরকে কেন্দ্র করে মক্কা একটি স্থায়ী শহরে পরিণত হয়। সারা পৃথিবী থেকে আল্লাহভক্ত লোকেরা ছুটে আসে সেখানে। আল্লাহর ঘর ধরে তারা রোনাজারি করে।

সালাত ও যাকাত ভিত্তিক সমাজ গড়লেন

ইসমাইলের পিতা ইবরাহিম আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করেছিলেন : 'আমাকে নেককার সন্তান দান করো।' সত্যিই আল্লাহ্ তাঁকে নেক

পুত্র দান করেন। ইবরাহিম আরো দোয়া করেছিলেন : 'প্রভু, আমাকে সালাত কায়েমকারী বানাও আর আমার সন্তানদেরকেও।'

ইসমাঈলকে আল্লাহ তা'আলা শুধু নেককারই বানাননি, শুধু সালাত কায়েমকারীই বানাননি, সেই সাথে একজন আদর্শ নবীও বানিয়েছিলেন। তাইতো মহান আল্লাহ বলেন :

"ইসমাঈল, আলয়াসা, ইউনুস, লুত এদের প্রত্যেককেই আমি বিশ্ববাসীর উপর মর্যাদা দান করেছি।" (সূরা আল আনআম : ৮৬)

ইসমাঈল মক্কা ও হিজাযের লোকদের আল্লাহর পথে ডাকেন। তাদের তিনি আল্লাহকে জানার, বুঝার ও আল্লাহর পথে চলার তা'লিম দেন। তিনি তাদের সালাত কায়েম করার নির্দেশ দেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যাকাত ভিত্তিক সমাজ গড়ার শিক্ষা দেন। সালাত ও যাকাত ভিত্তিক একটি আদর্শ সমাজ গড়ার কাজে তাঁকে অনেক বিপদ মুসিবত ও বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তিনি সবার সাথে এসব কিছুর মোকাবেলা করেন। তাইতো আল্লাহ তাঁর প্রশংসা করে বলেন :

"ইসমাঈল, ইদরিস, যুলকিফ্‌ল এরা সকলেই ছিলো সবর অবলম্বনকারী। আমি তাদেরকে আমার রহমতের ছায়াতলে স্থান দিয়েছি। তারা ছিলো যোগ্য লোক ও সততার প্রতীক।" (সূরা ২১ আল আম্বিয়া : আয়াত ৮৫)

ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম তাঁর লোকদের নিয়ে কা'বা কেন্দ্রিক একটি আদর্শ ইসলামি সমাজ গড়েন। জানা যায়, তাঁর বারজন পুত্র ছিলো এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন ইসলামি সমাজের কান্ডারি।

তাঁরই বংশে জন্ম নিলেন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ

মহান আল্লাহ ইসমাঈল আলাইহিস্ সালামকে আরো একটি বড় মর্যাদা দান করেছেন। সেটা হলো, তাঁরই বংশে পাঠিয়েছেন শেষ নবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। কা'বা নির্মাণের পর ইসমাঈল পিতা ইবরাহিমের সংগে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন।

"প্রভু! আমাদের বংশ থেকে তাদের মাঝে একজন রসূল পাঠিও, যিনি ওদেরকে তোমার আয়াত পাঠ করে শুনাবেন, কিতাব ও হিকমাহ্ শিক্ষা দেবেন আর তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ পরিচ্ছন্ন করবেন।" (সূরা বাকারা : আয়াত ১২৯)

আল্লাহ ইসমাঈল ও তাঁর পিতার দোয়া কবুল করেন। ইসমাঈলের বংশেই মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর আবির্ভাব ঘটান। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ এসে পৃথিবীতে আবার ইবরাহিম ও ইসমাঈল আলাইহিস্ সালামের মতোই কা'বা কেন্দ্রিক ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

এই কা'বা এবং কা'বা কেন্দ্রিক হজ্জ, তওয়াফ, কুরবানি, সাফা মারওয়া দৌড়াদৌড়ি মাকামে ইবরাহিমে সালাত আদায় ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ পাক

ইবরাহিম আলাইহিস্ সালাম, ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর সম্মানিত মা হাজেরা আলাইহিস্ সালামকে চিরদিন পৃথিবীতে স্মরণীয় করে রাখার ব্যবস্থা করলেন। মহান আল্লাহ তাঁর অনুগত দাসদের এভাবেই পুরস্কৃত করেন।

কুরআনে ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম

মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী ইসমাঈল আলাইহিস্ সালামকে বিরাট সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। কুরআন মজিদে বারটি স্থানে আল্লাহ্ পাক ইসমাঈলের নাম উল্লেখ করেন। কয়েকটি আয়াত তো আগেই উল্লেখ করেছি। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসমাঈল সম্পর্কে আরো বলেন:

"স্মরণ করো, ইসমাঈল, আলয়াসা, যুলকিফ্লকে। এরা সবাই ছিলো উত্তম আদর্শ।" (সূরা ৩৮ সোয়াদ : আয়াত ৪৮)

"হে মুহাম্মদ! তোমার কাছে আমি অহি পাঠাচ্ছি, যেমন পাঠিয়েছিলাম নূহ এবং তার পরবর্তী নবীদের কাছে, যেমন পাঠিয়েছিলাম ইবরাহিম ও ইসমাঈলের কাছে...।" (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ১৩৬)

"হে মুহাম্মদ! বলো : আমরা আল্লাহকে মানি আর ইবরাহিম ও ইসমাঈলের.... কাছে যা নাযিল হয়েছে তা-ও মানি।" (সূরা ২ বাকারা : আয়াত ১৩৬)

যেসব সূরায় ইসমাঈল আলাইহিস্ সালামের কথা উল্লেখ হয়েছে, সেগুলো হলো : সূরা আল বাকারা : ১২৫-১৪০, আলে ইমরান : ৮৪, আননিসা ১৬৩, আল আনআম : ৮৬, ইবরাহিম : ৩৯, মরিয়ম ৫৪, আল আম্বিয়া : ৮৫, সোয়াদ : ৪৮।

❖

ইবরাহিম পুত্র ইসহাক

আলাইহিস্ সালাম

পূর্ব কথা

আপনারা আগেই জেনে এসেছেন মহান রসূল আল্লাহর বন্ধু ইবরাহিম আলাইহিস্ সালামের কাহিনী। শুনেছেন তাঁর অগ্নিপরীক্ষার কথা, হিজরতের কথা এবং আল্লাহর দীন প্রচারের জন্যে দেশ হতে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানোর কথা। শেষ বয়েসে মহান আল্লাহ তাঁকে দু'টি পুত্র সন্তান দান করেন। দু'জনকেই নবুয়্যত দান করেন, আরো দান করেন উচ্চ মর্যাদা। তাদের একজন ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম আর অপরজন ইসহাক আলাইহিস্ সালাম। ইসমাঈলের ইতিহাস তো আগেই বলে এসেছি। এবার শুনা যাক ইসহাকের কথা।

হযরত ইবরাহিমের ছিলেন দু'জন স্ত্রী। একজন সারাহ আর অপরজন হাজেরা। সারাহ প্রথম স্ত্রী। তাঁকে সাথে নিয়েই হযরত ইবরাহিম তাঁর মাতৃভূমি ইরাক থেকে হিজরত করেন। অনেক দেশ ঘুরে মিশরে যান। সেখানে বিয়ে করেন দ্বিতীয় স্ত্রী হাজেরাকে। সেখান থেকে ফিরে আসেন ফিলিস্তিনে। এখানে আসার পর হাজেরার ঘরে তাঁর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সে পুত্রই ছিলেন কুরবানির নবী হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম। আল্লাহর হুকুমে হযরত ইবরাহিম শিশুপুত্র ইসমাঈল ও তাঁর মাকে মক্কায় নিয়ে রেখে আসেন।

সারাহ ফিলিস্তিনেই থেকে যান। হযরত ইবরাহিমও ফিলিস্তিনেই থাকতেন। আবার মক্কায় গিয়ে স্ত্রী ও পুত্র ইসমাঈলকে দেখাশুনা করে আসতেন।

সারার দুঃখ

কিন্তু সারার বড় দুঃখ। তিনি একজন বন্ধ্যা মহিলা। তাঁর সন্তানাদি হয়না। অথচ সব নারীই মা হতে চায়। সন্তানের মুখ দেখতে চায়। সন্তানকে বুকভরা আদর আর স্নেহ মমতা দিয়ে জড়িয়ে রাখতে চায়। মা ডাক না শুনলে কোনো নারীরই বুক ভরেনা। সন্তান ছাড়া নারীর কোল থাকে শূন্য।

বুকভরা আশা নিয়ে সারাহ্ সব সময় দয়াময় আল্লাহর কাছে দোয়া করেন সন্তান চেয়ে। কিন্তু আজো তাঁর সন্তান হয়নি। তিনি বৃদ্ধা হয়ে পড়েছেন। বয়েস হয়ে গেছে নব্বই। স্বামীও এখন শতায়ু বৃদ্ধ। সন্তান লাভের আর কি আশা? এ ঘরে সন্তান লাভের ব্যাপারে এখন দু'জনই নিরাশ। কিন্তু হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেলো। কী সে কাণ্ড?

সুসংবাদ পেলেন সারাহ্

হঠাৎ একদিন হযরত ইবরাহিমের বাড়িতে এলো কয়েকজন তাগড়া যুবক। অতি সুন্দর সুশ্রী হৃষ্টপুষ্ট ওরা। যেনো শক্তিশালী যোদ্ধা এবং বিরাট কোনো সম্রাটের সৈনিক। তাদের আকস্মিক আগমনে ইবরাহিম ভয় পেয়ে গেলেন। তবে তারা এসেই হযরত ইবরাহিমকে সালাম দেন এবং তিনিও সালামের জবাব দিয়ে তাদেরকে মেহমান হিসেবে গ্রহণ করেন।

মেহমান এলে হযরত ইবরাহিম অত্যন্ত খুশি হতেন। কারণ তিনি ছিলেন বড় মেহমান নেওয়াজ। ওদের বসতে দিয়ে তিনি ভেতরে চলে গেলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাজা গরুর গোশত ভুনা করে নিয়ে এলেন। সারাহও পিছে পিছে এসে পর্দার আড়ালেই দাঁড়ালেন। ইবরাহিম সারার ভুনা করা মজাদার গোশ্ত তাদের পরিবেশন করতে থাকলেন। কিন্তু অবাক কাণ্ড!

ওরা হাত গুটিয়ে রাখলো। খাবার স্পর্শ করছেনা। ইবরাহিম ভাবলেন, নিশ্চয়ই এরা শত্রু হতে পারে। বললেন : আপনারা কারা? আপনাদের তো চিনতে পারছিনে? আপনাদেরকে আমার ভয় হচ্ছে।

এবার তারা মুখ খুললো। বললো : আপনি ভয় পাবেননা। আমরা আল্লাহর দূত ফেরেশতা। আমরা আল্লাহর কাছ থেকে আপনার জন্য সুসংবাদ নিয়ে এসেছি। সারার ঘরে আপনার একটি বিজ্ঞ পুত্র সন্তানের জন্ম হবে।

একথা শুনেই সারাহ্ বিস্মিত হয়ে সামনে এগিয়ে এলেন। কপালে হাত মেরে বললেন, এতো এক বিস্ময়ের খবর! আমি হয়ে গেছি বুড়ি থুরথুড়ি। তার উপরে জনমের বন্ধ্যা! শুধু কি তাই, আমার স্বামীও শতায়ু বৃদ্ধ। কেমন করে হবে আমার ছেলে?

ফেরেশতারা বললেন : "এতো আল্লাহর সিদ্ধান্ত। আপনি কি আল্লাহর ফয়সালার ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করছেন? এ সুসংবাদ নির্ঘাত সত্য। এর কোনো নড়চড় হবেনা। আপনার গর্ভে ইসহাক জন্ম নেবেই। শুধু তাই নয়, ইসহাক একজন নবী হবে আর তার ঘরেও জন্ম নেবে আরেক নবী ইয়াকুব। এ হচ্ছে আল্লাহর রহমত। পথভ্রান্তরা ছাড়া আর কেউ কি আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়? আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী, সপ্রশংসিত, অতিশয় মর্যাদাবান। তিনি যা চান তাই হয়। হে ঘরবাসী! আল্লাহর রহমত আর বরকতের ধারা বর্ষিত হোক আপনাদের প্রতি।" (সূরা ১১ হূদ : ৭২-৭৩)

জন্ম নিলেন ইসহাক

আল্লাহর হুকুমের নড়চড় নেই। হযরত ইবরাহিম ও সারার ঘর উজ্জ্বল করে পৃথিবীতে এলেন ইসহাক। চাঁদের মতো ফুটফুটে ছেলে। বুড়ো বয়েসে ছেলে হলে আদরের সীমা থাকেনা। বাবা মার আদরে লালিত পালিত হয়ে বড় হতে থাকলেন ইসহাক। যেমন বাপ তেমন ছেলে। মহান আল্লাহ ইসহাককে দান করেছেন দারুণ মেধা, জ্ঞান এবং বুঝ ও বুদ্ধি।

নবুয়্যত লাভ

বড় হলে ইসহাককে আল্লাহ তা'আলা নবুয়্যত দান করেন। একজন প্রশংসিত নবী হিসেবে কুরআন মজিদে বার বার তাঁর নাম উল্লেখ হয়েছে। ফিলিস্তিন অঞ্চলে তিনি তাঁর পিতা হযরত ইবরাহিম আলাইহিস্ সালামের প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত হিসেবে দীন ইসলামের প্রচার ও প্রসার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। হযরত ইবরাহিম যে বিরাট অঞ্চলে ইসলাম কায়েম করে গিয়েছিলেন, পরবর্তীতে তাঁরা দুই ভাই ইসমাঈল ও ইসহাক তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হিজায অঞ্চলে দায়িত্ব পালন করেন বড় ভাই ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম। আর ফিলিস্তিন অঞ্চলের দায়িত্ব পালন করেন ছোট ভাই ইসহাক আলাইহিস্ সালাম।

হযরত ইসহাকের বংশ

হযরত ইসহাককে আল্লাহ তা'আলা এক ঐতিহাসিক গোত্রের পূর্ব পুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পুত্র ইয়াকুবকে আল্লাহ তা'আলা নবী মনোনীত করেন। ইয়াকুবের আরেক নাম ছিলো ইসরাঈল। তাঁর সন্তানরা বনি ইসরাঈল (ইসরাঈলের বংশধর) হিসেবে খুবই খ্যাতি অর্জন করেছে। মূলত এ বংশের ধারাবাহিকতা হযরত ইসহাক থেকেই আরম্ভ হয়। এ বংশে আল্লাহ অসংখ্য নবী প্রেরণ করেছেন। ইসলামের সঠিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত অবস্থায় আজো এ বংশের লোকেরা পৃথিবীতে বর্তমান আছে।

হযরত ইসহাকের প্রশংসনীয় গুণাবলি

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজিদে তাঁর দাস ও নবী ইসহাক আলাইহিস্ সালামের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এবার কুরআন থেকে তাঁর প্রশংসা ও গুণাবলি জেনে নেয়া যাক। মহান আল্লাহ বলেন :

১. "আমার দাস ইবরাহিম, ইসহাক আর ইয়াকুবের কথা স্মরণ করো। তারা ছিলো বড় কর্মঠ আর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। একটি খাঁটি গুণের কারণে আমি তাদের মর্যাদাবান করেছিলাম। আর তা হলো পরকালের চিন্তা। তারা আমার কাছে বাছাই করা আদর্শ মানুষ।" (সূরা সোয়াদ : আয়াত ১০২)

২. "অতপর আমি ইবরাহিমকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম। বললাম : সে হবে একজন নবী ও উন্নত আমলের সুযোগ্য লোক।" (সূরা আস সাফফাত : ১১২)

৩. "আর আমি তাকে দান করেছি ইসহাককে। তাছাড়াও ইয়াকুবকে। তারা প্রত্যেকেই ছিলো সৎ সুযোগ্য। আমি তাদের নেতা বানিয়েছি। তারা আমার নির্দেশ মতো মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করতো। আমি তাদের কাছে অহি করেছিলাম কল্যাণমূলক কাজ করার, সালাত কায়েম করার ও যাকাত পরিশোধ করার। তারা ছিলো আমার একান্ত অনুগত।" (সূরা আল আম্বিয়া : ৭৩)

৪. "অতপর... আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুবের মতো সন্তান দান করলাম

আর তাদের প্রত্যেককেই বানালাম নবী। নিজ রহমতে তাদের ধন্য করলাম আর মানুষের মাঝে তাদেরকে সত্যিকার সুনাম ও সুখ্যাতি দান করলাম।" (সূরা ১৯ মরিয়ম : আয়াত ৪৯-৫০)

৫. "হে মুহাম্মদ! আমি তোমার প্রতি ঠিক তেমনি অহি নাযিল করেছি, যেমন করেছিলাম নূহ এবং তার পরবর্তী নবীদের প্রতি। যেমন আমি অহি পাঠিয়েছি ইবরাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক..... এর প্রতি..... এরা সবাই ছিলো সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রসূল।" (সূরা আন নিসা : ১৬৩-১৬৫)

কুরআন মজিদের এ আয়াতগুলো থেকে আমরা হযরত ইসহাকের অনেকগুলো প্রশংসিত গুণাবলির কথা জানতে পারি। মহান আল্লাহ নিজেই তাঁর এসব গুণাবলির কথা উল্লেখ করেছেন। গুণগুলো হলো :

১. পরকালের চিন্তা। অর্থাৎ পরকালমুখী চিন্তা ও পরকালমুখী কাজ।
২. কর্মঠ। অর্থাৎ দক্ষতা ও কর্মমুখীতা।
৩. দূরদৃষ্টি।
৪. সততা ও যোগ্যতা।
৫. উন্নত আমল।
৬. আল্লাহর আনুগত্য ও বাধ্যতা।
৭. সুসংবাদদাতা। অর্থাৎ মুমিনদের জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।
৮. সতর্ককারী। অর্থাৎ আল্লাহর পাকড়াও সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করেছেন।
৯. সামাজিক নেতৃত্ব দান।
১০. নেতৃত্ব লাভের পর :
    ক. আল্লাহর বিধান মতো মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন।
    খ. জনকল্যাণমূলক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন।
    গ. সালাত কায়েম করেছেন এবং
    ঘ. যাকাত ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এসব কারণে আল্লাহ তাঁকে উচ্চ মর্যাদা ও সুনাম সুখ্যাতি দান করেছেন।

কুরআনে উল্লেখ

কুরআন মজিদে হযরত ইসহাকের নাম উল্লেখ হয়েছে ১৭ বার। যেসব সূরাতে উল্লেখ হয়েছে সেগুলো বলে দিচ্ছি :

সূরা আল বাকারা : ১৩৩, ১৩৬, ১৪০। সূরা আলে ইমরান : ৮৪। সূরা আন নিসা : ১৬৩। সূরা আল আন'আম : ৮৪। সূরা হূদ : ৭১, ৭১। সূরা ইউসুফ : ৬, ৩৮। সূরা ইবরাহিম : ৩৯। সূরা মরিয়ম : ৪৯। সূরা আল আম্বিয়া : ৭২। সূরা আল আনকাবুত : ২৭। সূরা সাফফাত : ১১২, ১১৩। সূরা সোয়াদ : ৪৫।

❖

ইসরাঈলিদের পিতৃপুরুষ ইয়াকুব

আলাইহিস্ সালাম

নাম ও বংশ পরিচয়

মহাকালের সাক্ষী এক মহাপুরুষ ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম। পৃথিবীর এক ঐতিহাসিক বংশের তিনি আদি পুরুষ। সেকালে ইবরানি ভাষা নামে একটি ভাষা চালু ছিলো। বহু নবীর মুখের ভাষা ছিলো এই ইবরানি ভাষা। এ ভাষায় আল্লাহ তা'আলা কিতাবও নাযিল করেছেন। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামের ভাষাও ছিলো এই ইবরানি ভাষা। এ ভাষায় তার নাম ছিলো ইসরাঈল। এর অর্থ কি? ইসরাঈল মানে আল্লাহর দাস। অন্য সকল নবীর মতো তিনিও আল্লাহর দাসই ছিলেন। তবে সেই সাথে তাঁর নামটিও ছিলো 'আল্লাহর দাস'। এর আরবি অনুবাদ হলো 'আবদুল্লাহ।'

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদাবান এক নবী। পূর্ব পুরুষের দিক থেকে তিনি এক সম্মানিত নবীর পুত্র আরেক সম্মানিত নবীর নাতি। অর্থাৎ তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহিমের নাতি আর হযরত ইসহাকের পুত্র। অন্যদিকে তাঁর বংশেও জন্ম নিয়েছেন অসংখ্য নবী। তিনি ইসরাঈল নামে পরিচিত হবার কারণে তার বংশধরদের বলা হয় 'বনি ইসরাঈল' বা ইসরাঈলের বংশধর।

কোনো কোনো সূত্র থেকে জানা যায় তাঁর বংশধরদের মধ্যে চার হাজার নবী জন্মগ্রহণ করেন। হযরত ইউসুফ, মূসা, হারুণ, দাউদ, সুলাইমান, যাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ঈসা আলাইহিমুস সালাম প্রমুখ বিখ্যাত নবী রসূলগণ ছিলেন তাঁরই বংশধর।

জন্ম ও শৈশব

আপনারা আগেই জেনেছেন হযরত ইবরাহিম আলাইহিস্ সালাম তাঁর প্রথম স্ত্রী সারাহকে নিয়ে ফিলিস্তিনের কেনান শহরে বসবাস করতেন। এখানে সারার ঘরে জন্ম নেন হযরত ইসহাক আলাইহিস্ সালাম। আর এ শহরেই জন্ম হয় ইসহাকের পুত্র ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামের। নবীর পুত্র শৈশব থেকেই জ্ঞানে গুণে নবীর মতো হয়ে গড়ে উঠতে থাকেন। তাঁর উন্নত জ্ঞান বুদ্ধি, সুন্দর স্বভাব চরিত্র আর অমায়িক ব্যবহার দেখে ছোটবেলা থেকেই বুঝা যাচ্ছিল, তিনি হবেন একজন মহামানব।

যৌবনকালে খালার বাড়ি

ইয়াকুব যখন যৌবনে পদার্পণ করেন, তখন একদিন তাঁর মা রিফকাহ্ তাকে তার খালার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন: তুই সেখানে গিয়ে থাক্‌গে। যুবক ইয়াকুব মায়ের হুকুমে খালার বাড়ি চলে এলেন। আপনারা নিশ্চয়ই বেবিলন শহরের নাম শুনেছেন। হ্যাঁ, এখন এ শহরটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শহরটি ছিলো ইরাকে। এই বেবিলনের 'ফুদ্দানে আরাম' নামক স্থানেই ছিলো ইয়াকুবের খালার বাড়ি। এখানে এসে ইয়াকুব শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতা আর মেধা বুদ্ধির বিরাট সুযোগ পেলেন।

বিয়ে করলেন ইয়াকুব

খালার বাড়িতে হযরত ইয়াকুব সতের বা বিশ বছর অবস্থান করেন। এখানেই তিনি বিয়ে শাদি করেন। তিনি চারটি বিয়ে করেন। বড় স্ত্রীর নাম ছিলো লিয়া, দ্বিতীয় স্ত্রী রাহিল, তৃতীয় স্ত্রী যুলফা, আর চতুর্থ স্ত্রী ছিলেন বলুহা।

তাঁর কোন্ স্ত্রীর ঘরে কয়টি পুত্র হয়েছিল, ইতিহাসে তাও উল্লেখ আছে। আসুন তাঁর পুত্রদের নাম আপনাদের জানিয়ে দিই : লিয়ার ঘরে জন্ম হয় ছয়টি পুত্র। ওদের নাম হলো : রুবিল, শামউন, লাভি, ইয়াহুযা, ইসাখার ও যাবলুন।

রাহিলের ঘরে জন্ম নেন দু'জন পুত্র সন্তান। তারা হলেন : ইউসুফ ও বিনয়ামিন।

যুলফার গর্ভে জন্ম হয় দু'ছেলে জাদ ও আশির।

বলুহার ঘরেও দু'টি পুত্র জন্ম নেন। তারা হলেন দান ও নাফতালি।

এবার বলুন তো হযরত ইয়াকুবের মোট কয়টি ছেলে ছিলো? গুণে দেখুন, সব মিলে হলো বারটি। এই বার ছেলে থেকেই জন্ম নেয় বনি ইসরাঈলের বারটি শাখা গোত্র।

এদের মধ্যে লাভির বংশে জন্ম নেন হযরত মূসা ও হারূণ আলাইহিমুস সালাম। ইয়াহুযা ছিলেন ধর্মীয় দিক থেকে খুব প্রভাবশালী। পরবর্তীকালে তার নাম অনুসারেই আসল ধর্ম বিকৃত হয়ে ইয়াহুদি ধর্মের জন্ম হয়। এক পুত্র ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম তো পরবর্তীতে মিশরে গিয়ে শাসক হন।

ফিরে এলেন কেনানে

অনেক দিন হয়ে গেলো খালার বাড়ি। এবার ডাক পড়েছে নিজের বাড়ি ফিরে আসার। বিনয়ামিন ছাড়া তাঁর এগারটি পুত্র এখানে খালার বাড়িতেই জন্ম হয়। বিবি বাচ্চা সবাইকে নিয়ে ইয়াকুব রওয়ানা করলেন ফিলিস্তিন অভিমুখে। অনেক দিন দূরে থাকার পর এবার এসে পৌঁছে গেলেন প্রিয় মাতৃভূমি কেনানে। কেনানে আসার পর ছোট ছেলে বিনয়ামিনের জন্ম হয়। এতোগুলো নাতি পেয়ে দাদা দাদী দারুন খুশি। বাড়ি ফিরে ইয়াকুব আল্লাহর পথে নিজের জান মাল পুরোপুরি নিয়োজিত করেন।

নবী হলেন ইয়াকুব

ইয়াকুব ছিলেন আল্লাহর জন্যে নিবেদিতপ্রাণ। আল্লাহও তাঁকে নিজের জন্যে বাছাই করে নেন। দান করেন নবুয়্যত। ফিলিস্তিন অঞ্চলে আল্লাহর দীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার জন্যে ইবরাহিম আলাইহিস্ সালাম পুত্র ইসহাকের উপর দায়িত্ব দিয়ে যান। ইসহাক আলাইহিস্ সালাম বৃদ্ধ বয়েসে উপনীত হবার পর স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকেই পুত্র ইয়াকুব তাঁর প্রতিনিধি মনোনীত হন।

কিছুদিন পর হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামের পিতা ইসহাক আলাইহিস্ সালাম ইহকাল ত্যাগ করেন। হযরত ইয়াকুব গোটা ফিলিস্তিন অঞ্চলে আল্লাহর দীনের পতাকা উড্ডীন করেন। মানুষের দুয়ারে দুয়ারে বয়ে নিয়ে যান আল্লাহর বাণী। মানুষকে সমবেত করেন আল্লাহর দীনের পতাকাতলে।

ধৈর্য জ্ঞান ও আল্লাহ নির্ভরতার প্রতীক

প্রিয় নবী ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম ছিলেন পরম ধৈর্যশীল, ধৈর্যের পাহাড়। তাঁর প্রিয়তম পুত্র ইউসুফকে তার ভাইয়েরা যখন অন্ধকূপে ফেলে বাড়ি এসে তাঁর কাছে বলেছিল, ইউসুফকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। তখন এই চরম দুঃখ ও বেদনার এই সংবাদ শুনে তিনি কেবল এতোটুকুই বলেছিলেন:

"বরং তোমাদের নফ্‌স্ তোমাদের জন্যে একটি অসম্ভব কাজকে সম্ভব করে দিয়েছে। আমি ধৈর্য ধরবো, উত্তম ধৈর্য। তোমরা যে কথা সাজিয়েছো, তার জন্যে কেবল আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া যেতে পারে।" (সূরা ১২ ইউসুফ: আয়াত ১৮)

ছোট ছেলে বিনয়ামিনকে যখন তার ভাইয়েরা চুরির ঘটনায় মিশরে রেখে আসতে বাধ্য হয়েছিল, তখনো তিনি একই ভাষায় বলেছিলেন :

"আমি উত্তমভাবেই ধৈর্য ধারণ করলাম। মহান আল্লাহ হয়তো ওদের সবাইকেই আমার কাছে এনে দেবেন।" (সূরা ১২ ইউসুফ : আয়াত ৮৩)

"আমি আমার দুঃখ বেদনার ফরিয়াদ কেবল আল্লাহর কাছেই করবো। আল্লাহর ব্যাপারে আমি যতোটুকু জানি তোমরা তা জানোনা। হে আমার ছেলেরা, তোমরা যাও, ইউসুফ আর তার ভাই (বিনয়ামীন) কে খুঁজে দেখো। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা।" (সূরা ১২ ইউসুফ: আয়াত ৮৬-৮৭)

হযরত ইয়াকুবের ঐ দুষ্ট প্রকৃতির দশটি ছেলে যখন মিশর শাসকের পরিচয় পেলো, তখন তারা দেখলো, এতো তাদেরই সেই ভাই ইউসুফ, যাকে তারা অন্ধ কূপে ফেলে দিয়েছিল। ইউসুফ তাদের ক্ষমা করে দিলেন।

ইউসুফের জন্যে চিন্তা করতে করতে হযরত ইয়াকুবের দু'টি চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ইউসুফ তাঁর ভাইদের কাছে নিজের জামা দিয়ে বললেন, এটি নিয়ে

আমার আব্বার মুখমন্ডলে রাখো, তাতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। তারা যখন ইউসুফের সুসংবাদ আর তার জামা নিয়ে কেনানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলো, তখন হযরত ইয়াকুব বাড়ির লোকদের বললেন :

'আমি ইউসুফের সুবাস পাচ্ছি।' (সূরা ১২ ইউসুফ : আয়াত ৯৪)

অতপর সুসংবাদ বহনকারীরা যখন ইউসুফের জামাটি এনে তাঁর মুখমণ্ডলে রাখলো, সাথে সাথে তিনি দৃষ্টিশক্তি লাভ করলেন। তখন তিনি তাঁর ঘরের লোকদের বললেন :

"আমি না তোমাদের বলেছিলাম, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন সব কথা জানি, যা তোমরা জাননা।" (সূরা ১২ ইউসুফ : আয়াত ৯৬)

বৃদ্ধ বয়সে মিশর এলেন

কি সৌভাগ্য হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামের। মহান আল্লাহ তাঁর হারানো ছেলে ইউসুফকে মিশরের শাসক বানিয়েছেন। ইউসুফ তাঁর ভাইদের বলে পাঠিয়েছেন পরিবারের সবাইকে মিশর নিয়ে আসতে। হযরত ইয়াকুবের সেই অপরাধী ছেলেগুলো বাড়ি এসে বললো :

"আব্বাজান! আপনি আমাদের অপরাধ মাফির জন্যে দোয়া করুন। সত্যিই আমরা অপরাধী ছিলাম।" (সূরা ১২ ইউসুফ : আয়াত ৯৭)

হযরত ইয়াকুব বললেন : "আমি আমার প্রভুর দরবারে তোমাদের ক্ষমা করে দেবার জন্য আবেদন জানাবো। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল পরম করুণাময়।" (সূরা ১২ ইউসুফ : আয়াত ৯৮)

অতপর হযরত ইয়াকুব সপরিবারে মিশর চলে এলেন। এ সময় তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা যখন মিশরে এসে পৌঁছুলেন, তখন হযরত ইউসুফ বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে তাঁর পিতামাতাকে অভ্যর্থনা জানালেন। অত্যন্ত সম্মানের সাথে ইউসুফ তাঁর বাবা মাকে নিজের কাছে সিংহাসনে উঠিয়ে বসালেন।

মিশরে হিজরত করে আসার পর ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম আরো সতের বছর বেঁচে ছিলেন। এ হিজরতের সময় তাঁর বয়স ছিলো একশ' ত্রিশ বছর। একশ সাতচল্লিশ বছর বয়সে তিনি মিশরে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ছেলেদের অসিয়ত করে যান তাঁকে যেনো ফিলিস্তিনে নিয়ে তাঁর পিতার পাশে সমাহিত করা হয়।

পুত্রদের প্রতি উপদেশ

হযরত ইয়াকুব জনগণ এবং তাঁর পুত্রদের যে সব উপদেশ দিয়েছিলেন, কুরআনের দু'টি স্থানে তার কিছু অংশ বর্ণিত হয়েছে। যখন তাঁর দশ ছেলে ছোট ছেলে বিনয়ামিনকে নিয়ে খাদ্য শস্য আনার জন্যে মিশর যাত্রা করেছিল, তখন তিনি তাদের উপদেশ দিলেন :

"হে আমার ছেলেরা! তোমরা মিশরের রাজধানীতে একটি প্রবেশ পথে ঢুকোনা। বিভিন্ন গেইট দিয়ে প্রবেশ করো। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা থেকে আমি তোমাদের রক্ষা করতে পারবোনা। সমস্ত কর্তৃত্ব তো আল্লাহর হাতে। আমি তাঁরই উপর ভরসা করছি। সকল ভরসাকারীকে তাঁরই উপর ভরসা করতে হবে।" (সূরা ১২ ইউসুফ : আয়াত ৬৭)

আল্লাহর নবী হযরত ইয়াকুবের এই উপদেশটিতে কয়েকটি মৌলিক কথা রয়েছে। সেগুলো হলো:

১. যাবতীয় কাজে কর্মকৌশল (tactics) অবলম্বন করা উচিত।
২. কর্মকৌশল অবলম্বন করার পরই আল্লাহর ইচ্ছা ও ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা উচিত।
৩. আল্লাহকেই সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের উৎস মনে করতে হবে।
৪. সকল বিষয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত।

সূরা বাকারায় হযরত ইয়াকুবের উপদেশগুলো এভাবে উল্লেখ হয়েছে :

"ইয়াকুব তার সন্তানদের এই উপদেশ দিয়েছিল: হে আমার সন্তানেরা! আল্লাহ তোমাদের জন্যে মনোনীত করেছেন 'আদ দীন' (অর্থাৎ দীন ইসলাম) সুতরাং তোমরা মুসলিম (আল্লাহর অনুগত) থাকো।... সে মৃত্যুকালে তার সন্তানদের জিজ্ঞাসা করেছিল, আমার মৃত্যুর পর তোমরা কার ইবাদত ও দাসত্ব করবে? জবাবে তারা বলেছিল: আমরা সেই এক আল্লাহর ইবাদত ও দাসত্ব করবো, যাকে আপনি ও আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহিম, ইসমাঈল এবং ইসহাক ইলাহ হিসেবে মেনে এসেছেন। আমরা তাঁরই অনুগত মুসলিম হয়ে থাকবো।" (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ১৩২-১৩৩)

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামের এই উপদেশটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি থেকে আমরা জানতে পারি :

১. ইসলামই হলো আল্লাহর মনোনীত দীন বা জীবন ব্যবস্থা।
২. আল্লাহর মনোনীত দীনের অনুসারীরা মুসলিম।
৩. সকল নবী একই দীনের বাহক ও প্রচারক ছিলেন।
৪. আমৃত্যু আল্লাহর অনুগত বাধ্যগত হয়ে থাকাই প্রকৃত মুমিনের কাজ।
৫. মুসলিম হওয়া মানে আল্লাহর দাসত্ব করা।

আল কুরআনে উল্লেখ

কুরআন মজিদে মহান আল্লাহ তাঁর দাস ও নবী হযরত ইয়াকুবের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আল কুরআনে ষোলবার তাঁর নাম উল্লেখ হয়েছে। যেসব আয়াতে তাঁর নাম উল্লেখ হয়েছে সে আয়াতগুলো এবং সেগুলোর তফসির পড়লেই

আপনারা তাঁর সম্পর্কে আরো অনেক জানতে পারবেন। এবার জেনে নিন কোথায় কোথায় উল্লেখ হয়েছে তাঁর নাম :

সূরা আল বাকারা : ১৩২, ১৩৩, ১৩৬, ১৪০।

সূরা আলে ইমরান : ৮৪।

সূরা আন নিসা : ১৬৩।

সূরা আল আন'আম : ৮৪।

সূরা হূদ : ৭১।

সূরা ইউসুফ : ৬, ৩৮, ৬৮।

সূরা মরিয়ম : ৬, ৪৯।

সূরা আল আম্বিয়া : ৭২।

সূরা আল আনকাবুত : ২৭

সূরা সোয়াদ : ৪৫।

মহান আল্লাহ হযরত ইয়াকুব আ. সম্পর্কে বলেন:

"সে (ইয়াকুব) ছিলো, আমার দেয়া শিক্ষায় জ্ঞানবান। কিন্তু অধিকাংশ লোক প্রকৃত সত্য জানেনা।" (সূরা ১২ ইউসুফ : আয়াত ৬৮)

❖

১১

মিশর শাসক ইউসুফ

আলাইহিস্ সালাম

পূর্বাভাস

"আব্বু! আজ রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি : এগারটি তারা এবং সূর্য আর চাঁদ আমাকে সাজদা করছে।" (সূরা ১২ ইউসুফ : আয়াত ৪)

"পুত্র আমার! এ স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের বলোনা। ওরা জানতে পারলে তোমার ক্ষতি করার চিন্তা করবে। আর শয়তান তো মানুষের ঘোরতর শত্রু আছেই।" (সূরা ১২ ইউসুফ : আয়াত ৫)

ছোট্ট কচি ইউসুফ যেদিন এ স্বপ্ন দেখেন, সেদিনই তার বিজ্ঞ পিতা বুঝতে পারেন, মহান আল্লাহ তাঁর এই পুত্রটিকে নবুয়্যত দান করবেন। তাইতো তিনি সতর্ক করে দিলেন। সেই সাথে আরো বললেন :

"তোমার প্রভু তোমাকে তাঁর কাজের জন্যে নির্বাচিত করবেন, কথার মর্ম বুঝতে শেখাবেন আর তোমার প্রতি ও ইয়াকুবের পরিবারের প্রতি ঠিক তেমনি করে তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করবেন, যেমনটি করেছিলেন তোমার পিতামহ ইসহাক ও ইবরাহিমের প্রতি।" (সূরা ১২ ইউসুফ : আয়াত ৫-৬)

বংশ পরিচয়

সহীহ্ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "করিম ইবনে করিম ইবনে করিম-ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহিম।" 'করিম' মানে সম্মানিত। অর্থাৎ সম্মানিত নবী হযরত ইউসুফ মহাসম্মানিত নবী ইবরাহিম আলাইহিস্ সালামের প্রপুত্র সম্মানিত নবী ইসহাকের পৌত্র আর সম্মানিত নবী ইয়াকুবের পুত্র।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম যেমনি ছিলেন মহান নবীদের সন্তান, তেমনি ছিলেন অত্যন্ত উন্নত চরিত্র ও পবিত্র জীবনের অধিকারী এক মহান নবী। আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে বলেন : "ইন্নাহু কা-না মিন ইবাদিনাল মুখলাসিন- সে ছিলো আমার একান্ত বাছাই করা দাসদের একজন।"

হযরত ইউসুফের জন্ম হয় নানার বাড়িতে। জন্মের পর পিতার সাথে দাদুর বাড়ি চলে আসেন। দাদুর বাড়ি কোথায়? হ্যাঁ, তাঁর দাদুর বাড়ি মানে নিজের বাড়ি ছিলো ফিলিস্তিনের হিবরুন শহরে। তাঁর মায়ের নাম ছিলো রাহিল।

হযরত ইউসুফের পিতা ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম চার বিয়ে করেছিলেন। চার ঘরে তাঁরা ছিলেন মোট বার ভাই। তবে হযরত ইউসুফের সহোদর ভাই ছিলেন মাত্র একজন, বিনয়ামিন। বার ভাইদের মধ্যে বিনয়ামিন ছিলেন সর্ব কনিষ্ঠ।

ইউসুফ ছিলেন সোনার ছেলে। যেমন বাপ তেমনি ছিলেন পুত্র ইউসুফ। নবীর ছেলে ঠিক নবীর মতো জ্ঞান বুদ্ধি আর চমৎকার আচার আচরণ। ইবাদত বন্দেগিতে অগ্রগামী। আল্লাহ ভীরু, আল্লাহ পরায়ণ। বাপ দেখলেন আল্লাহর কাছে এই ছেলেই হবে তাঁর প্রকৃত উত্তরাধিকারী। বাবা এমন ছেলেকে বেশি আদর করবেন নাতো কাকে করবেন?

দশ ভাইয়ের ষড়যন্ত্র

ইউসুফ আর বিনয়ামিনকে পিতা নিজেই দেখাশুনা করতেন। তাছাড়া অত্যন্ত সুস্বভাবের অধিকারী হবার কারণে তিনি তাদের নিজের কাছে কাছে রাখতেন। অপরদিকে তাঁর অন্য দশটি ছেলে ছিলো দুষ্ট প্রকৃতির। তারা বাপের মতো হয়ে গড়ে উঠেনি। তাছাড়া অন্যায় স্বভাব চরিত্রের কারণে তারা পিতার বিশ্বাসভাজনও হতে পারেনি। তারা একজোট হয়ে একদিন ষড়যন্ত্র করলো। তারা বলাবলি করলো :

"ইউসুফ আর তার ভাই বিনয়ামিন আমাদের চেয়ে বাবার কাছে অধিক প্রিয়। অথচ আমরা দশজন একটি শক্তিশালী দল। বাবা খুব ভুল করছেন। চলো আমরা ইউসুফকে মেরে ফেলি অথবা কোথাও নিয়ে ফেলে আসি। তখন বাবার দৃষ্টি আমাদের দিকে ফিরে আসবে। এই অপরাধটা করার পর তোমরা আবার ভালো হয়ে যেয়ো।" (সূরা ১২ ইউসুফ : আয়াত ৮-৯)

যে কথা সে কাজ। তারা তাদের পিতার কাছে এসে বললো : বাবা! আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদের উপর আস্থা রাখেননা কেন? আমরা তো সব সময় তার ভালই চাই। আগামীকাল ওকে আমাদের সাথে দিন! আমাদের সাথে গিয়ে ফলমূল খাবে আর দৌড়াদৌড়ি করে মন চাংগা করবে। আমরা তার পূর্ণ হিফাযত করবো।

বাবা বললেন : তোমরা তাকে নিয়ে গেলে আমি চিন্তাগ্রস্ত থাকবো। আমার শংকা হয়, তোমরা ওর প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়বে আর এ ফাঁকে ওকে বাঘে খেয়ে ফেলবে।

দশ ভাই বললো : আমরা এতোগুলো লোক থাকতে ওকে বাঘে খাবে? তবে তো আমরা বড় অকর্মণ্য বলে প্রমাণিত হবো।

তারপর কি হলো? ইনিয়ে বিনিয়ে বাবাকে এটা ওটা বুঝিয়ে ওরা পরদিন ইউসুফকে বনের দিকে নিয়ে গেলো। আল্লাহভক্ত এই ছেলেটিকে ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে দারুণ চিন্তার মধ্যে সময় কাটাতে থাকেন ইয়াকুব।

কূপে ফেলে দিলো ইউসুফকে

সে এলাকা দিয়ে ছিলো একটি আন্তর্জাতিক পথ। এ পথে মিশর থেকে সিরিয়া আর সিরিয়া থেকে মিশরে বাণিজ্য কাফেলা যাতায়াত করতো। ব্যবসায়ীদের পানি পানের সুবিধার্থে লোকেরা পথিমধ্যে এখানে সেখানে পানির কূপ খনন করে রাখতো। ব্যবসায়ীরা কূপের কাছে বিশ্রাম নিতে আর বালতি ফেলে কূপ থেকে পানি উঠিয়ে পান করতো।

ইউসুফের দুরাচার নিষ্ঠুর ভাইয়েরা তাকে নিয়ে গিয়ে এমনি একটি কূপে ফেলে দিলো। আল্লাহ ছাড়া সেখানে ইউসুফকে সাহায্য করবার আর কেউই ছিলনা। ইউসুফ সকল ক্ষমতার মালিক মহান আল্লাহর উপর ভরসা করলেন। তাঁর মহান প্রভু আল্লাহ অহির মাধ্যমে তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং ভবিষ্যতের সুসংবাদ জানিয়ে দিলেন।

বাপের কাছে বানোয়াট কাহিনী

এবার দশ ভাই ফন্দি আঁটলো বাপের কাছে এসে কী বলবে? যারা মিথ্যা বলতে পারে, তাদের জন্য কোনো একটা ফন্দি এঁটে নেয়া তো কঠিন নয়। ইউসুফকে কূপে ফেলে দেয়ার সময় তারা তার জামাটা রেখে দিয়েছিল। একটা পশু জবাই করে এবার ইউসুফের জামায় সেটার রক্ত মেখে নিলো।

সন্ধ্যার পর ভান করে কাঁদতে কাঁদতে দশ ভাই বাড়ি ফিরে এলো। ইউসুফের রক্তমাখা জামা বাপের সামনে রেখে দিয়ে বললো : "বাবা, আমরা দশভাই দৌড় প্রতিযোগিতা করছিলাম। এদিকে ইউসুফকে বসিয়ে রেখেছিলাম আমাদের জিনিসপত্রের কাছে। হঠাৎ এক নেকড়ে এসে ওকে খেয়ে ফেলে। আমরা সত্য কথা বলছি বাবা! জানি, আমরা যতই সত্য বলিনা কেন আপনি আমাদের কথা বিশ্বাস করবেননা।" (সূরা ১২ ইউসুফ : আয়াত ১৭)

দেখলেন তো মিথ্যাবাদীদের সত্য বলার ধরন! তাদের পিতা মহান নবী হযরত ইয়াকুব এতো বড় ঘটনা ঘটে যাবার পরও কেবল আল্লাহর সাহায্য চেয়ে ধৈর্য ধারণ করলেন।

রাখে আল্লাহ মারে কে?

এদিকে ইউসুফের কী হলো? 'ইউসুফ কি বেঁচে আছেন, নাকি কূপে ডুবে মরে গেছেন? আল্লাহ যাকে বাঁচান তাকে মারার শক্তি কার আছে? আল্লাহ ইউসুফকে কূপের মধ্যে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করেন। ইউসুফ সুস্থ শরীরে বেঁচে আছেন। ইতোমধ্যে সেখানে একটি বাণিজ্য কাফেলা এসে অবতরণ করলো। তারা তাদের একজনকে কূপ থেকে পানি উঠাতে পাঠালো। সে যখন পানির জন্যে বালতি ফেললো, ইউসুফ তার বালতি ধরে উঠে এলেন। লোকটি চিৎকার করে উঠলো : কী চমৎকার, এ যে এক বালক! তারা তাকে নিয়ে গিয়ে পণ্যদ্রব্য হিসেবে বিক্রি করে দিলো। বিক্রি করলো মাত্র সামান্য কয়েক দিরহামে।

মিশরে ইউসুফ

মিশরের 'আযীয মিশর' উপাধিধারী এক বড় মন্ত্রী ইউসুফকে বণিকদের কাছ থেকে কিনে নেন। তিনি ইউসুফকে বাড়ি নিয়ে তার স্ত্রীকে বললেন : 'একটি ছেলে কিনে এনেছি। ওকে যত্ন করে রেখো। ও আমাদের উপকারে আসতে পারে, আর নয়তো তাকে আমরা পুত্রই বানিয়ে নেবো।'

এবার দেখুন আল্লাহর ক্ষমতা। তিনি কিভাবে ইউসুফকে বাঁচিয়ে নিয়ে এলেন সেকালের শক্তিশালী রাজ্য মিশরের ক্ষমতাবানদের ঘরে। আল্লাহ বলেন : "এভাবে আমি ইউসুফের জন্যে সেদেশে প্রতিষ্ঠিত হবার পথ বের করে দিলাম। সেই সাথে আমি তাকে সবকিছুর মর্ম বুঝার শিক্ষাও দান করলাম।"

এ ঘরে ইউসুফ রাজপুত্রের সমাদরে বড় হতে থাকলেন। এখানেই যখন তিনি পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত হলেন, তখন আল্লাহ তাঁকে নবুয়্যত দান করেন। তাঁকে নবুয়্যত দান করে আল্লাহ বলেন, "আমি নেক লোকদের এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি।" (সূরা ১২ ইউসুফ : আয়াত ২২)

জেলে যাবো তবু পাপ করবোনা

তখনকার মিশরের লোকদের নৈতিক চরিত্র ছিলো খুবই খারাপ। তাদের নারী পুরুষ সবাই নির্লজ্জের মতো পাপ কাজ করে বেড়াতো। কেউ পাপ কাজ করলে অন্যরা সেটাকে খারাপ মনে করতোনা। ইউসুফ যেমন ছিলেন জ্ঞানী, গুণী, বুদ্ধিমান, ঠিক তেমনি ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর, সুশ্রী এক বলিষ্ঠ যুবক। সেই 'আযীয মিশরের' স্ত্রী এবং অন্যান্য শহুরে মহিলারা ইউসুফকে চারিদিক থেকে পাপকাজে নামাবার জন্যে ফুসলাতে থাকে।

আযীয মিশরের স্ত্রী জুলেখা একপক্ষীয়ভাবে ইউসুফের সাথে পাপ কাজে লিপ্ত হবার জন্যে পাগল হয়ে যায়। একদিন সে ঘরের সব দরজা বন্ধ করে দিয়ে ইউসুফকে বলে: 'আসো'

ইউসুফ বলেন: "এমন কর্ম থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আমার প্রভু আমাকে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। যারা পাপ কাজ করে তারা কখনো সাফল্য অর্জন করেনা।" (সূরা ১২ ইউসুফ : আয়াত ২৩)

একথা বলে ইউসুফ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে দরজার দিকে দৌড়ালেন। মহিলাটিও তাঁকে ধরার জন্যে তাঁর পেছনে পেছনে দৌড়ালো। মহিলাটি পেছন দিক থেকে ইউসুফের জামা টেনে ধরে। ইউসুফ দৌড়াতে থাকেন। ফলে টানাটানিতে তাঁর জামা ছিঁড়ে যায়।

ইউসুফ দরজা পর্যন্ত চলে আসেন এবং দরজা খুলে ফেলেন। দরজা খুলতেই তারা দু'জনে মহিলার স্বামী আযীয মিশরকে দরজার সামনে দাঁড়ানো দেখতে পায়। পাপিষ্ঠ মহিলাটি হন্তদন্ত হয়ে ইউসুফের প্রতি ইংগিত করে তার স্বামীকে

বলে উঠে: 'যে আপনার স্ত্রীর সাথে বদকাজ করতে চাইছে, তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করুন অথবা কঠিন শাস্তি দিন।'

ইউসুফ বললেন: আমি নই, তিনিই আমাকে ফাঁসাতে চেষ্টা করছেন।

দুই ধরনের কথার প্রেক্ষিতে আযীয মিশর বেকায়দায় পড়লেন। এমতাবস্থায় মহিলার ঘরেরই একজন সাক্ষী দিয়ে বললো: 'দেখুন, ইউসুফের জামা যদি সামনের দিকে ছেঁড়া হয়ে থাকে, তাহলে ইউসুফ মিথ্যাবাদী এবং আপনার স্ত্রী সত্যবাদী। আর ইউসুফের জামা যদি পেছনের দিকে ছেঁড়া হয়ে থাকে তবে আপনার স্ত্রী মিথ্যাবাদী এবং ইউসুফ সত্যবাদী।

তার স্বামী যখন দেখলেন ইউসুফের জামা পেছনের দিকে ছেঁড়া, তখন তিনি তার স্ত্রীকে বললেন: "এটা তোমারই চক্রান্ত। নারীদের ছলনা চক্রান্ত খুবই শক্তিশালী। হে ইউসুফ! তুমি বিষয়টি উপেক্ষা করো। হে আমার স্ত্রী! তুমি ক্ষমা চাও, কারণ তুমিই দোষী।"

আযীয মিশরের স্ত্রীর এই ছিনালির খবর ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। কানাঘুষা চলতে থাকে উপরের তলার মহিলাদের মাঝে। তাদের কথা হলো: ছিনালি করবি তো কর উপরের তলার কোনো পুরুষের সাথে, ক্রীতদাসের সাথে করতে গেলি ক্যান্?

তাদের এসব কথাবার্তার খবর এসে পৌঁছে যায় আযীয মিশরের স্ত্রী জুলেখার কানেও। তার কথা হলো: ওরা আমার কাংখিত যুবকটি সম্পর্কে না জেনেই আমাকে দোষারোপ করছে।

ফলে জুলেখা তাদের ভুল ধারণা দূর করার সিদ্ধান্ত নেয়। সে উপর তলার মহিলাদের জন্যে আয়োজন করে এক ভোজ সভার। তাদেরকে নিমন্ত্রণ জানায় নির্দিষ্ট দিন। খাবার টেবিলে খাবার সাজিয়ে রাখে। কেটে কেটে খাবার জন্যে প্রত্যেকের জন্যে সরবরাহ করে একটি করে ছুরি। সবাই ছুরি দিয়ে ফল কেটে কেটে খাচ্ছে, এমনি সময় জুলেখা ইউসুফকে তাদের সামনে আসতে আদেশ করে। ইউসুফ ডাইনিং হলে ঢুকতেই সবগুলো নারী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ইউসুফের দিকে।

তারা আত্মভোলা হয়ে কেটে ফেলে নিজেদের হাত। তারা স্বগত স্বতস্ফূর্ত বলে উঠে: 'আল্লাহর কসম, এতো মানুষ নয়, সাক্ষাত এক সম্মানিত ফেরেশতা।'

এবার জুলেখা বলে উঠে, দ্যাখো, তোমরা না জেনে এমন যুবকের ব্যাপারেই আমাকে তিরস্কার করছিলে। আমি অবশ্যি তাকে নিবেদন করেছি। কিন্তু সে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। এখন থেকে সে যদি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাহলে অবশ্যি আমি তাকে হীন ও লাঞ্ছিত করে কারাগারে নিক্ষেপ করবো।

আল্লাহর একান্ত অনুগত দাস ইউসুফ তো কিছুতেই পাপ কাজে নিমজ্জিত হতে

পারেননা। এখন তাদের সবার জ্বালাতনে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেন। উপর তলার সব মহিলার দৃষ্টি এখন ইউসুফের দিকে। নাগিনীদের চতুর্মুখী ছোবলের মুখে ইউসুফ এক মুহূর্তের জন্যেও তাঁর মহামনিব আল্লাহর অসন্তুষ্টির পথে পা বাড়াননি। ইউসুফ আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন:

'ওগো আমার প্রভু, এরা আমাকে যে কাজের দিকে ডাকছে তার চাইতে কারাগারই আমার কাছে অধিকতর প্রিয়। আমার প্রভু, এদের চক্রান্ত থেকে তুমি যদি আমাকে না বাঁচাও, তাহলে তো আমি এদের ফাঁদে আঁটকে যাবো। (সূরা ১২ ইউসুফ : আয়াত ৩৩)

কারাগারে ইউসুফ

আল্লাহ ইউসুফের ফরিয়াদ কবুল করলেন। নারীদের চক্রান্ত থেকে তাকে রক্ষা করলেন। যাদের নারীরা ইউসুফের জন্যে উন্মাদ হয়ে পড়েছিল, তারা একটি মেয়াদের জন্যে ইউসুফকে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়। অথচ তারা জানতো ইউসুফ সম্পূর্ণ নির্দোষ। এভাবে ইউসুফ নৈতিক পরীক্ষায় মহাবীরের বেশে বিজয়ী হলেন। আর মিশরের অভিজাত মহল তাঁর চারিত্রিক আদর্শের কাছে চরমভাবে পরাজিত হলো।

দুই কয়েদীর স্বপ্ন এবং ইউসুফের দাওয়াতি কাজ

ইউসুফ জেলে এসে কৌশলের সাথে আল্লাহর দীন প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর জ্ঞান, বুদ্ধি, উন্নত চরিত্র আর দাওয়াতি কাজে আকৃষ্ট হয়ে কয়েদীরা তাঁর ভক্ত হয়ে পড়ে। এক রাত্রে দু'জন কয়েদী স্বপ্ন দেখলো। তারা ভাবলো, ইউসুফ ছাড়া আর কেউ তাদের স্বপ্নের মর্ম বলে দিতে পারবেনা। ছুটে এলো তারা ইউসুফের কাছে।

একজন বললো : 'আমি স্বপ্ন দেখেছি, আমি মদ তৈরি করছি'।

অপরজন বললো : 'আমি স্বপ্ন দেখেছি, আমার মাথায় রুটি রাখা আছে আর পাখি তা থেকে খাচ্ছে।'

এরা দু'জন ছিলো মিশর রাজের কর্মচারী। একজন ছিলো রাজার মদ প্রস্তুতকারক আর অপরজন ছিলো রুটি প্রস্তুতকারক।

ইউসুফ ওদের স্বপ্নের কথা শুনে বললেন : তোমাদের খাবার আসার আগেই আমি তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দেবো। এই ফাঁকে তোমরা আমার কিছু কথা শুনো। আমি মহান প্রভু আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে তোমাদের বলছি :

"আল্লাহর সাথে কাউকেও শরিক করা উচিত নয়। এটা আমাদের এবং গোটা মানবজাতির উপর আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহ, তিনি আমাদেরকে তাঁর ছাড়া আর কারো দাসত্ব করার জন্য সৃষ্টি করেননি। কিন্তু অধিকাংশ লোক তাঁর শোকর আদায় করেনা।"

"হে আমার কারাসাথিরা! চিন্তা করে দেখো, ভিন্ন ভিন্ন বহু খোদা ভালো, নাকি একজন সর্বশক্তিমান আল্লাহ ভালো? তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ইবাদত করছো, তারা তো মাত্র কতগুলো নাম। এ নামগুলো তো তোমরাই রেখেছো।" "আসলে সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ। কর্তৃত্ব শুধুমাত্র তাঁর। তিনি হুকুম দিয়েছেন তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো দাসত্ব করোনা। এটাই হলো সঠিক সরল জীবন পদ্ধতি। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানেনা।" (সূরা ১২ ইউসুফ: আয়াত ৩৮-৪০)

ব্যাস্ একটি মোক্ষম সময় বেছে নিলেন হযরত ইউসুফ ওদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেবার জন্যে। এটি মোক্ষম সময় এ জন্যে ছিলো যে হযরত ইউসুফ দেখলেন :

১. তারা তাঁর অত্যন্ত ভক্ত অনুরক্ত হয়েছে এবং

২. এ সময় তারা মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা শুনবে।

হযরত ইউসুফ তাদেরকে কিসের দাওয়াত দিলেন? তিনি তাদের যে দাওয়াত দেন তার মৌলিক কথা হলো :

১. আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরিক নেই।
২. আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর দাসত্ব করার জন্যে। অন্য কারো দাসত্ব করার জন্যে নয়।
৩. আল্লাহ সর্বজয়ী, সর্বশক্তিমান।
৪. সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহর।
৫. তিনি মানুষকে কেবল তাঁর হুকুম মেনে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন।
৬. এক আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক জীবন যাপন করাই সত্য সঠিক ও বাস্তব দীন বা জীবন পদ্ধতি।

এমনি চমৎকারভাবে দাওয়াত পেশ করার পর এবার তিনি তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিলেন। বললেন :

"তোমাদের প্রথমজন তার মনিবকে মদ পান করাবার চাকুরিতে ফিরে যাবে। আর দ্বিতীয়জনকে শূলে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে এবং পাখি তার মাথা ঠুকে ঠুকে মগজ খাবে। এই হলো তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা।" (সূরা ইউসুফ : আয়াত ৪১)

সত্যি তাই হলো। একজন মুক্তি পেলো এবং নিজের পূর্বের চাকুরিতে ফিরে গেলো। অপরজনকে শূলে করে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় এবং পাখি তার মাথায় বসে মগজ খুঁটে খুঁটে খায়।

স্বপ্ন দেখেন রাজা

কারাগারে হযরত ইউসুফের আরো কয়েক বছর কেটে যায়। তিনি সেখানেই দীনের কাজ করতে থাকেন। এরি মধ্যে মিশরের রাজা এক স্বপ্ন দেখেন। তিনি স্বপ্ন দেখেন :

"সাতটি মোটা তাজা গাভীকে সাতটি শুকনো হালকা পাতলা গাভী খেয়ে ফেলছে। আরো দেখেন সাতটি সবুজ শস্যের ছড়া আর সাতটি শুকনো ছড়া।" রাজা তার পারিষদবর্গকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে বললেন। কিন্তু তারা কেউই এর ব্যাখ্যা করতে পারলনা।

এ সময় হঠাৎ ইউসুফের সেই কারা সাথিটির মনে পড়লো ইউসুফের কথা। সে বললো, আমাকে ইউসুফের কাছে পাঠিয়ে দিন, আমি স্বপ্নের ব্যাখ্যা এনে দিচ্ছি। তাই করা হলো। সে ছুটে এলো কারাগারে। ইউসুফের কাছে এসে বললো : "হে মহাসত্যবাদী ইউসুফ! আমাদের রাজা এই স্বপ্নে দেখেছেন। আপনি এর ব্যাখ্যা বলে দিন।"

ইউসুফ রাজার স্বপ্নের মর্ম বলে দিলেন। তিনি বললেন, "তোমরা সাত বছর লাগাতার চাষাবাদ করবে। এ সময় যে ফসল কাটবে, তা থেকে আহারের পরিমাণ ছড়া (শীষ) থেকে বের করবে, বাকিটা ছড়া সমেত রেখে দেবে। তারপর তোমাদের দেশে আসবে দুর্ভিক্ষের সাত বছর। এ সময় খুব কমই ফসলাদি হবে। এ সময় আগের সাত বছরের সংরক্ষিত ফসল খাবে। অতপর একটি বছর আসবে, তখন প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং প্রচুর ফসল উঠবে।" (সূরা ১২ ইউসুফ : আয়াত ৪৭-৪৯)

লোকটি স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা নিয়ে গিয়ে রাজাকে বললো। এ ব্যাখ্যা রাজার মনের মতো হলো। তিনি ব্যাখ্যাটি দারুণ পছন্দ করলেন আর কারাগারে লোক পাঠিয়ে দিলেন ইউসুফকে নিয়ে আসার জন্যে।

রাজার দূত যখন ইউসুফকে কারাগার থেকে বের করে নিতে এলো, ইউসুফ তাকে বললেন, ফিরে যাও। রাজাকে গিয়ে বলো, আগে সেই মহিলাদের বিচার করতে, যারা চক্রান্ত করে আমাকে কারাগারে পাঠিয়েছে।

রাজা সেই মহিলাদের ডেকে পাঠালেন এবং তাদের কাছে কৈফিয়ত চাইলেন। তারা বললো : "আল্লাহর কসম, ইউসুফ কোনো অন্যায় করেনি, কোনো পাপ করেনি। আমরাই তাকে ফাঁসাতে চেষ্টা করেছিলাম। সে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, নির্দোষ এবং সে অত্যন্ত সৎ ও সত্যবাদী।"

এসত্য উদঘাটিত হবার পর ইউসুফ বললেন, আমি তো চেয়েছিলাম, এ সত্য প্রকাশিত হোক আর আযীয জানতে পারুক, আমি বিশ্বাস ঘাতকতা করিনি। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

ইউসুফের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ

রাজা নির্দেশ দিলেন যাও, এবার ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাঁকে একান্তভাবে নিজের জন্যে নিয়োগ করবো। ইউসুফ জেল থেকে বেরিয়ে এলেন। রাজা যখন তার সাথে কথা বললেন, তিনি তার অগাধ জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা

আর বলিষ্ঠ নৈতিক চরিত্র দেখে অভিভূত হলেন। তিনি বললেন : আপনি এখন আমাদের এখানে পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। আপনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত।

ইউসুফ বললেন, আপনি দেশের অর্থ ভাণ্ডারের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করুন। আমি তা যথাযথ সংরক্ষণ করবো। এ ব্যাপারে আমি জ্ঞান রাখি। রাজা তাই করলেন। আর এভাবেই মহান আল্লাহ ইউসুফের জন্যে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের পথ পরিষ্কার করে দিলেন। তিনি সৎলোকদের প্রতিদান কখনো বিনষ্ট করেননা। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে পৃথিবীতেও তাদের পুরস্কৃত করেন আর পরকালের প্রতিদান তো রয়েছেই। শেষ পর্যন্ত রাজা ইউসুফের সততা, দক্ষতা ও আন্তরিক নিষ্ঠার জন্যে গোটা দেশের শাসনভারই ছেড়ে দেন ইউসুফের উপর এবং নিজে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

ইউসুফের ভাইয়েরা এলো মিশরে

হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাবার পর সাত বছর খুব ফসল হয়। তিনি সুন্দরভাবে ফসল সংরক্ষণ করেন। এরপর আসে পরবর্তী দুর্ভিক্ষের সাত বছর। এ সময় সংরক্ষিত ফসল ভাণ্ডার দিয়ে দুর্ভিক্ষের মোকাবেলা করেন। ফিলিস্তিনের দিকেও দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। মিশরে খাদ্য মজুদ থাকার খবর শুনে বিভিন্ন দেশের লোকেরা খাদ্য শস্যের জন্যে ছুটে আসে মিশরে। ইউসুফের ভাইয়েরাও খাদ্য কেনার জন্যে ছুটে আসে মিশরে।

হ্যাঁ, ইউসুফের সেই দশভাই মিশরে এলো। তারা অর্থকড়ি নিয়ে এসেছে খাদ্য শস্য কেনার জন্যে। তারা এসে অর্থমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করতে চাইলো। ফলে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো ইউসুফের কাছে। তারা ইউসুফকে মোটেও চিনতে পারেনি। কিন্তু ইউসুফ তাদের চিনে ফেললেন। তাদের সাথে কথাবার্তা বললেন। খোঁজ খবর নিলেন। বললেন, একটি ভাইকে আবার বাড়িতে রেখে এলেন কেন? আবার আসার সময় তাকেও নিয়ে আসবেন।

ছোট্ট ভাইটিকে অর্থাৎ বিনয়ামিনকে দেখার জন্যে ইউসুফের মন ছটফট করছিল। তিনি তাদের বিদায় দেবার সময় বলে দিলেন, দেখুন আমি খুবই অতিথি পরায়ণ। দেখছেন না আমি কী রকম পাত্র ভরে দিচ্ছি? আপনাদের ছোট ভাইটাকেও নিয়ে আসবেন। ওকে নিয়ে না এলে আপনাদের আর এখানে আসার দরকার নেই। আর আপনাদের খাদ্য শস্য দেয়া হবেনা।

ইউসুফ এদিকে তাঁর কর্মচারীদের গোপনে বলে দিলেন, ওরা খাদ্য শস্যের বিনিময়ে যে অর্থ দিয়েছে সেগুলো চুপিসারে, তাদের শস্যের বস্তায় ঢুকিয়ে ফিরিয়ে দাও।

বাড়ি ফিরে এসে তারা তাদের পিতাকে বললো, আব্বা, বিনয়ামিনকে নিয়ে না গেলে এরপর আমাদের আর খাদ্যশস্য দেবেনা। এবার ওকে আমাদের সাথে

দিন। আমরা অবশ্যি তার হিফাযত করবো। বস্তা খোলার পর খাদ্যশস্যের সাথে অর্থকড়ি ফিরিয়ে দিয়েছে দেখে তারা খুশিতে বাগবাগ হয়ে উঠলো। তারা বললো : আব্বাজান, আমাদের আর কী চাই! এই দেখুন, আমাদের অর্থকড়ি ফিরিয়ে দিয়েছে। আমরা আবার যাবো। আমাদের ভাইয়ের হিফাযত করবো।

তাদের পিতা হযরত ইয়াকুব বললেন, তোমাদের তো বিশ্বাস করা যায় না। আল্লাহই সত্যিকার হিফাযতকারী। আমি ততোক্ষণ পর্যন্ত ওকে তোমাদের সাথে দেবনা, যতোক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে ওকে ফিরিয়ে আনবার অংগীকার করবে। সুতরাং তারা বিনয়ামিনকে ফিরিয়ে আনবে বলে আল্লাহর নামে শপথ করলো। এবার হযরত ইয়াকুব ওকে তাদের সাথে দিলেন। আর তাদের বলে দিলেন, তারা যেনো বিভিন্ন পথে মিশরে প্রবেশ করেন। একত্রে একই পথে যেনো না ঢুকে।

এরপর কি হলো? এরপর তারা মিশরে এলো। ইউসুফের কার্যালয়ে প্রবেশ করলো। ইউসুফ বিনয়ামিনকে একান্তে ডেকে নিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন। ওহ! তখন দুই সহোদর ভাইয়ের কী যে আনন্দ! কিন্তু দশ ভাইকে তারা এটা বুঝতে দেননি। তাদের মালপত্র প্রস্তুত করে দেয়া হলো। এ সময় ইউসুফ নিজ ভাইয়ের মালের সাথে একটি সোনার পেয়ালা ঢুকিয়ে দিলেন। তারা মালপত্র নিয়ে রওয়ানা করলো।

কিছুদূর যেতে না যেতেই পিছে থেকে ডাক পড়লো। তাদের বলা হলো, তোমরা চোর। তারা জিজ্ঞেস করলো :

কেন, আপনাদের কি হারিয়েছে?

কর্মচারীরা বললো : বাদশাহর পানপাত্র হারিয়েছে। তারা বললো : আল্লাহর কসম আমরা অনাসৃষ্টি করতে আসিনি। আর আমরা চোরও নই।

'তোমাদের কথা মিথ্যা প্রমাণিত হলে চোরের কি শাস্তি হবে?'

'যার কাছে পেয়ালা পাওয়া যাবে আপনারা তাকে রেখে দেবেন। আমাদের ওখানে যালিমদের শাস্তির বিধান এটাই।'

এবার তল্লাশি শুরু হলো। প্রথমেই দশ ভাইয়ের মাল তল্লাশি করা হলো। সবশেষে বিনয়ামিনের মালপত্র থেকে উদ্ধার করা হয় পেয়ালা।

দশভাই বললো : "এ যদি চুরি করে থাকে তবে অবাক হবার কিছু নেই। ইতোপূর্বে তার সহোদর ইউসুফও চুরি করেছিল।"

ইউসুফ তাদের এই অপবাদ নীরবে হজম করেন। সত্য তাদের কাছে এখনো প্রকাশ করলেননা। মনে মনে বললেন, তোমরা বড় বদ। আল্লাহ প্রকৃত সত্য অবগত আছেন।

তারা আবদার করলো, বিনয়ামিন ধরা পড়লেও তার পরিবর্তে তাদের কোনো একজনকে রেখে দিতে। ইউসুফ তা অন্যায় বলে অস্বীকার করলেন। ফলে তারা নিরাশ হয়ে বাইরে গিয়ে ভাবতে থাকে এখন কী করবে?

তাদের মধ্যে যে ভাইটি সবচে বড়, সে বললো : তোমাদের কি মনে নেই তোমরা তোমাদের পিতার সাথে কি অংগীকার করে এসেছো? তোমরা বিনয়ামিনকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বলে আল্লাহর নামে অংগীকার করে আসোনি? ইতোপূর্বে ইউসুফের ব্যাপারেও তোমরা বাড়াবাড়ি করেছো, তাও তোমাদের মনে আছে। এখন আমি এখানেই থেকে যাবো। আল্লাহর কোনো ফায়সালা না হলে অথবা বাবা অনুমতি না দিলে আমি এখান থেকে ফিরে যাবোনা। তোমরা বাবার কাছে ফিরে গিয়ে সব ঘটনা খুলে বলোগে।

ওরা বাড়ি ফিরে এসে যখন তাদের পিতা হযরত ইয়াকুবের কাছে ঘটনা বললো, তখন তিনি বললেন : আমি সবর করবো। মহান আল্লাহ ওদের দুই ভাইকেই আমার কাছে ফিরিয়ে আনতে পারেন। তিনি তো সবকিছু জানেন।

এদিকে দুঃখ বেদনায় হযরত ইয়াকুব জর্জরিত হয়ে পড়েন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর চোখ অন্ধ হয়ে যায়। তিনি ছেলেদের বলেন : যাও, ইউসুফ আর তার ভাইকে অনুসন্ধান করো। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা।

ইউসুফের সন্ধান লাভ

তারা আবার ফিরে এলো মিশরে। ইউসুফের সাথে দেখা করে বললো : "হে আযীয! আমরা এবং আমাদের পরিবার পরিজন কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছি। সামান্য পুঁজি নিয়ে এসেছি। আপনি দয়া করে পুরো মাত্রায় খাদ্যশস্য দিন। আমাদের দান করুন। আল্লাহ দানকারীদের অবশ্যি প্রতিদান দিয়ে থাকেন।"

ওদের বক্তব্য শুনে ইউসুফ বললেন : "তোমাদের কি মনে নেই তোমরা যখন অজ্ঞ ছিলে তখন ইউসুফ আর তার ভাইয়ের সাথে কি ব্যবহারটা করেছিলে?"

একথা শুনে তারা আঁতকে উঠলো। বললো : "হায়, তুমিই কি ইউসুফ?"

- "হ্যাঁ, আমিই ইউসুফ আর এই বিনয়ামিন আমার ভাই। মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যারাই আল্লাহকে ভয় করবে আর সবর অবলম্বন করবে, আল্লাহ সেই সৎ লোকদের কর্মফল নষ্ট করবেন না।"

ওরা দশভাই বললো : আল্লাহর কসম, আল্লাহ তোমাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। সত্যিই আমরা বড় অপরাধ করেছি!

ইউসুফ বললেন : "আজ আর তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি সব দয়ালুর বড় দয়ালু।"

এরপর ইউসুফ তার গায়ের জামা তাদের হাতে দিয়ে বললেন, এ জামাটি নিয়ে বাড়ি চলে যাও। এটি আমার আব্বাজানের মুখমণ্ডলে রেখো। এতে তিনি

দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আর আমাদের আব্বা আম্মাসহ তোমাদের সমস্ত পরিবার পরিজনকে মিশরে নিয়ে এসো।

দশভাই এবার মনের সুখে ফিলিস্তিন অভিমুখে যাত্রা করলো। এদিকে এরা যাত্রা করেছে আর ওদিকে হযরত ইয়াকুব বাড়ির লোকদের বললেন : আমি ইউসুফের সুবাস পাচ্ছি, তোমরা আমাকে বুড়ো বয়েসের বুদ্ধিভ্রষ্ট বলোনা।

ইতোমধ্যে ওরা ইউসুফের সুসংবাদ নিয়ে বাড়ি পৌঁছে গেলো। ঐ জামাটি হযরত ইয়াকুবের মুখমণ্ডলে স্পর্শ করাবার সাথে সাথে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। আনন্দে খুশিতে হযরত ইয়াকুব আল্লাহর শোকর আদায় করলেন। ওরা দশভাই বাবার কাছে ক্ষমা চাইলো। বাবাকে ওদের জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে বললো। তিনি তাদের জন্যে দোয়া করলেন।

ইয়াকুব পরিবারের হিজরত

হযরত ইয়াকুব সবাইকে হিজরতের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিলেন। সহসাই বিরাট পরিবার পরিজনের বহর নিয়ে তারা মিশরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। জানা যায়, এসময় হযরত ইয়াকুবের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিলো ৬৭ জন।

তারা যেদিন মিশরের রাজধানীর কাছে পৌঁছুলেন, সেদিন ছিলো মিশরে একটি উৎসবের দিন। উৎসব উপলক্ষে বিপুলসংখ্যক লোক এক জায়গায় একত্র হয়। হযরত ইউসুফ সেনাবাহিনী ও জনগণের বিরাট এক শোভাযাত্রাসহ তাঁর পিতামাতাকে অভ্যর্থনা জানান। ইউসুফের বাবা মা ও পরিবারবর্গ মিশরে আগমনের খবর শুনে জনগণের মধ্যে খুশির জোয়ার বয়ে আসে। স্বয়ং মিশরের রাজা ইউসুফকে নির্দেশ দেন, তাঁদের বড় আকারে সংবর্ধনা জানাবার।

বাবা মা ও আপনজনদের মিশর আগমনে আজ ইউসুফের মনে যে কী খুশি আর কতো যে আনন্দ, তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। ইউসুফ তাদের মহাসমারোহে এগিয়ে আনেন। বাবা মাকে নিজের আসনে বসান। তারা সবাই ইউসুফের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

সত্য হলো ইউসুফের স্বপ্ন

ভাইয়েরা সবাই ইউসুফের কাছে নত হলো। তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলো। বাবা মা ইউসুফকে পেয়ে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। এভাবেই ইউসুফ ছোট্টবেলায় যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা সত্যে পরিণত হলো। ইউসুফ বললেন :

"আব্বাজান, আমি যে স্বপ্ন দেখেছিলাম, এ হলো সেই স্বপ্নের মর্ম। আমার প্রভু, আমার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছেন। তিনি আমার প্রতি বিরাট অনুগ্রহ দেখিয়ে আমাকে কারাগার থেকে বের করে এনেছেন। আপনাদের মরু অঞ্চল থেকে বের করে এনে আমার সাথে মিলিত করেছেন। অথচ শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। আমার প্রভু অতি সূক্ষ্ম

কৌশলে তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী সুকৌশলী।" (সূরা ১২ ইউসুফ : আয়াত ১০০)

আল্লাহর শোকর আদায়

ইউসুফের আর কি চাই? মহান আল্লাহ তাঁকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন। কারাগার থেকে মুক্ত করেছেন। নবুয়্যত দান করেছেন। রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছেন। বিপুল জনপ্রিয়তা দান করেছেন। অবশেষে বাবা মা আর সকল আত্মীয় স্বজনকেও এনে তাঁর সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। মহান আল্লাহর কত যে অনুগ্রহ তাঁর উপর। তিনি অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে শোকর আদায় করেন তাঁর মহান প্রভু আল্লাহ তা'আলার দরবারে :

"আমার প্রভু! তুমি আমাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছো। কথার মর্ম বুঝতে শিখিয়েছো। হে আসমান জমিনের স্রষ্টা! দুনিয়া ও আখিরাতে তুমিই আমার অভিভাবক। তোমার অনুগত অবস্থায় আমাকে মৃত্যু দিও আর নেককার লোকদের সাথে মিলিত করো।" (সূরা ১২ ইউসুফ : আয়াত ১০১)

হযরত ইউসুফের কালের মিশর

বিভিন্ন ঐতিহাসিক গবেষণা থেকে জানা যায়, হযরত ইউসুফ যখন মিশর যান, তখন মিশরে পঞ্চদশতম রাজ পরিবারের শাসন চলছিল। এ বংশের রাজাদের বলা হতো 'রাখাল রাজা' (Hyksos kings)। এরা মিশরীয় ছিলনা। তারা ফিলিস্তিন ও সিরিয়া অঞ্চল থেকে গিয়ে মিশরের রাজত্ব দখল করে। এ বংশের রাজাদের 'আমালিক' রাজাও বলা হয়। এরা বিদেশি হবার কারণে হযরত ইউসুফকে তারা সাদরে গ্রহণ করেছিল। ইয়াকুব আ.-এর বংশধর বনি ইসরাঈলকে দেশের সব চাইতে উর্বর এলাকায় বসতি স্থাপন করতে দিয়েছিল। হযরত ইয়াকুবের বংশধরদের বনি ইসরাঈল বলা হয়। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন রাখাল রাজাদের 'আপোসিস' নামক রাজাই ছিলেন হযরত ইউসুফের সময়কার রাজা।

এ রাজা হযরত ইউসুফকে অত্যন্ত সম্মান দান করেন। প্রথমে তিনি ইউসুফকে অর্থমন্ত্রী বানান। পরে দেশ শাসনের বিরাট দায়িত্বভার ইউসুফের উপর অর্পণ করেন। হযরত ইউসুফ যে বিরাট যোগ্যতা ও অগাধ জ্ঞানের ভিত্তিতে দেশ শাসন করেন রাজা তাতে খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। শেষ পর্যন্ত হযরত ইয়াকুবের বংশধররা অর্থাৎ বনি ইসরাঈলের লোকেরা ব্যাপকভাবে ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন স্তরে তারা দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে।

কুরআনে হযরত ইউসুফ

কুরআনের একটি সূরাই রয়েছে হযরত ইউসুফের নামে। সূরাটির নাম 'ইউসুফ'। এটি আল কুরআনের দ্বাদশ সূরা। মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। গোটা

সূরায় হযরত ইউসুফের কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে। কুরআন মজিদে এ কাহিনীকে 'আহাসানুল কাসাস' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর মানে 'সর্বোত্তম কল্যাণকর কাহিনী'। সত্যিই হযরত ইউসুফের জীবনীতে রয়েছে তরুণ ও যুবকদের জন্যে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়। রয়েছে আদর্শ জীবন গড়ার উপাদান।

আল কুরআনে হযরত ইউসুফের নাম সাতাশ বার উল্লেখ হয়েছে। এর মধ্যে পঁচিশ বারই উল্লেখ হয়েছে সূরা ইউসুফে। তাছাড়া সূরা আন'আমের চুরাশি এবং সূরা আল মুমিনের চৌত্রিশ নম্বর আয়াতে একবার একবার করে উল্লেখ হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্যে সূরা ইউসুফ পড়ে নেবেন।

হযরত ইউসুফের চারিত্রিক আদর্শ

হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের কাহিনীতে রয়েছে আমাদের জন্যে অনেক অনেক শিক্ষা। তাঁর জীবনাদর্শ থেকে পাওয়া শিক্ষাগুলো আমরা এখানে লিখে দিচ্ছি। আসুন মনোযোগ দিয়ে সেগুলো পড়ে নিই :

১. তাঁর পিতা হযরত ইয়াকুব ছিলেন আল্লাহর নবী। ফলে ইউসুফ ছোটবেলা থেকেই নবীর অনুসারী হন। নবীর পথে চলেন।

২. তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞান পিপাসু। ফলে আল্লাহ তাঁকে অনেক জ্ঞান দান করেন। কথার মর্ম উপলব্ধি করার যোগ্যতা দান করেন।

৩. তিনি সবসময় পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। ফলে পিতা মাতাও তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন।

৪. তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বাসী। যে কেউ তাঁর উপর আস্থা রাখতে পারতো।

৫. তিনি ছিলেন অত্যন্ত উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী।

৬. তিনি গোপনে এবং সুযোগ পেয়েও পাপ কাজ করেননি।

৭. তিনি সবসময় আল্লাহকে ভয় করতেন।

৮. তিনি কারা নির্যাতন সয়েছেন, কিন্তু কোনো প্রকার অন্যায় ও পাপ কাজ করতে রাজি হননি।

৯. তিনি ছিলেন অত্যন্ত আমানতদার। কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করেননি।

১০. তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ছিলেন। কখনো ধৈর্যহারা হননি।

১১. তিনি সুযোগ পেলেই মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতেন। দাওয়াত দিতেন।

১২. সকল বিষয়ে তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করতেন। আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতেন। তাঁর কাছেই ফরিয়াদ করতেন।

১৩. তিনি তাঁর জ্ঞান ও প্রতিভার মাধ্যমে মানুষের উপকার করতেন। তাদের সমস্যার সমাধান বলে দিতেন। পরামর্শ দিতেন।

১৪. যেসব নারী তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, তিনি সামাজিকভাবে তাদের মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন।

১৫. তিনি সামাজিকভাবে নিজের নির্দোষ, বিশ্বস্ত ও নিষ্পাপ হবার কথা প্রমাণ করে দেন।

১৬. তিনি সুযোগ পেয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

১৭. তিনি অত্যন্ত যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে তাঁর উপর অর্পিত রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করেন।

১৮. ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি ভাইদের অপরাধের প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি।

১৯. সুযোগ পেয়েও প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ভাইদের ক্ষমা করে দেন।

২০. তিনি পিতামাতা ও ভাইদের সম্মানের সাথে পুনর্বাসিত করেন।

২১. তিনি সকল সৌভাগ্যের জন্যে কেবলমাত্র মহান আল্লাহর শোকর আদায় করেন। তাঁরই কৃতজ্ঞ হয়ে থাকেন।

২২. তিনি আল্লাহর একান্ত অনুগত ও বাধ্যগত দাসের মতো অবস্থায় মৃত্যু কামনা করেন।

২৩. পরকালে তিনি নেক লোকদের সাথি হবার জন্যে পরম দয়াবান আল্লাহর কাছে আকুতি জানান।

আসুন, আমরা হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের এসব মহান আদর্শের অনুসরণ করি। নিজেদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলি।

কুরআনে ইউসুফের একটি দোয়া

ইউসুফ রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করেন। পিতা আল্লাহর নবী ইয়াকুবকে পরিবারবর্গসহ নিজের কাছে নিয়ে আসেন। আল্লাহ সকল দিক থেকে ইউসুফের প্রতি নিজের নিয়ামত পূর্ণ করেন। এ সময় ইউসুফ মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন:

"আমার প্রভু! তুমি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেছো, আমাকে কথার মর্ম উপলব্ধি করার শিক্ষা দিয়েছো! তুমিই আসমান জমিনের স্রষ্টা। দুনিয়া এবং আখিরাতে তুমিই আমার অলি (বন্ধু, অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক)। মুসলিম (তোমার প্রতি আত্মসমর্পিত) হিসেবে আমার ওফাত দিয়ো আর আমাকে মিলিত করো ন্যায়পরায়ণদের সাথে।" সূরা ১২ ইউসুফ : আয়াত ১০১)

(১২)

শুয়াইব

আলাইহিস্ সালাম

মহান আল্লাহ আল কুরআনে যেসব সম্মানিত নবীর নাম উল্লেখ করেছেন শুয়াইব আলাইহিস্ সালাম তাঁদেরই একজন। অন্য সকল নবীর মতো তিনিও এই মহাসত্যের প্রতিই মানুষকে আহ্বান করেছিলেন :

"হে আমার জাতির ভাইয়েরা! তোমরা কেবল এক আল্লাহর দাসত্ব, আনুগত্য ও হুকুম পালন করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ্ নেই।"

শুয়াইব কোন্ জাতির নবী ছিলেন?

কুরআন মজিদে শুয়াইব আলাইহিস্ সালামকে মাদ্ইয়ান ও আইকাবাসীদের নবী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো কোনো মুফাস্সির বলেছেন, এই দু'টি নাম মূলত একটি গোত্রেরই দু'টি নাম। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এ দুটি আসলে দুটি গোত্রেরই নাম। শুয়াইব আলাইহিস্ সালাম এই দুটি কওমের কাছেই নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক ও মুফাস্সিরগণের মতে, এই দু'টি গোত্র ইবরাহিম আলাইহিস্ সালামের বংশধর। তাদের বসবাসও ছিলো পাশাপাশি। কুরআনে বলা হয়েছে, এ দু'টি জাতি উন্মুক্ত রাজপথে অবস্থান করতো।

মাদ্ইয়ানবাসীদের বসবাস ছিলো উত্তর হিজাজ থেকে ফিলিস্তিনের দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে এবং সেখান থেকে সিনাই উপত্যকার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আকাবা উপসাগর এবং লোহিত সাগরের তীর জুড়ে। মাদ্ইয়ান ছিলো তাদের প্রধান শহর।

বর্তমান তবুক অঞ্চলের প্রাচীন নাম ছিলো আইকাহ্। তবুকের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আইকাবাসীরা বসবাস করতো। মাদ্ইয়ান এবং আইকাবাসীদের মধ্যে বৈবাহিক, বাণিজ্যিক এবং অন্যান্য সামাজিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো। এ ছাড়া উভয় জাতি একই ধরনের অসামাজিক কাজকর্ম এবং অন্যায় ও অপরাধে লিপ্ত ছিলো। সে কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের উভয় জাতির হিদায়াতের জন্যে একজন ব্যক্তিকেই নবী নিযুক্ত করেন।

হযরত শুয়াইবের জন্ম হয় মাদইয়ান গোত্রে। কুরআন মজিদে মাদইয়ানবাসীদের হযরত শুয়াইবের জাতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি তাদেরকে 'হে আমার জাতির ভাইয়েরা' বলে সম্বোধন করতেন।

হযরত শুয়াইব কোন্ সময়কার নবী?

হযরত শুয়াইব আলাইহিস্ সালাম যে ঠিক কোন্ সময়কার নবী ছিলেন, সে কথাটি একেবারে নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তবে কুরআনের বর্ণনা ভংগি থেকে বুঝা যায়, শুয়াইব আলাইহিস্ সালাম মূসা আলাইহিস্ সালামের পূর্বে নবী ছিলেন। কুরআন মজিদে হযরত নূহ, হূদ, সালেহ, লুত ও শুয়াইব আলাইহিস্ সালামের ঘটনাবলি উল্লেখ করার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন : "অতপর এদের পরে আমি মূসাকে পাঠিয়েছি।" কুরআন থেকে একথাও বুঝা যায় যে, শুয়াইব আলাইহিস্ সালাম লুত আলাইহিস্ সালামের পরে প্রেরিত হয়েছেন। হযরত শুয়াইব তাঁর কওমকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, 'লুত জাতির ধ্বংসাত্মক পরিণতি তো তোমাদের থেকে খুব বেশি আগের ঘটনা নয়।'

ব্যাস্, এখন আমাদের কাছে পরিষ্কার হলো, শুয়াইব আলাইহিস্ সালাম লুত আলাইহিস্ সালামের পরে এবং মূসা আলাইহিস্ সালামের পূর্বে নবী ছিলেন। তবে কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে মূসা আলাইহিস্ সালাম হযরত শুয়াইবের সাক্ষাত লাভ করেছিলেন।

মাদ্ইয়ান ও আইকাবাসীদের দুরাচার

মাদ্ইয়ান ও আইকাবাসী তাদের পূর্ব পুরুষ ইবরাহিম আলাইহিস্ সালামের প্রচারিত দীন ইসলামেরই উত্তরাধিকারী ছিলো। কিন্তু কয়েকশ বছরের ব্যবধানে তারা ইসলামকে বিকৃত করে ফেলে এবং বাস্তবে ইসলামের আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে পড়ে। বিশ্বাস ও চরিত্রের দিক থেকে তারা যেসব অপরাধে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল সেগুলো ছিলো :

১. তারা আল্লাহর দীনকে বিকৃত করে ফেলেছিল।

২. তারা আল্লাহর সাথে শিরক করতো। মূর্তিপূজা করতো।

৩. তারা জীবন যাপনের সঠিক পথ থেকে দূরে সরে পড়েছিল।

৪. তারা মাপে কম দিতো। লেনদেনে হেরফের করতো। মানুষকে ঠকাতো। প্রতারণা করতো।

৫. ডাকাতি ও হাইজ্যাকি ছিলো তাদের নিত্য দিনের কাজ।

৬. এছাড়াও অন্যান্য পাপাচার ও ধ্বংসাত্মক কাজে তারা লিপ্ত ছিলো।

হযরত শুয়াইবের সংস্কার আন্দোলন

এই দুটি অধঃপতিত কওমকে সংশোধন করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা মাদ্ইয়ানের মহান চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী শুয়াইবকে নবী নিযুক্ত করেন। শুয়াইব ছিলেন অত্যন্ত সুভাষী ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি মর্মস্পর্শী দাওয়াত ও আহ্বানের মাধ্যমে আল্লাহর দীনের প্রচার ও জাতিকে সংশোধনের সংগ্রাম শুরু করেন। তাঁর কর্মধারা সম্পর্কে মহান আল্লাহ আল কুরআনে উল্লেখ করেন :

"আর আমি মাদইয়ানবাসীর কাছে তাদের ভাই শুয়াইবকে পাঠিয়েছি। সে তাদের বলেছিল : হে আমার জাতির ভাইয়েরা! তোমরা এক আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করো, তিনি ছাড়া তোমাদের অপর কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। তাই তোমরা তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী মাপ ও ওজন পূর্ণ করে দাও। মানুষকে তাদের দ্রব্য সামগ্রিতে ঠকিওনা। দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করোনা। এতেই তোমাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। প্রতিটি পথে ডাকাত হয়ে বসোনা। সন্ত্রাস সৃষ্টি করোনা। যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রেখোনা এবং সহজ সরল পথকে বাঁকা করার চেষ্টা করোনা। চোখ খুলে দেখো, অতীতে যারা ধ্বংসাত্মক কাজ করেছে তাদের পরিণতি কী হয়েছে?" (সূরা আ'রাফ: আয়াত ৮৫-৮৬)

মাদইয়ানবাসীদের মতো আইকাবাসীদের সংশোধন করার জন্যও হযরত শুয়াইব আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁর এ প্রচেষ্টা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেন : "আইকাবাসীরা রসূলদের অস্বীকার করে। শুয়াইব যখন তাদের বললো : তোমরা কি ভয় করোনা? আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল, সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো আর আমার আনুগত্য করো। এই উপদেশ দানের কাজে আমি তো তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাইনা। আমাকে পারিশ্রমিক দেয়ার দায়িত্ব তো আল্লাহর। ওজন পূর্ণ করে দাও, মানুষকে তাদের মাল কম দিওনা, পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করোনা। সেই মহান স্রষ্টাকে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মকে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা ২৬ আশ শোয়ারা : আয়াত ১৭৬-১৮৪)

এভাবে মর্মস্পর্শী ভাষায় শুয়াইব আ. এই দুইটি জাতিকে সংশোধন করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তারা তাঁর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁর সাথে বিতর্ক ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হয়। তারা বললো : "হে শুয়াইব! তোমার সালাত কি তোমাকে এই শিক্ষাই দেয় যে, আমরা সেই সব মা'বুদদের পরিত্যাগ করবো, আমাদের পূর্ব পুরুষরা যাদের ইবাদত করতো? আর আমাদের অর্থ সম্পদ আমাদের ইচ্ছে মতো ব্যয় করার ইখতিয়ার আমাদের থাকবেনা? তুমি একজন মহৎ হৃদয়ের বড় সদাচারী লোকই থেকে গেলে।" (সূরা হুদ : আয়াত ৮৭)

তারা আরো বললো : "তুমি একজন যাদুগ্রস্ত মানুষ, তুমি তো আমাদের মতই একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নও। আমরা তোমাকে পরিষ্কার মিথ্যাবাদী মনে করি। তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে এক টুকরা আকাশ আমাদের উপর ভেঙ্গে ফেলো দেখি।" (সূরা শোয়ারা : আয়াত ১৮৫-১৮৭)

শুয়াইব বললেন : "আমি তো কেবল তোমাদের সংশোধন চাই। আমার সাধ্য অনুযায়ী সংশোধনের এই চেষ্টা আমি করে যাবো। আমার বিরুদ্ধে তোমাদের হঠকারিতা যেনো সেই পর্যায়ে না যায়, যার ফলে নূহ, হুদ ও সালেহ-এর

জাতির উপর আল্লাহর আযাব এসেছিল। আর লুত জাতির ধ্বংসের ইতিহাস তো তোমাদের থেকে বেশি আগের নয়। তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর দিকে ফিরে আসো। তিনি বড় দয়ালু, বড় বন্ধু সুলভ।" (সূরা হূদ : ৮৮-৯০)

এসব কথার জবাবে তারা বলছিল: "শুয়াইব! তোমার অনেক কথাই আমাদের বুঝে আসে না। ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক না থাকলে তোমাকে আমরা পাথর মেরে হত্যা করতাম। আমাদের চাইতে তোমার ক্ষমতা বেশি নয়।"

তাদের এসব কথা শুনে শুয়াইব বললেন : "আমার সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক কি আল্লাহর চাইতেও সম্মানিত? তোমরা ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের কথা বলছো, অথচ আল্লাহর ব্যাপারে মোটেই তোয়াক্কা করছোনা? তোমরা অবশ্যই আল্লাহর বেষ্টনীতে আছো।" তিনি আরো বললেন : "আমার কাজ আমি অবশ্যই করে যাবো, তোমরা অচিরেই জানতে পারবে, কার উপর অপমানকর আযাব আসে আর মিথ্যাবাদীই বা কে? তোমরা অপেক্ষা করো, আমিও অপেক্ষা করছি।"

চরম বিরোধিতার মুখেও একদল যুবক হযরত শুয়াইবের প্রতি ঈমান আনে। চরম নির্যাতনের মুখেও তারা আল্লাহর নবীর সাথে ঈমানের পথে চলতে থাকে। কিন্তু বিরোধী নেতারা কিছুতেই এদের সহ্য করতে পারে না। তারা অবশেষে হুংকার ছেড়ে ঘোষণা দিলো : "হে শুয়াইব! আমরা তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেবো। অথবা তোমাদেরকে আমাদের প্রচলিত ধর্মে ফিরে আসতে হবে।" (সূরা ৭ আল আ'রাফ : আয়াত ৮৮)

তারা জনসভা করে করে জনগণের মাঝে ঘোষণা করে দিলো, তোমরা যদি শুয়াইবের দলে যোগ দাও তাহলে তোমাদের ধ্বংস কেউ ঠেকাতে পারবেনা। এ সব হুংকারের জবাবে শুয়াইব আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলেন : "ওগো আমাদের প্রভু! আমাদের মাঝে আর আমাদের জাতির মাঝে সঠিক ফায়সালা করে দাও। তুমি তো সর্বোত্তম ফায়সালাকারী।" (সূরা ৭ আ'রাফ : আয়াত ৮৯)

মাদইয়ান ও আইকাবাসীর ধ্বংস

হযরত শুয়াইবের আ. অনেক চেষ্টা সংগ্রামের পরও এই দুইটি জাতি যখন আল্লাহর পথে আসলোনা এবং নবী ও তাঁর সাথিদেরকে উৎখাত করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলো, তখন আল্লাহ তা'আলা এই উভয় জাতিকে ধ্বংস করে দিলেন। মাদইয়ানবাসীদের ধ্বংস করলেন প্রচণ্ড বজ্রধ্বনি দিয়ে। এমনভাবে তাদের বিরান করে দিলেন, যেনো ওখানে কোনো দিনই কোনো লোক বসবাস করেনি।

অপরদিকে আইকাবাসীদের ধ্বংস করলেন ছাতার মতো মেঘমালা পাঠিয়ে। মেঘ থেকে আযাব বর্ষিত হলো আর আইকাবাসীরা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেলো।

কিন্তু মহান আল্লাহ হযরত শুয়াইব আ. ও তাঁর সাথি মুমিনদেরকে এসব ধ্বংসের আযাব থেকে রক্ষা করলেন। তাঁদের বাঁচিয়ে রাখলেন এবং এই মুমিনদের ঘরেই জন্ম নিলো পরবর্তী প্রজন্ম।

কুরআনে উল্লেখ

কুরআন মজিদে সূরা আ'রাফ ও সূরা হূদে মাদ্ইয়ানবাসীদের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সূরা শোয়ারায় বর্ণিত হয়েছে আইকাবাসীদের ঘটনা।

কুরআন মজিদে হযরত শুয়াইব আ-এর নাম উল্লেখ হয়েছে ১১ বার। সে আয়াতগুলো হলো : সূরা আ'রাফ ৮৫, ৮৮, ৯০, ৯২, ৯২। সূরা হূদ : ৮৫, ৮৭, ৯১, ৯৪। আনকাবুত : ৩৬। শোয়ারা : ১৭৭)।

আপনারা যদি কুরআন পড়েন এবং সরাসরি কুরআন থেকেই এসব ঘটনাবলি জানার চেষ্টা করেন, তাহলে অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং শিখতে পারবেন অনেক কিছু। আসুন আমরা সবাই কুরআন পড়ি। নবীদের ঘটনাবলি জানি এবং নবীদের আদর্শ অনুযায়ী জীবন গড়ি।

❖

ধৈর্যের পাহাড় আইউব

আলাইহিস্ সালাম

"আর আইউবের কথা চিন্তা করে দেখো! সে যখন ফরিয়াদ করলো : 'ওগো আমার প্রভু! আমি কঠিন রোগে বড় কষ্টের মাঝে আছি আর তুমিতো সবচেয়ে বড় করুণাময়!' অতপর আমি তার ফরিয়াদ কবুল করলাম আর দূর করে দিলাম তার সব কষ্ট।" (সূরা ২১ আল আম্বিয়া : আয়াত ৮৩-৮৪)

হযরত আইউবের পরিচয়

আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত আইউব আলাইহিস্ সালামের কথা আল কুরআনে চারটি স্থানে উল্লেখ হয়েছে। সেগুলো হলো সূরা আন নিসার ১৬৩ নম্বর আয়াত, সূরা আল আনআমের ৮৪ নম্বর আয়াত, সূরা আল আম্বিয়ার ৮৩-৮৪ নম্বর আয়াত এবং সূরা সোয়াদের ৪১-৪৪ নম্বর আয়াত।

হযরত আইউবের বংশ পরিচয় পরিষ্কারভাবে জানা যায়না। এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ছিলেন বনি ইসরাঈলের একজন নবী। কেউ বলেছেন তিনি ছিলেন মিশরীয়। তবে ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাকের মতকে অনেকে সঠিক বলেছেন। তাঁর মতে হযরত আইউবের বংশ পরিচয় হলো হযরত ইবরাহিমের পুত্র ইসহাক, ইসহাকের পুত্র ঈশূ, ঈশূর পুত্র আমূশ, আমূশের পুত্র আইউব। হযরত আইউব আলাইহিস্ সালাম খৃষ্টপূর্ব নবম বা দশম শতকের লোক ছিলেন।

ধনী হযরত আইউব

হযরত আইউব আলাইহিস্ সালাম ছিলেন এক বিরাট ধনী ব্যক্তি। তাঁর ধন সম্পদ ছিলো অগাধ। তিনি ছিলেন অনেক অনেক ভূমি ও বাগ বাগিচার মালিক। তাঁর ছিলো অগাধ অর্থকড়ি। ছিলো অনেক সন্তান সন্তুতি। ছিলো সুস্বাস্থ্য।

কিন্তু এতো বড় ধনী হলে কি হবে, এজন্যে তাঁর ছিলনা কোনো গর্ব, ছিলনা কোনো অহংকার। তিনি এগুলোকে আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ মনে করতেন। আল্লাহ তাঁকে এতো ধন সম্পদ দিয়েছেন বলে তিনি সব সময় আল্লাহর শোকর আদায় করতেন, আল্লাহর কৃতজ্ঞ হয়ে থাকতেন।

কঠিন পরীক্ষা

কিন্তু আল্লাহর নিয়ম হলো, তিনি মানুষকে দিয়েও পরীক্ষা করেন, নিয়েও পরীক্ষা করেন। আর যেসব মানুষ আল্লাহর বেশি প্রিয়, তিনি তাদের অনেক বড় পরীক্ষা

নেন। হযরত আইউব আলাইহিস্ সালাম ছিলেন আল্লাহর একজন অতিপ্রিয় দাস ও নবী। তিনি যেমন তাঁকে ভালবাসতেন, তেমন কঠিন পরীক্ষাও তাঁর উপর চাপিয়ে দেন। হযরত আইউব আলাইহিস্ সালাম চারটি বড় বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন :

১. তাঁর সমস্ত ধন সম্পদ জমাজমি বিনষ্ট হয়ে যায়।
২. তাঁর সারা শরীরে এক কঠিন যন্ত্রণাদায়ক রোগ দেখা দেয়। বছরের পর বছর কাটে কিন্তু তাঁর রোগ ভালো হয়না।
৩. তাঁর স্ত্রী ছাড়া সকল আপনজন তাঁকে ছেড়ে দূরে চলে যায়। তিনি সম্পূর্ণ নিঃসহায় হয়ে পড়েন।
৪. এ অবস্থায় আল্লাহর প্রতি বিমুখ হবার জন্যে শয়তান তাঁকে অনবরত প্ররোচনা দিতে থাকে।

এতোবড় পরীক্ষায় পড়েও হযরত আইউব সবর অবলম্বন করেন, ধৈর্য ধারণ করেন। প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করেন। তিনি সুসময়ে যেমন তাঁর প্রভুর কৃতজ্ঞ ছিলেন, দুঃসময়েও ঠিক তেমনি কৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনি তাঁর সমস্ত দুঃখ কষ্ট ও অসুবিধার জন্যে কেবল মহান আল্লাহর কাছেই ফরিয়াদ করতেন। কেবল তাঁরই কাছে সাহায্য চাইতেন। তিনি বলতেন :

"প্রভু! আমি বড় কষ্টে আছি। আর তুমিতো সব দয়ালুর বড় দয়ালু। প্রভু! শয়তান আমাকে বড় কষ্ট আর যন্ত্রণা দিচ্ছে, তুমিতো আমার অবস্থা দেখছো।"

হযরত আইউব প্রায় সতের আঠার বছর এই কঠিন রোগ আর অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকেন। অবশেষে আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেন। তিনি তাঁকে পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে বলেন।[১] হযরত আইউব তাই করলেন। কী আশ্চর্য! পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করার সাথে সাথেই সেখান থেকে স্বচ্ছ পানির একটি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হলো। আল্লাহ তাঁকে এ পানি পান করতে এবং এ পানিতে গোসল করতে বললেন। তিনি তাই করলেন। এর ফলে আল্লাহর দয়ায় তাঁর রোগ ভালো হয়ে গেলো।

বিবি রাহমা

রাহমা নামে হযরত আইউবের একজন স্ত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত আল্লাহভীরু, সতী এবং স্বামী পরায়না। দীর্ঘ রোগের কারণে আপনজন সকলেই হযরত আইউবকে ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু রাহ্মা। তাঁর স্ত্রী রাহমা তাঁকে ছেড়ে যাননি। বছরের পর বছর ধরে তিনি স্বামীর সেবা যত্ন করেন। অসাধারণ ধৈর্যগুণ থাকলেই কেবল কোনো নারী এতো বছর ধরে কঠিন রোগেও স্বামীর সেবা করে যেতে পারেন। শয়তান হযরত আইউবকে সরাসরি কোনো ধোকা দিতে না পেরে রাহমার কাছে এলো। সে রাহমাকে এই বলে প্ররোচনা দিতে

থাকে, তুমি আর কতকাল সহ্য করবে? দিনের পর দিন শয়তান তাঁকে এভাবে অস্‌অসা দিতে থাকে। তাঁকে প্ররোচিত করতে থাকে।

অবশেষে একদিন এসে তিনি স্বামীকে বললেন, এভাবে আর কতকাল পরীক্ষা চলবে? আর কতকাল বিপদ মসিবত সইয়ে যাবো?

একথায় হযরত আইউব অত্যন্ত মনোক্ষুণ্ন হলেন। তিনি স্ত্রীকে বললেন, যতো দিন দুঃখ কষ্টে আছো, তার চাইতে বেশিদিন কি সুখের মধ্যে কাটাওনি? যতোদিন আমি সুখে ছিলাম ততোদিন দুঃখ ভোগের আগে এ অবস্থা দূর করে দেয়ার জন্যে আল্লাহর কাছে আবদার করতে আমার লজ্জা হয়।

হযরত আইউব স্ত্রী রাহমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। কিন্তু তার মুখে যখন অধৈর্যের কথা শুনলেন এটাকে তিনি আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা মনে করলেন এবং অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। রাগের মাথায় তিনি কসম খেয়ে বললেন, এ অধৈর্যের জন্যে আমি তোমাকে একশত বেত্রাঘাত করবো। রাগ স্তিমিত হলে তিনি পেরেশান হয়ে উঠলেন, যদি কসম বাস্তবায়ন করি তবে তো একজন নিরপরাধকে শাস্তি দেয়া হয়। আর যদি কসম বাস্তবায়ন না করি তবে তো গুনাহগার হতে হয়। এর সমাধান চেয়ে তিনি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন।

তিনি যতোগুলো বেত্রাঘাত করার অংগীকার করেছেন, আল্লাহ তাকে ততোগুলো শলা দিয়ে একটি আঁটি বানাতে বললেন।[২] আর সেই আটি দিয়ে বিবি রাহমাকে একটি মৃদু আঘাত করতে বললেন। ব্যাস, তিনি তাই করলেন। তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ হয়ে গেলো। মহান আল্লাহ তাদের দু'জনের দুশ্চিন্তা দূর করে দিলেন এবং তাঁদেরকে নিজের রহমত দ্বারা সিক্ত করলেন।

ফিরে এলো সুখের দিন

এবার হযরত আইউব আলাইহিস্ সালামের সুখের দিন ফিরে এলো। আল্লাহ তাঁর রোগ ভালো করে দিলেন। আবার প্রচুর ধন সম্পদ দান করলেন। তাঁর সন্তান ও আত্মীয় স্বজনরা ফিরে এলো তাঁর কাছে। তিনি সুস্থ শরীরে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকতে শুরু করলেন। বহু দুঃখ কষ্টের পর বিবি রাহমার জীবনে আবার সুখের দিন ফিরে এলো। কথায় বলে 'সবরে মেওয়া ফলে'। হযরত আইউব সবর করেছিলেন, বিবি রাহমা সবর করেছিলেন। তাই সুখের দিন ফিরিয়ে দিয়ে আল্লাহ তাঁদের সবরের প্রতিফল দান করেন।

আল কুরআনে তাঁর প্রশংসা

মহান আল্লাহ কুরআন মজিদে হযরত আইউব আলাইহিস্ সালামের ভুয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন :

১. আমি আইউবকে পেয়েছি পরম ধৈর্যশীল। সে ছিলো আমার এক উত্তম গোলাম, ছিলো আল্লাহমুখী। (সূরা ৩৮ সোয়াদ : আয়াত ৪৪)

২. আইউবের ব্যাপারটি ছিলো বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে শিক্ষণীয়। (সূরা ৩৮ সোয়াদ : আয়াত ৪৩)
৩. আইউবের ঘটনা ইবাদতকারীদের জন্যে শিক্ষণীয়। (সূরা আম্বিয়া : ৮৪)
৪. হে মুহাম্মদ! আমি তোমার কাছে অহি পাঠাচ্ছি ঠিক সেভাবে, যেভাবে পাঠিয়েছিলাম নূহ এবং তার পরবর্তী নবীদের কাছে.... ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারূণ এবং সুলাইমানের কাছে। (সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ১৬৩)

শিক্ষণীয় বিষয়

বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে হযরত আইউব আলাইহিস্ সালামের জীবন চরিতে যে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে, তাতো স্বয়ং আল্লাহই বলেছেন। সত্যি তাই। আসুন দেখি, তাঁর জীবন চরিতে আমরা কি কি শিক্ষা পাই।

১. প্রাচুর্যের সময় আত্মহারা হয়ে আল্লাহকে ভুলে যেতে নেই।
২. ধন সম্পদ, সন্তান সন্তুতি, মান ইযযত এই সবকে আল্লাহর দান মনে করা উচিত এবং এগুলোর জন্যে আল্লাহর শোকর আদায় করতে থাকা উচিত।
৩. রোগ শোক, দুঃখ কষ্ট ও বিপদ মসিবতে ধৈর্যহারা হতে নেই। বরং ধৈর্যের সাথে আল্লাহর উপর আশা ভরসা করে থাকা উচিত।
৪. বিপদ মসিবত, দুঃখ কষ্ট, রোগ শোক ও অসহায় অবস্থায় শয়তান মুমিনদের সাথে প্রতারণা করার সুযোগ নেয়। তাই এসব অবস্থায় শয়তানের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। এবং শয়তানের প্ররোচনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে থাকতে হবে।
৫. সুখের সময় আল্লাহর শোকর আদায় করা আর দুঃখের সময় সবর অবলম্বন করা নবীদের আদর্শ।
৬. রাগ বশত কোনো ভুল করে ফেললে সেজন্যে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।
৭. রোগ শোক, দুঃখ কষ্ট ও বিপদ মসিবতে একজন মুমিন স্ত্রীর কোনো অবস্থাতেই স্বামীর কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া উচিত নয়। বরং পরম ধৈর্য ও সবরের সাথে স্বামীর সেবা করা উচিত।

টীকা

১. সূরা সোয়াদ : ৪২ আয়াত।

২. সূরা সোয়াদ: আয়াত ৪৪।

(১৪)

যুলকিফ্ল

আলাইহিস্ সালাম

কুরআন মজিদে 'যুলকিফ্ল' নামটি দু'বার উল্লেখ হয়েছে। দু'বারই অন্যান্য নবীদের সাথে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একবার উল্লেখ হয়েছে সূরা আল আম্বিয়াতে। সেখানে বলা হয়েছে এভাবে :

"আর ইসমাঈল, ইদরিস ও যুলকিফ্ল, এরা সবাই ছিলো ধৈর্যশীল। আমার রহমত দ্বারা এদের সিক্ত করেছিলাম। এরা ছিলো যোগ্য সৎকর্মশীল।" (সূরা ২১ আল আম্বিয়া : আয়াত ৮৫-৮৬)

সূরা সোয়াদে তাঁর কথা উল্লেখ হয়েছে এভাবে :

"ইসমাঈল, আলইয়াসা আর যুলকিফল-এর কথা স্মরণ করো। এরা সবাই ছিলো উত্তম মানুষ।" (আয়াত : ৪৮)

যুলকিফ্ল ছিলেন বনি ইসরাঈলের একজন নবী। আবার কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ছিলেন হযরত আইউব আলাইহিস্ সালামের পুত্র। 'যুলকিফল' শব্দের অর্থ ভাগ্যবান। দুনিয়াবী দৃষ্টিতে নয়, পরকালীন দৃষ্টিতে ভাগ্যবান। এটি তাঁর আসল নাম নয়, বরং এটি ছিলো তাঁর উপাধি। তাঁর মূল নাম ছিলো 'বিশ্‌র'।

যুলকিফ্ল যদি আইউব আলাইহিস্ সালামের পুত্র হয়ে থাকেন, তবে পিতার পরেই তিনি নবী হয়েছিলেন। অনেকে মনে করেন যুলকিফ্ল আসলে বাইবেলে উল্লেখিত যিহিস্কেল নবী। যিহিস্কেল মুসলমানদের কাছে হিযকীইল নামে পরিচিত। তাঁর এই পরিচয়টি সঠিক মনে হয়।

বাইবেলের যিহিস্কেল পুস্তক থেকে জানা যায়, রাজা বখ্‌তে নসর যখন শেষবার জেরুযালেম ধ্বংস করেন, তার আগে তিনি বহু বনি ইসরাঈলিদেরকে বন্দী করে নিয়ে যান। বখ্‌তে নসর ইরাকের খাবুর নদীর তীরে বনি ইসরাঈলি বন্দীদের একটি উপনিবেশ গড়ে তোলেন। এর নাম ছিলো তেলআবীব। এখানেই খৃষ্টপূর্ব ৫৯৪ অব্দে হযরত হিযকীইল নবুয়্যত লাভ করেন।[১] এ সময় তাঁর বয়স ছিলো ত্রিশ বছর। এখানে তিনি বাইশ বছর যাবত বনি ইসরাঈলিদের মাঝে নবুয়্যতের দায়িত্ব পালন করেন।

দীন প্রচারের কাজকে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর লোকেরা যখন তাঁর বাড়িতে শোক প্রকাশের জন্যে আসে, তখন তিনি এতো দুঃখের মাঝেও তাদেরকে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখাতে থাকেন।

এই হিযকীইল বা যিহিস্কেলই ছিলেন সম্ভবত হযরত যুলকিফ্‌ল আলাইহিস্ সালাম। তিনি সেই সব নবীদের একজন যারা নিজেদের জীবনের একটি অংশ বন্দী হিসেবে কাটিয়েছেন।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও নিষ্ঠাবান। দিনরাত আল্লাহর দীনের কাজে নিমগ্ন থাকতেন। মানুষকে আল্লাহর ভয় দেখাতেন। তিনি শাসকদের সবসময় সত্য সততা ও ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে সতর্ক করতেন।

টীকা

১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী: তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আম্বিয়া: টীকা- ৮১।

মূসা কলিমুল্লাহ
আলাইহিস্ সালাম

মৃত্যুপুরিতে জন্ম তাঁর

রাজা হুকুম দিলেন, ওদের ঘরে ছেলে হলেই মেরে ফেলো। রাজার গোয়েন্দা বাহিনী দিনরাত হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। ঐ বংশের কারো পুত্র সন্তান হয়েছে কিনা, খোঁজ নেয়। যখনই কারো পুত্র হবার খবর পায়, সাথে সাথে রাজার সৈন্য সামন্তরা গিয়ে তাকে হত্যা করে। এভাবে তারা হাজারো মায়ের বুক খালি করে দিয়েছে। জন্মের পর পরই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে হাজারো শিশুকে। সন্তানহারা মায়েদের আর্ত চিৎকারে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠছে। প্রতিটি পুত্র সন্তানের মা তার শিশু পুত্রের লাশ কোলে নেবার জন্যেই যেনো সন্তান ভূমিষ্ঠ করে। এ যেনো এক ভীষণ মৃতুপুরি!

এমনি ভয়ংকর অবস্থায় এক মায়ের ঘরে জন্ম হয় চাঁদের মতো ফুটফুটে এক পুত্র। এমন সুন্দর, সুঠাম ও সুদেহী শিশু লাখে একটি জন্মায়না। কিন্তু রাজার গোয়েন্দারা ওর জন্মের খবর জানতে পারলে তো এখনই মেরে ফেলবে ওকে। সারাক্ষণ ধড়ফড় করছে মায়ের বুক। হায় আল্লাহ, আমার ছেলেকে রক্ষা করো। আমার ছেলের প্রতি রহম করো। প্রভু, ওর বেঁচে থাকার পথ খুলে দাও। এমনি করে ওর মায়ের মন আল্লাহর সাহায্যের দিকে তাকিয়ে আছে।

কে এই শিশু?

আপনারা নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছেন, এই শিশুটি কে? হ্যাঁ, এই শিশুটিই মূসা আলাইহিস সালাম। পৃথিবীর ইতিহাসের এক কালজয়ী মহাপুরুষ হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর নাম উচ্চারিত হবে।

তিনি হযরত ইবরাহিমের নাতি হযরত ইয়াকুবের বংশধর। হযরত ইয়াকুবের পুত্র হযরত ইউসুফ। তাঁদের সকলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হযরত ইউসুফ যখন মিশরের রাজার অধীনে দেশের শাসন পরিচালনার সুযোগ লাভ করেন, তখন তিনি তাঁর পিতা ও ভাইদের নিজ দেশ ফিলিস্তিন থেকে মিশরে নিয়ে আসেন এবং তাঁরা মিশরেই অভিবাসন করেন।

হযরত ইয়াকুবের বংশধররা হযরত ইউসুফের মৃত্যুর পরও দীর্ঘদিন মিশরের বিভিন্ন সরকারি পদে অধিষ্ঠিত থাকে। হযরত ইউসুফের জন্ম ধরা হয় খৃষ্টপূর্ব ১৯০৬ সালে। তারপর তিনি বড় হন এবং মিশরের শাসন কার্য পরিচালনা

করেন। এ সময় মিশর শাসন করতো 'রাখাল রাজারা'। এরা ছিলো বিদেশী। এরা প্রায় খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ শতাব্দী পর্যন্ত মিশরে রাজত্ব করে। এদের রাজত্বকালের শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত বনি ইসরাঈলের লোকেরা সরকার পরিচালনায় প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে। হযরত ইউসুফের পিতা ইয়াকুবের বংশধরদের বনি ইসরাঈল বলা হয়।

খৃষ্টপূর্ব পনের শতাব্দীর শেষের দিকে মিশরের কিবতি বংশীয়রা জাতীয়তাবাদী বিপ্লব ঘটিয়ে রাজত্ব দখল করে এবং রাখাল রাজাদের মিশর থেকে বিতাড়িত করে। ফলে বনি ইসরাঈলও ক্ষমতাচ্যুত হয়। শুধু ক্ষমতাচ্যুতই নয়, শুরু হয় তাদের উপর চরম অত্যাচার আর নির্যাতন। কিবতিরা ক্ষমতা দখল করে তাদের রাজার উপাধি দেয় 'ফারাউ' বা 'ফেরাউন'। ফেরাউন বা ফারাউ' মানে- সূর্য, দেবতার প্রতিনিধি। মিশরীয় কিবতিরা সূর্য পূঁজা করতো, গরুপূজা করতো, আরো করতো অনেক কিছুর পূঁজা। কিন্তু বনি ইসরাঈল নবীর উম্মত। তারা ছিলো ইসলামের অনুসারী।

হযরত মূসার জন্মকালে যে ফেরাউন রাজা ছিলেন, তার নাম রাজা 'দ্বিতীয় রিমসিস'। ইনি একদিন এক ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেন। মিশরীয় জ্যোতিষীরা রাজাকে বলে, আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো, অচিরেই বনি ইসরাঈলের ঘরে এমন এক শিশুর জন্ম হবে, যে বড় হয়ে আপনার রাজত্ব ধ্বংস করে দেবে।

স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা রাজার মনপুত হয়। রাজা তার রক্ষীবাহিনীকে নির্দেশ দিয়ে দেয়, আজ থেকে ইসরাঈল বংশে যতো ছেলের জন্ম হবে, সবাইকে হত্যা করে ফেলো। যেই নির্দেশ, সেই কাজ। শুরু হয় ঘরে ঘরে তল্লাশি। শুরু হয় হত্যাযজ্ঞ। শিশুদের রক্তে আর মায়েদের আর্তনাদে মিশর ভূমিতে নেমে এলো এক ভয়ানক আতংক আর বিষাদ।

এমনি এক ভয়ংকর পরিবেশে বনি ইসরাঈলের এক অতি নেককার মায়ের ঘরে জন্ম হয় হযরত মূসার। মূসাকে রক্ষার আর্তি জানিয়ে ওর মা দুহাত তুলে আছেন দয়াময় রহমানের দরবারে। তিনি ভেবে পাচ্ছেন না, কিভাবে রক্ষা করবেন কলিজার টুকরো পুত্রটিকে?

ওকে নদীতে ভাসিয়ে দাও

এ সময় দয়াময় আল্লাহ মূসার মায়ের প্রতি রহম করেন। তিনি তার প্রতি অহি নাযিল করলেন :

"তখন আমি মূসার মা'র কাছে অহি (ইংগিত) করলাম : ওকে দুধ পান করাতে থাকো। যদি ওকে মেরে ফেলবে বলে আশংকা করো, তবে ওকে একটি সিন্দুকে ঢুকিয়ে সিন্দুকটি নদীতে ভাসিয়ে দাও। এতে তুমি ভয় পেয়োনা আর চিন্তিতও হয়োনা। আমি ওকে আবার তোমার কোলে ফিরিয়ে দেবো। তাছাড়া তাকে

আমি রসূল বানাবো। (সুতরাং তুমি ওকে সিন্দুকে করে নদীতে ছেড়ে দাও) নদী ওকে তীরের দিকে ঠেলে দেবে। তখন এমন এক লোক তাকে নিয়ে নেবে, যে আমারও শত্রু, ওরও শত্রু।" (সূরা কাসাস : ৭, সূরা তোয়াহা : ৩৮-৩৯)

আল্লাহর হুকুমে মূসার মা একটি সিন্দুকে মূসাকে ঢুকালেন। সিন্দুকে যেনো পানি ঢুকতে না পারে, সেজন্যে তলার সব ফাঁক বন্ধ করে দিলেন। তারপর আল্লাহর নামে সিন্দুকটি ভাসিয়ে দিলেন নদীতে। সিন্দুকে ভাসিয়ে দিলেন ঠিকই, কিন্তু মন বড় পেরেশান। মায়ের মনতো! কলিজার টুকরা পুত্রকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে মা কি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন? দুঃখ, কষ্ট, বেদনা বিষাদে মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে মূসার মার।

কিন্তু তিনি মনকে সান্ত্বনা দিলেন। ছেলেকে রক্ষা করার জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে উপায় বলে দেয়া হয়েছে, আল্লাহর উপর ভরসা করে সেটাই করলেন। সাথে সাথে নিজের মেয়েকে বললেন, সিন্দুকটি যেদিকে ভেসে যাচ্ছে, তুই নদীর তীরে হাঁটতে হাঁটতে সেদিকে যা। খেয়াল রাখিস কারা নিয়ে যায় ওকে।

রাজার ঘরে মূসা

কিছু দূরে নদীর তীরেই ছিলো রাজ প্রাসাদ। সিন্দুকটি ভাসতে ভাসতে রাজার ঘাটের দিকে এগিয়ে এলো। ফেরাউনের লোকজন সিন্দুকটি দেখতেই উঠিয়ে নিয়ে গেলো। খুলে দেখে, ভেতরে চাঁদের মতো ফুটফুটে এক শিশু! কী মায়াবী চেহারা!

ফেরাউন ভাবলো, এটি নিশ্চয়ই ইসরাঈল বংশের কোনো শিশু হবে। আমার রক্ষীবাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্যেই নদীতে ফেলে দিয়েছে। এই ভেবে ফেরাউন শিশুটিকে মেরে ফেলতে নির্দেশ দিলো। সাথে সাথে দৌড়ে এলেন ফেরাউনের স্ত্রী। তিনি স্বামীকে বললেন : ওকে মারবেন না। ও নিশ্চয়ই আমার এবং আপনার চক্ষু শীতল করবে। কিংবা ওকে আমরা আমাদের পুত্রই বানিয়ে নেবো। সে আমাদের অনেক উপকারে আসতে পারে। ক'জন মায়ের আছে এমন সোনার ছেলে? একথা বলে রাণী মূসাকে কোলে তুলে নিলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় বেঁচে গেলেন মূসা।

ছেলে পাওয়ার খবর পেয়ে রাজবাড়িতে কৌতূহলি লোকজন আর ছেলে মেয়েদের ভীড় জমে গিয়েছিল। মূসার বোন তো সিন্দুকের পিছে পিছেই আসছিল। রাজবাড়ির লোকদের সিন্দুক তুলে নিতে দেখে অন্যান্য লোকদের সাথে সেও এসে হাজির হয় রাজবাড়িতে। ছোট ভাইয়ের প্রতি রাণীর আদর মায়া দেখে বোনের মনে আনন্দের জোয়ার বইয়ে এলো। তার চিন্তিত মনে ফিরে এলো আশার আলো।

আমার মার দুধ খাবো

এবার ধাই খোঁজার পালা। সেকালে নিয়ম ছিলো, বড় লোকদের ছেলেপুলে হলে

পারিশ্রমিক দিয়ে ধাত্রী নিয়োগ করতো। ধাত্রী পয়সার বিনিময়ে তাদের শিশুকে নিজের বুকের দুধ খাওয়াতো এবং লালন পালন করতো।

ভালো ধাত্রী খুঁজে আনার হুকুম পড়লো। শুরু হলো ছুটোছুটি, খোঁজাখুঁজি। রাজবাড়িতে ধাত্রীগিরি করার কথা শুনে অনেকেই ছুটে এলো। কারণ, এখানে পয়সাও পাওয়া যাবে, বাসাবাড়িও পাওয়া যাবে, সপরিবারেও থাকা যাবে। একজন, দুইজন, দশ, বিশ জন করে অনেক ধাত্রী এলো। কিন্তু এসেই ধাত্রীদের মাথায় হাত। একে একে তারা প্রত্যেকেই মূসাকে দুধ খাওয়াতে চেষ্টা করলো। কিন্তু মূসা তাদের কারো স্তনেই মুখ দেয়না। রাণী অস্থির হয়ে পড়লো। কারো স্তনে মুখ না দিলে কেমন করে বাঁচানো যাবে ওকে।

মূসার বোনটি সব কিছু দেখছিল। ওর বয়স দশ বার বছর হলে কি হবে, ও কিন্তু দারুণ বুদ্ধিমতী। সে যখন দেখলো, তার পিচ্চি ভাইটি কারো স্তনেই মুখ দিচ্ছেনা, রাণীও অস্থির হয়ে উঠেছেন, তখন সে প্রস্তাব দিয়ে বসলো : আমি একজন ধাত্রীকে চিনি। তিনি অত্যন্ত আদর যত্ন করে বাচ্চাদের দুধ খাওয়ান। নিপুণভাবে শিশুদের লালন পালন করেন এবং বেয়াড়া শিশুদেরও তিনি দুধ পান করাতে পারেন। আপনারা বললে আমি উনাকে নিয়ে আসতে পারি।

ওর কথায় রাণী দারুণ খুশি হলেন এবং দ্রুত ঐ ধাত্রীকে নিয়ে আসতে বললেন। মূসার বোন বেরিয়ে এলো। দ্রুত পৌঁছে গেলো মায়ের কাছে। মাকে সব ঘটনার বিবরণ দিয়ে বললো, এখনই চলো। আল্লাহর ইচ্ছা হলে তোমার ছেলেকে তুমিই দুধ পান করাবে।

হ্যাঁ, এটাই ছিলো আল্লাহর ইচ্ছা। মুসার মা এসে যখনই ওকে কোলে তুলে নিলেন, সাথে সাথে ওর কান্না থেমে গেলো। মায়ের স্তন মুখে পুরে সে দুধ পান করতে লাগলো গোগ্রাসে। দুই তিন মাসের শিশু, সেও চেনে নিজের মাকে। নিজের মাকে কে না চেনে? ছেলেকে পেয়ে এবার মায়ের চোখ ঠাণ্ডা হলো আর মাকে পেয়ে শান্ত হলো ছেলের মন।

মায়ের কোলে মূসা দোলে

আল্লাহর কর্মকৌশল ফেরাউন আর তার স্ত্রী কিছুই বুঝলনা। তারা কেবল এটাই বুঝলো যে, এই ধাত্রীটিই তাদের সোনার ছেলেকে দুধপান করাবার উপযুক্ত। পারিশ্রমিক ঠিকঠাক করে তারা মূসার মাকেই নিয়োগ করলো ধাত্রী হিসেবে। রাজ প্রাসাদেই তাদের বাসা দিলো। মূসার বাবা মা, ভাইবোন সবাই এসে উঠলেন রাজ প্রাসাদে। মূসা বড় হতে থাকলেন নিজেরই মায়ের কোলে, নিজেরই ধর্মে।

দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত মূসার পরিবার রাজ প্রাসাদেই থাকলেন। তারপরেও তাদের অবাধ সুযোগ থাকলো রাজ প্রাসাদে আসা যাওয়ার। মা নিজের ছেলেকে নিজের ইচ্ছে মতোই গড়ে তুললেন। স্বভাব চরিত্রে এবং আকিদা বিশ্বাসে যেনো সে সত্যিকার মুসলিম হয়, মা তাকে সেভাবেই তৈরি করার চেষ্টা করেন।

রাজার দুলাল

এদিকে রাজা রাণী অর্থাৎ ফেরাউন ও তার স্ত্রী মূসাকে নিজেদের ছেলের মতোই রাজপুত্র হিসেবে গড়ে তুলতে লাগলেন। রাজকীয় পরিবেশেই মূসা বড় হতে থাকলেন। তার জ্ঞান, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, স্বভাব, আচরণ সবকিছুই রাজপুত্রের মতো। সবাই তাকে রাজার দুলাল বলেই জানে।

আরেকটি কথা বলে দিচ্ছি, তাহলো নদী থেকে উঠিয়ে আনার পর ফেরাউন বা তার স্ত্রীই ওর নাম রাখলো 'মূসা'। মূসার বংশের ভাষা ছিলো হিব্রু। আর 'মূসা' শব্দটি মিশরীয় কিবতি ভাষা। কিবতি ভাষায় মূসা মানে- 'আমি তাকে পানি থেকে বের করলাম'। প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় 'মু' মানে পানি আর 'উশা' মানে উদ্ধারপ্রাপ্ত। অর্থাৎ শিশুটিকে পানি থেকে উদ্ধার করে আনার কারণে তারা ওর নাম রাখে 'মূসা'।

মূসা যখন একটু বড় হলেন, যখন তার বুঝ জ্ঞান হলো, তখন তিনি তার মা'র নিকট থেকে সব কিছুই জানতে পারলেন। তিনি জানতে পারলেন, তিনি রাজার পুত্র নন। তিনি ইসরাঈল বংশের লোক। আরো জানতে পারলেন, তার বংশের প্রতি ফেরাউনের অত্যাচার নির্যাতনের কাহিনী। জানতে পারলেন, কিভাবে তিনি ফেরাউনের ঘরে এলেন। বুঝতে পারলেন, কৌশলগত কারণে সব কিছুই গোপন রাখতে হবে তাকে।

শ্রেষ্ঠ গুণাবলির অধিকারী হয়ে উঠেন

মূসার বয়েস ক্রমেই বেড়ে চলেছে। শৈশব থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে তারুণ্যে, তারুণ্য থেকে যৌবনে পদার্পণ করেন মূসা। নিজের পূর্ব পুরুষ হযরত ইবরাহিম, ইসহাক, ইয়াকুব এবং ইউসুফের মতো উন্নত জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক ও শ্রেষ্ঠ মানবীয় গুণাবলি আল্লাহ তাঁকে দান করেন। আল্লাহ বলেন :

"মূসা যখন পূর্ণ যৌবনে পৌঁছালো এবং তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ পূর্ণতা লাভ করলো, আমি তাকে বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, বিচার শক্তি এবং (দীনি ও জাগতিক) জ্ঞান দান করলাম। উপকারী লোকদের আমি এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি।" (সূরা ২৮ আল কাসাস : আয়াত ১৪)

নিজের পিতা মাতার সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে মূসা জানতে পারেন, তিনি ইবরাহিম ও ইয়াকুবের মতো মহাপুরুষদের বংশধর। মিশরের এককালীন শাসক ইউসুফ তাঁর পূর্ব পুরুষ। মূসা আরো জানতে পারেন, এঁরা সবাই ছিলেন আল্লাহর নবী। এঁদের চলার পথ ছিলো ইসলাম। তিনি তাঁদের উত্তরসূরী, তাঁদেরই অনুসারী এবং তাঁদের ধর্মই তাঁর ধর্ম। ফেরাউনের ধর্ম তার ধর্ম নয়। ফলে তিনি মানসিকভাবে সত্যিকার মুসলমান হিসেবে গড়ে উঠেন।

অন্যদিকে রাজপুত্র হিসেবে মিশরীয়দের তৎকালীন জ্ঞান বিজ্ঞানের সব বিদ্যাই তিনি অর্জন করেন। রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত কলাকৌশলও আয়ত্ব

করেন। ফেরাউন পরিবারে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে তালমুদে (বর্তমানে যে তাওরাত পাওয়া যায়, তারই নাম তালমুদ বা ওল্ড টেস্টামেন্ট) এরূপ বর্ণনা রয়েছে :

"মূসা ফেরাউনের ঘরে একজন সুদর্শন যুবক পুরুষ হিসেবে বেড়ে উঠেন। তিনি রাজপুত্রদের মতো পোশাক পরতেন। রাজপুত্রদের মতো জীবন যাপন করতেন। লোকেরা তাকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করতো। তিনি প্রায়ই জুশান এলাকায় যেতেন। সেখানে বনি ইসরাঈলিরা বসবাস করতো। তার নিজের সম্প্রদায় (বনি ইসরাঈল) এর সাথে কিবতি ফেরাউন সরকারের লোকেরা যে দুর্ব্যবহার করতো, সেগুলি তিনি নিজের চোখে দেখতেন। তাঁরই পরামর্শে ফেরাউন বনি ইসরাঈলের লোকদের জন্যে সপ্তাহে একদিন ছুটির বিধান জারি করেন। তিনি ফেরাউন রিমসিসকে বলেন, সব সময় অবিরাম কাজ করতে থাকলে ওরা দুর্বল হয়ে পড়বে। ফলে সরকারি কাজেরই ক্ষতি হবে। ওদের সজীব রাখার জন্যে সপ্তাহে একদিন ছুটি দেয়া দরকার। ফেরাউন তার পরামর্শ গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি নিজের বিচক্ষণতা দ্বারা ফেরাউনকে দিয়ে আরো বহু জনকল্যাণের কাজ করিয়ে নেন। এতে করে গোটা মিশরে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।"

বাইবেলেও তাঁর যৌবনের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে বলা হয়েছে :

"আর মোশি (মূসা) মিশ্রীয়দের সমস্ত বিদ্যায় শিক্ষিত হইলেন এবং তিনি কথায় ও কাজে পরাক্রমী ছিলেন।"

কুরআনের ভাষায় এগুলো মূলত মূসার প্রতি মহান আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহ।

এক চড়েই মরলো ব্যাটা

একদিন দুপুরে বা ভোরে মূসা একা একা শহরে গেলেন ঘুরে বেড়াতে। এভাবে তিনি প্রায়ই জনগণের অবস্থা দেখার জন্যে প্রাসাদ ছেড়ে শহরের দিকে আসেন। শহরের লোকজন তাঁকে খুব সম্মান করে। আজ যখন তিনি বেরুলেন, লোকেরা তখন ঘুমিয়েছিল কিংবা তখনো রাস্তাঘাটে কেউ বেরোয়নি। তবে অনেক দূর এসে তিনি দেখলেন, রাস্তায় দুটি লোক মারামারি করছে। একজন তার নিজ সম্প্রদায় বনি ইসরাঈলের লোক। আর অপরজন মিশরীয় কিবতি। কিবতিরা ছিলো বনি ইসরাঈলের শত্রু। তারা ছিলো ফেরাউনের লোক।

মূসাকে দেখেই ইসরাঈলি লোকটি মূসার সাহায্য চাইলো। কিবতি লোকটি খুব বাড়াবাড়ি করছে দেখে মূসা তাকে থামাতে গিয়ে একটা চড় মারলেন। মূসা ছিলেন খুব শক্তিশালী। চড় খেয়েই কিবতি লোকটি মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

মূসা তো লোকটিকে মেরে ফেলতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন তার বাড়াবাড়ি এবং মারামারি থামাতে। কিন্তু লোকটি মরে যাওয়ায় মূসা দারুণ লজ্জিত ও ব্যথিত হলেন। বললেন : 'এ হচ্ছে শয়তানের কাজ। সে মানুষের ঘোরতর শত্রু এবং পথভ্রষ্টকারী।'

এই অনিচ্ছাকৃত ঘটনার জন্যে মূসা দারুণভাবে অনুতপ্ত হলেন। সাথে সাথে দয়াময় রহমানের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন : 'প্রভু! আমি যুলম করেছি আমাকে ক্ষমা করে দাও।' আল্লাহও তাঁকে সাথে সাথে ক্ষমা করে দিলেন। কারণ, তিনি যে ক্ষমাশীল দয়াময়। আর মূসার তো তাকে হত্যা করার মটিভ ছিলনা। তিনি তাকে থামাতে চেয়েছিলেন।

আল্লাহ মূসাকে ক্ষমা করে দেয়ায়, মূসা আল্লাহর সাথে শপথ করলেন : "আমার প্রভু! তুমি যে আমার প্রতি এই অনুগ্রহ করলে, সে জন্যে আমি আর কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হবোনা।" (আল কুরআন ২৮ : ১৭)

কুরআনের মুফাসসিরগণ বলেছেন, এই শপথ করার মাধ্যমে হযরত মূসা কেবল সাধারণ অপরাধীদের সাহায্য না করারই শপথ নিলেন না সেই সাথে সবচে বড় অপরাধী যালিম ফেরাউনের 'রাজপুত্র' হয়ে এরপর আর তার প্রাসাদেও না থাকার শপথ নিলেন।

আবার সেই কুঁদুলে

পরদিন সকালে মূসা আবার শহরে বেরুলেন। মূসার মনে ভয় আর শংকা। সরকারি লোকেরা চারিদিকে কালকের হত্যাকারীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। মূসা চিন্তিত হলেন এ জন্যে, যদিও আল্লাহ তাঁকে মাফ করে দিয়েছেন, কিন্তু এদের হাতে ধরা পড়লে তারা এ ছুঁতোয় আবার বনি ইসরাঈলিদের উপর বর্বর নির্যাতন চালাবে। শুরু হবে ধ্বংসলীলা।

মূসা ভোর বিহানে চিন্তাগ্রস্ত মনে পথ চলছেন। কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত পোহায়। আবার সেই কুঁদুলের সাথে দেখা। তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের সেই কালকের কুঁদুলে লোকটি আজ আবার একজন কিবতির সাথে মারামারিতে লিপ্ত হয়েছে। কালকের মতো আজও মূসাকে দেখে লোকটি মূসার সাহায্য চেয়ে বসলো। 'তুমিতো দেখছি বড় বিভ্রান্ত লোক' একথা বলে মূসা ইসরাঈলি লোকটিকে ধমক দিলেন এবং শত্রু সম্প্রদায়ের অত্যাচারী লোকটিকে আক্রমণ করতে উদ্ধত হলেন। ধমক খেয়ে ইসরাঈলি লোকটি মনে করলো মূসা বুঝি তাকেই মারতে আসছে। ফলে সে চিৎকার করে বলে উঠলো : 'মূসা, তুমি কি আজ আমাকেও সেভাবে হত্যা করতে চাও, যেভাবে কাল একজনকে হত্যা করেছিলে? তুমি তো দেখছি বড় স্বৈরাচারী, সংশোধনকামী নও।'

একথা শুনার সাথে সাথে কিবতি লোকটি 'দে ছুট'। এক দৌড়ে সে ছুটে এলো ফেরাউনের কাছে। সব কথা খুলে বললো সে। সে বলে দিলো কালকের কিবতি লোকটিকে মূসাই মেরেছে এবং মূসা বনি ইসরাঈলিদের লোক। আর যায় কোথায়? ফেরাউন রক্ষীবাহিনীকে নির্দেশ দিয়ে দিলো যেখানেই পাও মূসাকে ধরে এনে হত্যা করো।

চলে গেলেন মাদইয়ানে

রাজার এ নির্দেশ শুনার সাথে সাথে মূসার ভক্ত প্রাসাদের এক কর্মকর্তা ছুটে এলো। সবার আগে খুঁজতে লাগলো মূসা কোথায় আছে?

খুঁজে পেয়ে গেলো সে মূসাকে। বললো : মূসা দেশের কর্তারা তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। তুমি এখুনি মিশর থেকে বেরিয়ে যাও। আমি তোমার ভাল চাই। তুমি চলে যাও। তুমি বেঁচে থাকো।

খবরটা শুনেই মূসা ভয়ে ভয়ে রওয়ানা করলেন। তিনি আল্লাহর সাহায্য চাইলেন : 'আমার প্রভু! আমাকে এই যালিমদের হাত থেকে বাঁচাও।' মূসা মিশর থেকে সোজা পার্শ্ববর্তী দেশ মাদইয়ানের দিকে যাত্রা করলেন। তিনি নিরাশ হলেননা। মনে মনে বললেন, আমার মালিক নিশ্চয়ই আমাকে সঠিক জায়গায় নিয়ে পৌছাবেন। তিনিই আমাকে সাহায্য করবেন।

সীমান্ত প্রহরীদের হাতে যেনো ধরা না পড়েন, সে জন্যে খুব সতর্কভাবে সীমান্ত পার হলেন। একাধারে আট দিন হাঁটার পর মাদইয়ানের নিরাপদ এলাকায় এসে পৌছুলেন। বিশ্রামের জন্যে একটি গাছের নিচে বসলেন।

দাঁড়িয়ে কেন দুই বোনে?

গাছের কাছেই ছিলো সে এলাকার একটি গণকূয়া। মূসা দেখলেন, লোকেরা কূয়া থেকে বালতি ভরে পানি উঠাচ্ছে আর নিজ নিজ পশুর পালকে পান করাচ্ছে। কার আগে কে পানি উঠাবে তাই নিয়ে হচ্ছে হুড়াহুড়ি। কিন্তু দুই যুবতী হুড়াহুড়ি থেকে একটু দূরে নিজেদের পশুপাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পানি উঠাবার প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেনা। মূসা কৌতূহলী হয়ে ওদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সমস্যা কি? তোমরা কেন আলাদা দাঁড়িয়ে আছো?

ওরা বললো, আমরা দুইবোন। আমাদের পিতা বৃদ্ধ মানুষ। আমাদের কোনো ভাই নেই। তাই আমাদের পশুগুলোকে আমরাই পানি পান করাই। কিন্তু রাখালেরা তাদের পশুকে পানি পান করিয়ে চলে না গেলে তো আমরা আমাদের পশুকে ভীড়ের মধ্যে গিয়ে পানি পান করাতে পারিনা। তাই ভীড় কমার অপেক্ষায় আছি।

মূসা বুঝতে পারলেন, যুবতী দুটি কোনো ভদ্র ঘরের মেয়ে। বাপ বৃদ্ধ এবং ভাই না থাকার কারণে বাধ্য হয়েই তারা পশুদের পানি পান করাতে ঘরের বাইরে এসেছে। সুতরাং ওদের সাহায্য করা উচিত।

তিনি ওদের পশুগুলো নিয়ে ভীড়ের মধ্যে চলে গেলেন। মূসা ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী। ভীড় ঠেলে তিনি দ্রুত ওগুলোকে পানি পান করিয়ে নিয়ে এলেন। তারপর পশুগুলো ওদের হাতে তুলে দিয়ে আবার গাছতলায় এসে বসলেন। খুত পিপাসায় জঠর জ্বলছে। সাপ্তাহ খানেক না খেয়ে আছেন। আর কাহাঁতক না

খেয়ে থাকা যায়? তাই দুহাত তুললেন মালিকের কাছে। বললেন : 'আমার মালিক! এখন তুমি যে আতিথেয়তাই আমাকে দান করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী।'

আশ্রয় দিলেন হৃদয়বানে

আল্লাহই তো অসহায়ের সহায়, আশ্রয়হীনের আশ্রয়দাতা। তিনি মূসার দু'আ কবুল করলেন। মূসা চোখ তুলতেই দেখতে পেলেন, সেই দুই যুবতীর একজন বাড়ি থেকে ফিরে আসছে মূসার দিকে। মেয়েটি অত্যন্ত ভদ্র। লজ্জায় আনত ধীর পদক্ষেপে সে মূসার কাছে এসে বললো : 'আমার বাবা আপনাকে ডাকছেন। আপনি যে আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়েছেন, তিনি আপনাকে তার পারিশ্রমিক দেবেন।'

মূসা পারিশ্রমিক পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের উপকার করেননি। তিনি করেছেন আল্লাহর ওয়াস্তে। কিন্তু এখন যেহেতু তাঁর খাদ্যের প্রয়োজন, আশ্রয়ের প্রয়োজন, সেজন্যে তিনি ভাবলেন, ঐ বৃদ্ধ লোকটির কাছে গেলে তিনি হয়তো কোনো সাহায্য সহযোগিতা পেতে পারেন। তাই তিনি মেয়েটির পিতার কাছে রওয়ানা করলেন।

তাঁর বাড়িতে এসে মূসা দেখেন, তিনি একজন অশিতিপর বৃদ্ধ। তাঁর চেহারায় সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও বুযুর্গীর জ্যোতি দীপ্তিমান। ওখানকার লোকেরা স্বার্থপর। নিজের স্বার্থ উদ্ধার ছাড়া আর কিছুই বুঝেনা। তাই মূসার পরোপকারের জন্যে সম্মানিত করতেই তিনি তাকে ডেকেছেন। মূসাকে দেখে তিনি বুঝতে পারলেন, এ নিশ্চয়ই কোনো সম্মানিত লোকের সন্তান। মূসার চেহারায় তিনি দেখতে পেলেন সততা ও প্রখর বিবেক বুদ্ধির দীপ্তি। মূসা যে ভিনদেশী, তাও তিনি বুঝতে পারলেন। বুঝতে পারলেন, সে বিপদগ্রস্ত।

তিনি মূসাকে নির্ভয় দেখিয়ে কি কারণে ভিনদেশে এসেছে তা খুলে বলতে বলেন। মূসা দেখলেন, লোকটি অত্যন্ত বিশ্বস্ত, তাই সবকথা তাঁর কাছে খুলে বললেন। সব ঘটনা শুনে বৃদ্ধ বললেন, ভয় করোনা, তুমি এখন অত্যাচারী ফেরাউনের আওতামুক্ত। তুমি নির্ভয়ে আমার এখানে থাকতে পারো।

কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, এই বৃদ্ধ ছিলেন মহান নবী হযরত শুয়াইব আলাইহিস্ সালাম।

মূসা কিছুদিন বৃদ্ধের ওখানে থাকলেন। বৃদ্ধ যুবক মূসার সততা, বুদ্ধিমত্তা, শক্তি সামর্থ এবং দীনি ও জাগতিক জ্ঞান দেখে অভিভূত হন। মূসা আর বেশি দিন বৃদ্ধের ওখানে থেকে তাঁকে কষ্ট দিতে সংকোচ বোধ করলেন। বৃদ্ধ এবং তাঁর কন্যারা মূসার সংকোচবোধের বিষয়টি অনুভব করেন। বৃদ্ধ তাঁর কন্যাদের সাথে পরামর্শ করলেন কিভাবে ওর উপকার করা যায়? একটি কন্যা বললো : বাবা,

'ওকে আপনার এখানে চাকুরি দিয়ে দিন। কর্মচারী হিসেবে তো তার মতো বলবান ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিই উত্তম।' মেয়ের এই সুন্দর প্রস্তাবটি বৃদ্ধের খুবই পছন্দ হলো।

বৃদ্ধ বৈঠক খানায় এসে মূসাকে বললেন, দেখো বাবা, আমি তোমাকে একটি প্রস্তাব দিতে চাই। মূসা খুশি হয়ে বললেন, অবশ্যি দিন। বৃদ্ধ বললেন : "আমি এভাবে তোমার উপকার করতে চাই, তোমার কাছে আমার একটি মেয়ে বিয়ে দেবো। তবে তোমাকে আমার এখানে আট বছর চাকুরি করতে হবে। আর যদি দশ বছর পুরো করে দাও, সেটা তোমার ইচ্ছা। তুমি আমাকে সৎ সমঝোতাকামী লোক হিসেবেই পাবে।"

বৃদ্ধের প্রস্তাব শুনে মূসা মনে মনে আল্লাহর শোকর আদায় করলেন। ভাবলেন, মহান আল্লাহই তার জন্যে এ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বৃদ্ধকে জবাব দিলেন : আপনার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করলাম। দুটি মেয়াদের যে কোনো একটি মেয়াদ পর্যন্ত আমি আপনার এখানে চাকুরি করবো। আর আমরা যে অংগীকারে আবদ্ধ হলাম, আল্লাহই তার রক্ষক।

বৃদ্ধ চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন, যেহেতু তাঁর ঘরে যুবতী মেয়ে আছে, তাই কিভাবে মূসাকে আশ্রয় দিয়ে উপকার করবেন? এখন এই পন্থায় সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো। আল্লাহ মূসার জন্যে উত্তম আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলেন।

চললেন আবার মিশর পানে

মাদইয়ানে এসে মূসা শুধু আশ্রয়ই পেলেন না, স্ত্রী পেলেন, চাকুরি পেলেন এবং এক মহান ব্যক্তিত্বকে শ্বশুর ও গার্জিয়ান হিসেবে পেলেন।

এখানে তিনি আট বছর অথবা দশ বছর কাটান। এরি মধ্যে মিশরেও ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে। ফেরাউন দ্বিতীয় রিমসিসের মৃত্যু হয়েছে। এখন ফেরাউনের আসনে রয়েছে রিমসিসের পুত্র মিনফাতা। এদিকে শ্বশুরের সাথে স্থিরকৃত মেয়াদও মূসা শেষ করলেন। তিনি ভাবলেন, এবার মিশরে ফিরে যাই। সেখানে গিয়ে জুশান এলাকায় মায়ের কাছে থাকবো। তাছাড়া বর্তমান ফেরাউন হয়তো আমার ব্যাপারে খুব একটা খোঁজ খবর নেবেনা। আমার কথা তারা ভুলেও থাকতে পারে।

মিশরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে মূসা শ্বশুরের নিকট থেকে বিদায় নিলেন। স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদের নিয়ে রওয়ানা করলেন। প্রচণ্ড শীতের মওসুম। মরু প্রান্তরের পথ। পথঘাটও নেই খুব একটা চেনা জানা। সূর্য ডুবে রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে। এতোক্ষণে তিনি এসে পৌছেছেন সিনাই পর্বতের দক্ষিণ পাদদেশে।

সেকালে এ পাহাড়ের নাম ছিলো 'তুর পাহাড়'। রাতের অন্ধকারে পথও দেখছেননা। বাচ্চারাও কাঁপছে শীতে। প্রয়োজন একটু আগুনের, একটু আলোর এবং পথের দিশা লাভ করার।

পাশেই 'তোয়া' উপত্যকা। সেদিকে তাকাতেই মূসা দেখলেন, সেখানে যেনো আগুন দেখা যাচ্ছে। তিনি তাঁর পরিজনকে বললেন: "তোমরা একটু দাঁড়াও। আমি একটি আগুন দেখেছি। হয়তো তোমাদের পোহাবার জন্যে এক আধটি অংগার নিয়ে আসতে পারবো, অথবা আগুনের কাছে গেলে হয়তো পথের সন্ধান পাবো। কোন্ দিকে আমাদের যেতে হবে, সেখবর নিয়ে আসতে পারবো।"

একথা বলে মূসা স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদের ওখানে রেখে একাই আগুনের দিকে অগ্রসর হলেন।

'আমি আল্লাহ বলছি'

দৃশ্যমান আলোটির কাছাকাছি পৌঁছুতেই উপত্যকার ডানদিকের পবিত্র স্থানটির একটি গাছ থেকে মূসা শুনতে পেলেন সুমধুর আওয়াজ, পরম স্নেহের ডাক : "হে মূসা! আমি তোমার প্রভু বলছি, আমি বিশ্বজগতের মালিক আল্লাহ বলছি! তুমি পবিত্র তোয়া উপত্যকায় এসে পৌছেছো। সুতরাং পায়ের জুতা খুলে ফেলো। আর শুনো! আমি তোমাকে (আমার রসূল) মনোনীত করেছি। গভীর মনোযোগ সহকারে আমার নির্দেশ শুনো : আমি আল্লাহ। আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। কাজেই শুধুমাত্র আমারই আনুগত্য ও হুকুম পালন করো। আর আমাকে স্মরণ করার জন্যে সালাত কায়েম করো। কিয়ামত অবশ্যি অনুষ্ঠিত হবে, যাতে করে প্রত্যেকটি মানুষ তার কর্মতৎপরতা ও চেষ্টা সাধনার প্রতিদান পেতে পারে। তবে কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে সেটা আমি গোপন রাখতে চাই। যারা সেই দিনটির প্রতি বিশ্বাস রাখেনা এবং নিজেদের নফ্স ও প্রবৃত্তির দাসত্ব করে, তারা যেনো তোমাকে সেই পরকালীন মুক্তির চিন্তা থেকে ফেরাতে না পারে।" (সূরা তোয়াহা : ১১-১৬, সূরা কাসাস : আয়াত ৩০)

মূসা ক্ষণিক পূর্বেও ভাবতে পারেননি, এ আলোটির কাছে এসে তিনি নবুয়্যত ও রিসালাত লাভ করবেন। আসলে নবুয়্যত চাওয়া ও আশা করার জিনিস নয়। আল্লাহ যাকে তাঁর এই মহান নিয়ামত দান করেন, তিনি অপ্রত্যাশিতভাবেই তা লাভ করেন।

অপ্রত্যাশিতভাবে মূসা যখন সরাসরি মহান আল্লাহর কথা শুনতে পেলেন, তখন তাঁর মনে যে কী আবেগ সৃষ্টি হয়েছিল, তা কি আপনারা কল্পনা করতে পারেন? একদিকে মহান আল্লাহ তাঁর সাথে কথা বলছেন এই আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা, অপরদিকে রিসালাতের বিরাট দায়িত্বের কথা চিন্তা করে প্রকম্পিত হয়ে উঠে মূসার মন। আবেগ ও কম্পমান হৃদয়ে রব্বুল আলামিনের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মূসা! তিনি অনুভব করছেন, তিনি যেনো মহান আল্লাহর সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন। যদিও তিনি আল্লাহকে দেখছেন না, কিন্তু অতি নিকট থেকেই, নিকটের ঐ জ্যোতির্ময় গাছটির আড়াল থেকেই তিনি নিজ কানে শুনে চলেছেন স্বয়ং রব্বুল আলামিনের অমিয় বাণী। তাঁর হৃদয়ের গভীরে অটুট মতিহারের মতো গেঁথে যাচ্ছে মহান মনিবের প্রতিটি বাক্য।

মূসা তোমার ডান হাতে কী?

আল্লাহ মূসাকে নিজের রসূল মনোনীত করলেন। প্রাথমিক নির্দেশ দান করলেন তাঁকে। আল্লাহ প্রেমিক মূসা পরম আগ্রহ নিয়ে বিনিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আল্লাহর হুকুমের সামনে। অপেক্ষা করছেন তিনি পরবর্তী নির্দেশের। সামনের সেই মোহময় আলো থেকে আওয়াজ ভেসে এলো :

"মূসা! তোমার ডান হাতে কী?"

মূসার হাতে ছিলো একটি মজবুত লাঠি। আল্লাহ তো দেখছেনই তাঁর হাতে লাঠি। তবু কেন জানতে চাইলেন? শিক্ষক যখন ছাত্রকে কোনো কিছু সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞান দান করতে চান, তখন সেটির প্রতি ছাত্রের মনোযোগ নিবদ্ধ করার জন্যে সেটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। ছাত্র তখন নিজের সেই একান্ত জানা জিনিসটির প্রতি মনোযোগী হয়ে যায়। আগ্রহের সাথে সেটির পরিচয় বলে। শিক্ষক যখন দেখেন, ছাত্রের মন সেটির প্রতি পুরোপুরি নিবিষ্ট হয়েছে, তিনি তখন সেটি সম্পর্কে তাকে যা কিছু জানাতে চান, তা বলে দেন। আল্লাহও তাই করলেন। তিনি এখন মূসার মনকে তার লাঠির প্রতি নিবিষ্ট করাতে চান। এ লাঠির মাধ্যমে তাঁকে দান করতে চান বিশেষ মু'জিযা। সেজন্যেই করলেন এ প্রশ্ন 'মূসা! তোমার ডান হাতে কী?'

মূসার জীবনের সেই পরম সুযোগটি এলো। এখন তিনি তাঁর মহামনিব ও মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সাথে কথা বলবেন। তিনি পরম আবেগ ও আনন্দে বলে উঠলেন : 'এটি আমার লাঠি।'

এটুকু বলে মূসার সাধ মিটলনা। তিনি ভাবলেন, এইতো সুযোগ। এ সুযোগে মহান আল্লাহর সাথে আরেকটু কথা বলে নিই। তাই তিনি বলে চললেন : "আমি এটির উপর ভর দিয়ে চলি। এটি দিয়ে ছাগলের জন্যে পাতা পাড়ি, এছাড়া এর সাহায্যে আমি আরো অনেক কাজ করি।"

মূসার মন যখন লাঠির প্রতি পুরোপুরি নিবিষ্ট হলো, এবার আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিলেন : 'লাঠিটি ছুঁড়ে ফেলো।' লাঠি ছুঁড়ে ফেললেন মূসা মাটিতে। সাথে সাথে লাঠি হয়ে গেলো এক বিরাট অজগর। অজগর নড়াচড়া দিয়ে উঠেছে, দৌড়িয়ে আসছে। ভয় পেয়ে গেলেন মূসা। বিরাট সাপকে দৌড়ে আসতে দেখলে কে না ভয় পায়? সাপকে তার দিকে দৌড়ে আসতে দেখে তিনি পিছিয়ে যেতে থাকলেন। সাথে সাথে আল্লাহ ডেকে বললেন : "মূসা, ভয় পেয়োনা। আমার রসূলরা ভয় পায়না। এগিয়ে এসে ওটিকে ধরো। তুমি ধরলেই ওটি আবার লাঠি হয়ে যাবে। তোমার কোনো ক্ষতি হবেনা। তুমি নিরাপদ।"

আল্লাহর নির্দেশ পাবার সাথে সাথে মূসা নির্ভীক হয়ে গেলেন। তিনি এগিয়ে এসে খপ করে অজগরটাকে ধরে ফেললেন। মূসার হাত সেটির গায়ে লাগতেই

সেটি আবার লাঠি হয়ে গেলো। মূসা পরম স্বস্তি লাভ করলেন আল্লাহর কুদরত দর্শন করে। মহান আল্লাহ মূসাকে এই মুজিযাটি বুঝিয়ে দেবার পর আবার নির্দেশ দিলেন : "তোমার হাত বুকের দিক থেকে বগলে ঢুকিয়ে চেপে ধরো। দেখবে কোনো অসুবিধা ছাড়াই হাত উজ্জ্বল হয়ে বের হবে।"

মূসা বগলে হাত ঢুকিয়ে বের করতেই দেখলেন তা জ্যোতির্ময় হয়ে গেছে।

এবার যাও ফেরাউনের কাছে

এবার আল্লাহ মূসাকে বললেন, এ দুটি হলো তোমার জন্যে আমার পক্ষ থেকে নিদর্শন বা মু'জিযা। তোমাকে যে আমার রসূল নিয়োগ করলাম, সেই নিদর্শন, সেই প্রমাণ। এই দুটির সাথে আল্লাহ মূসাকে আরো সাতটি নিদর্শন দিলেন। মোট নয়টি নিদর্শন দিয়ে তিনি মূসাকে বললেন, এগুলো নিয়ে তুমি চলে যাও ফেরাউনের কাছে। কারণ সে বিদ্রোহী তাগুত হয়ে গেছে। তারা তোমাকে আমার রসূল মানতে না চাইলে এই প্রমাণগুলো দেখাবে। ব্যাস্, এখন তুমি চলে যাও। ফেরাউন, তার প্রধানমন্ত্রী হামান এবং তার অন্যান্য খোদাদ্রোহী নেতাদেরকে আমার দাসত্ব করার আহ্বান জানাও। আর তাকে বনি ইসরাঈল অর্থাৎ মুসলমানদের উপর নির্যাতন বন্ধ করতে বলো।

আমার দুটি নিবেদন শুনো

আল্লাহ যখন রিসালাতের মিশন নিয়ে ফেরাউনের কাছে যাবার নির্দেশ দিলেন, তখন মূসার স্মৃতিতে ভেসে উঠলো অতীতের সমস্ত তিক্ত ইতিহাস। তিনি আল্লাহর কাছে নিবেদন করলেন :

হে আল্লাহ! তোমার নির্দেশ তো অবশ্যি অলংঘনীয়। তবে তুমি আমার দুটি কথা শুনো। আমার বিরুদ্ধে ওদের একটি মার্ডার কেস (হত্যা মামলা) আছে। আমার সে অপরাধটি যদিও তুমি আমাকে মাফ করে দিয়েছো, কিন্তু ওরাতো আমাকে মাফ করেনি। ওরা তো আমাকে হত্যা করার জন্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তুমিতো জানো, সেকারণেই আমি এতোদিন পলাতক ছিলাম। আমার আশংকা হয় ওরা আমাকে অস্বীকার করবে এবং আমাকে হত্যা করবে। তাছাড়া তুমিতো জানো আমার মুখে জড়তা আছে। আমার বক্তব্য স্পষ্ট হয়না। হারুণ আমার বড় ভাই। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাষী, অনর্গল বক্তা। তাছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে ওদের কোনো অভিযোগও নেই। সুতরাং প্রভু! তুমি হারুণকেও আমার সাথে রসূল বানিয়ে দাও, তাকে আমার উযির বানিয়ে দাও। যাতে করে আমরা দু'জনে মিলে তোমার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানত্ব ঘোষণা দিতে পারি এবং বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারি। আর তুমি আমার হৃদয় মনের দুয়ার খুলে দাও। আমার সাহস বাড়িয়ে দাও। আমার মুখের জড়তা দূর করে দাও। যাতে করে আমার কথা তারা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে।

আল্লাহ বললেন : 'মূসা! তোমার সমস্ত নিবেদন মঞ্জুর করা হলো।' এর মানে-

১. ফেরাউনরা আল্লাহর নবী হযরত মূসার রসূল হবার দাবিকে মিথ্যা প্রমাণ করতে পারবেনা।
২. মূসাকে হত্যা করতে পারবেনা।
৩. মূসার মুখে আর কোনো জড়তা ও তোতলামি থাকবেনা।
৪. মূসা প্রভাবশালী ও আকর্ষণীয় বক্তব্য রাখতে পারবেন।
৫. মূসা সব সময় সাহসী ও নির্ভিক থাকবেন।
৬. ভাই হারুণকেও রসূল নিয়োগ করা হবে।
৭. হারুণ মূসার উযির হিসেবে কাজ করবেন।

সবগুলো দু'আ কবুল করায় মূসা মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে আল্লাহর রসূল হিসেবে মূসা বাহাদুরের মতো এগিয়ে চললেন মিশরের দিকে।

ঘরের ছেলে ফিরে এলো ঘরে

এদিকে মহান আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হারুণের কাছেও অহি পাঠান। তাঁকেও রিসালাত দান করেন। তাঁকেও তাঁর দায়িত্বের কথা অবহিত করেন। মূসা যে মিশরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেছেন, সে খবরও জানিয়ে দেন। তাছাড়া তাঁকে যে মূসার উযির হিসেবে কাজ করতে হবে সে কথাও তাঁকে জানিয়ে দেন।

মূসা ফিরে আসছে, এ খবর জেনে পরিবারের সবাই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেন। অধীর আগ্রহে তাঁর অপেক্ষা করছেন, কখন এসে পৌঁছুবে মূসা? হারুণের কাছে অহি আসায় ঘরের লোকেরা অনেকগুলো অজানা বিষয় জানতে পারলেন। তারা জানতে পারলেন :

১. মূসা বেঁচে আছেন।
২. তিনি ফিরে আসছেন।
৩. তাঁর পূর্ব পুরুষ ইবরাহিম, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইউসুফের মতো মহান আল্লাহ তাঁকে রসূল নিযুক্ত করেছেন।
৪. তাঁর আবেদনক্রমে আল্লাহ হারুণকেও রসূল নিয়োগ করেছেন।
৫. আল্লাহ তাকে ফেরাউনের ও তার অত্যাচারী বাহিনীর কবল থেকে বনি ইসরাঈলকে উদ্ধার করার দায়িত্ব দিয়েছেন।

পরিবারের লোকেরা এই আনন্দের কথাগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনায় মগ্ন। এক গভীর রাত্রে কেউ যেনো দরজার কড়া নাড়লো। হারুণ বুঝে ফেলেছেন কে এসেছে! তিনি দৌড়ে এসে খুলে দিলেন দরজা। দুই ভাই মুখোমুখি! মূসা ও হারুণ বুকে জড়িয়ে ধরলেন এক ভাই আরেক ভাইকে। ভাই ফিরে পেলেন

ভাইকে। মা ফিরে পেলেন কলিজার টুকরা পুত্রধনকে। ঘরের ছেলে ফিরে এসেছে ঘরে। ঐ ঘরের লোকদের হৃদয়ে যে তখন আনন্দের কি জোয়ার এসেছিল, তা কি আপনারা ভাবতে পারেন?

ফেরাউনের দরবারে মূসা

এবার ফেরাউনের সামনে উপস্থিত হবার পালা। ফেরাউনের সামনে উপস্থিত হতে হবে দাওয়াত আর দাবি নিয়ে। ক্ষমতায় এখন দুর্ধর্ষ ফেরাউন মিনফাতা। চরম স্বৈরাচার ও একনায়ক মিনফাতা। গোটা মিশর সাম্রাজ্যের একটি লোকও তার সামনে কথা বলার সাহস রাখেনা। কারণ ঘাতক স্বৈরাচারের ত্রাসে সব মানুষ আতংকিত। মানুষের জীবনের কোনো মর্যাদা তার কাছে নেই।

এই স্বৈরাচারীর সামনে গিয়েই মূসাকে দাঁড়াতে হবে। তাকে বলতে হবে আল্লাহর পথে আসার কথা। তাকে বলতে হবে বনি ইসরাঈলের উপর নির্যাতন বন্ধের কথা। ফেরাউনের সামনে উপস্থিত হবার পূর্বক্ষণে অহি এলো। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে দেয়া হলো কিভাবে কথা বলতে হবে, সে টেকনিক:

"মূসা! তুমি সময় মতোই এসে পৌঁছেছো। আমি তো তোমাকে আমার কাজের জন্যে তৈরি করে নিয়েছি। এখন তুমি আর তোমার ভাই আমার নিদর্শনগুলোসহ ফেরাউনের কাছে যাও। সেখানে বলিষ্ঠভাবে আমার কথা বলতে ত্রুটি করোনা। তবে কোমল ও নম্র ভাষায় তাকে দাওয়াত দিও। তোমরা দাওয়াত দিলে সে হয়তো দাওয়াত গ্রহণ করবে, না হয় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে।" (সূরা ২০ তোয়াহা : আয়াত ৪০-৪৪)

দুই ভাই বললেন : 'আমাদের প্রভু! আমাদের ভয় হয় সে আমাদের সাথে বাড়াবাড়ি করবে, অথবা আমাদের উপর চড়াও হবে।'

আল্লাহ বললেন : 'তোমাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি সবকিছু শুনছি এবং দেখছি। ওরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরাই বিজয়ী হবে।'

সিংহাসনে বসে আছে ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গ। নির্ভীক মূসা এসে প্রবেশ করলেন প্রাসাদে। সাথে ভাই হারুণ। তারা সোজা এসে উপস্থিত হলেন ফেরাউনের সামনে।

আমি আল্লাহর রসূল

শুরু হলো কথোপকথন। মূসা বললেন : নিখিল জগতের প্রভু আমাদের দুই ভাইকে তাঁর রসূল নিযুক্ত করেছেন। আপনি কি সংশোধন ও পরিশুদ্ধির নীতি অবলম্বন করতে আগ্রহী? আমি কি আপনাকে আপনার প্রভুর পথ বলে দেবো? যাতে করে আপনি তাঁর প্রতি বিনীত হতে পারেন? আর বনি ইসরাঈলকে মুক্ত করে দিন এবং তাদেরকে আমাদের দায়িত্বে ন্যস্ত করুন। তাদের উপর আর

নির্যাতন চালাবেন না। আপনি সঠিক পথে আসুন, আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হবে। অহির মাধ্যমে আমাদের জানানো হয়েছে, ঐ ব্যক্তির জন্যে নির্ঘাত শাস্তি রয়েছে, যে বিশ্বজগতের প্রভুকে অস্বীকার করবে এবং তাঁর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে।

ফেরাউন : মূসা! তোমাদের প্রভু আবার কে?

মূসা : আমাদের প্রভু তিনি, যিনি প্রতিটি জিনিসকে সৃষ্টি করেছেন অতপর তার চলার পথ ঠিক করে দিয়েছেন। আকাশ, পৃথিবী এবং মহাবিশ্বের সবকিছুর তিনিই মালিক, প্রভু ও পরিচালক।

ফেরাউন : তোমরা শুনছো, মূসা এগুলো কি বলছে?

মূসা : আল্লাহই আপনাদের এবং আপনাদের পূর্ব পুরুষদের প্রভু!

ফেরাউন : তোমাদের কাছে প্রেরিত এই রসূলটিতো দেখছি একেবারেই পাগল!

মূসা : পূর্ব পশ্চিম এবং এই উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর আল্লাহই প্রভু। আপনাদের যদি বিবেক থাকতো তবে একথাগুলো সহজেই বুঝতে পারতেন।

ফেরাউন : মূসা! তুমি যখন ছোট ছিলে, তখন আমাদের এখানে কি আমরা তোমাকে লালন পালন করিনি? তোমার জীবনের বেশ ক'টি বছর কি আমাদের এখানে কাটাওনি? তারপর যে অপরাধটি করেছো, তাতো করেছই। অথচ তুমি এখন আমাকে বাদ দিয়ে অন্যকে প্রভু মানছো। তুমি বড় অকৃতজ্ঞ।

মূসা : সেই (হত্যার) অপরাধটি যখন আমি করেছিলাম তখন তো আমি সঠিক পথের সন্ধান পাইনি। ফলে আমি আপনাদের ভয়ে পালিয়ে চলে গিয়েছিলাম। অতপর আমার প্রভু আমাকে জ্ঞান দান করেন এবং তাঁর রসূল নিযুক্ত করেন। আমার সেই অপরাধটিও তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর আমার প্রতি যে অনুগ্রহের কথা আপনি বলছেন, তার মূল কারণ তো হলো, আপনারা বনি ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করে রেখেছেন।

ফেরাউন : আমাদের অতীতের লোকেরা তো তোমার এসব কথা শুনেনি। তাদের কি অবস্থা হবে?

মূসা : তাদের বিষয়ে আমার প্রভু অবহিত আছেন। তাদের অবস্থা তাঁর কাছে লিপিবদ্ধ আছে। আমার প্রভু ভুল করেন না, ভুলেও যাননা।

ফেরাউন বার বার মূসার শানিত যুক্তির সামনে হেরে যাচ্ছে, ঠাঁই পাচ্ছে না। খেই হারিয়ে ফেলছে। এবার দিশা মিশা না পেয়ে ফেরাউন গর্জে উঠে বললো :

'মূসা! তুমি যদি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকেও ইলাহ মানো, তবে আমি অবশ্যি তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করবো।' .

মূসা : আমি যদি সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখাতে পারি?

ফেরাউন : বেশ, তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে নিদর্শন দেখাও।

মূসা লাঠি নিক্ষেপ করলেন। সাথে সাথে লাঠি বিরাট অজগরে পরিণত হলো। তারপর সেটাকে ধরে ফেললেন এবং তা পুনরায় লাঠি হয়ে গেলো। বগলের ভিতর থেকে হাত টেনে বের করলেন, সাথে সাথে তা জ্যোতির্ময় হয়ে উঠলো।

এই অলৌকিক ঘটনা দেখে ফেরাউন হতভম্ব হয়ে গেলো। উপস্থিত লোকদের বিভ্রান্ত করার জন্যে এবার সে বলে উঠলো : এতো যাদু! মূসা নিশ্চয়ই একজন দক্ষ যাদুকর হয়ে এসেছে। যাদু দিয়ে সে তোমাদেরকে নিজেদের মাতৃভূমি থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইছে। তোমরাই বলো, এই মিশর সাম্রাজ্যের মালিক কি আমি নই? এইসব নদ নদী কি আমার নিচে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছেনা? আমিই তো তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রভু। এখন তোমরাই বলো একে নিয়ে কি করা যায়?

যাদুর খেলা হোক

ফেরাউনের মোসাহেবরা তাকে পরামর্শ দিলো, মূসাকে যাদু দিয়েই পরাজিত করতে হবে। মিশরে যেসব দক্ষ যাদুকর আছে এমন পাকা যাদুকর আর কোথাও নেই। মূসার সাথে যাদু প্রতিযোগিতার দিনক্ষণ ঠিক করুন। আর এদিকে মিশরের সব দক্ষ যাদুকরদের খবর দিন। জনসমক্ষে যাদুর খেলা হবে। আমাদের দক্ষ যাদুকরদের কাছে মূসা পরাজিত হয়ে যাবে। তখন মানুষ তার প্রতি সমর্থন ত্যাগ করবে এবং আপনার প্রভুত্বকে চ্যালেঞ্জ করার আর কেউ থাকবেনা।

মূসার দাবি যে অযৌক্তিক নয় এবং মূসার দেখানো নিদর্শনসমূহ যে যাদু নয়, ফেরাউন কিন্তু তা ঠিকই বুঝেছিল। সে কারণেই সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল এবং নিজের ক্ষমতা থাকে কিনা সে চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছিল। ডুবন্ত ব্যক্তি যেমন খড়কুটা যা পায়, তা ধরেই বেঁচে থাকতে চায়, ফেরাউনের অবস্থাও এখন তাই হয়েছে। সে তার মোসাহেবদের সেই আত্মঘাতি পরামর্শটি গ্রহণ করলো। তারপর মূসাকে এসে বললো :

"মূসা! তুমি কি এজন্যে ফিরে এসেছো যে, তোমার যাদুর জোরে আমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেবে? আমরাও তোমার মতো যাদু দেখিয়ে তোমার মোকাবেলা করতে চাই। তুমিই বলো কবে এবং কোথায় সে মোকাবেলা হবে? এই মোকাবেলা থেকে তুমি কিন্তু পিছপা হতে পারবেনা। আমরাও পিছপা হবো না। এটা আমাদের এবং তোমার মাঝে পাকাপোক্ত অংগীকার। খোলা ময়দানে মোকাবেলায় এসে যাও।" (সূরা ২০ তোয়াহা : আয়াত ৫৭-৫৮)

সামনেই ছিলো মিশরের একটি জাতীয় উৎসবের দিন। প্রতি বছরই সে তারিখে এক বিরাট মেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং মিশরের লোকেরা সেই উৎসবে দলে দলে সমবেত হয়। মূসা ফেরাউনের প্রস্তাবকে এক মোক্ষম সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলেন। বললেন, ঠিক আছে মোকাবেলা হবে। তবে এর জন্যে আলাদা দিন তারিখের কোনো প্রয়োজন নেই। সামনেই যে উৎসব ও মেলার দিন আছে,

সেদিনই এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। সুতরাং এ প্রতিযোগিতার কথা ঘোষণা করে দেয়া হোক। লোকজন যেনো সকাল থেকেই সমবেত হতে থাকে। এ প্রসংগে মূসা ফেরাউনকে আবারো সাবধান করে দিয়ে বললেন : "সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হবার পরও আপনারা সেটাকে যাদু বলছেন? আমার প্রদর্শিত এসব নিদর্শন কি যাদু? যাদুকররা তো কখনো জিতেনা, সফলকাম হয়না!" (সূরা ১০ ইউনুস : আয়াত ৭৭)

একথা শুনে ফেরাউন আরো ভীত শংকিত হয়ে পড়লো। অস্থির চিত্তে সে বলে উঠলো : 'তুমি কি আমাদেরকে আমাদের পূর্ব পুরুষদের পথ থেকে ফিরাতে এসেছো? আর দুই ভাই মিলে দেশের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব দখল করতে এসেছো? আমরা তোমাদের মানিনা।' (সূরা ১০ ইউনুস : আয়াত ৭৮)

একথা বলে ফেরাউন তার পারিষদবর্গকে ডাকলো। তাদের নির্দেশ দিলো, সারাদেশের দক্ষ যাদুকরদের খবর দাও, মেলার দিন যাতে সকাল সকাল তারা হাজির হয়ে যায়।

মু'জিযা ও যাদুর প্রতিযোগিতা

মু'জিযা হলো নবীদেরকে দেয়া আল্লাহর নিদর্শন। নবীরা যে আল্লাহর প্রেরিত তার প্রমাণ হিসেবে তাঁরা মু'জিযা প্রদর্শন করেন। আর যাদু হলো একটা তামাশা। এতে তামাশাবাজি করে মানুষের চোখকে ফাঁকি দেয়া হয়। মু'জিযা হলো অকাট্য সত্য নিদর্শন আর যাদু হলো ফাঁকিবাজি, মিথ্যা ও ধোকা।

আজ মিশরের জাতীয় উৎসবের দিন। আজ জাতীয় মেলার দিন। সেই সাথে মিশরের ইতিহাসে আজ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সম্রাট এবং সম্বলহীনের মাঝে জয় পরাজয়ের প্রতিযোগিতা। সচোক্ষে এই প্রতিযোগিতা দেখার জন্যে মানুষ সকাল থেকেই দলে দলে হাজির হতে লাগলো। দেখতে দেখতে বিশাল মাঠ হয়ে গেলো লোকে লোকারণ্য। হাজির হয়েছে একনায়ক ফেরাউন মিনফাতা। হাজির হয়েছে তার মন্ত্রী হামান, কারুণ। হাজির হয়েছে তার পারিষদবর্গ। হাজির হয়েছে দেশের সমস্ত দক্ষ যাদুকর। হাজির হয়েছে হাজারো লাখো আবাল বৃদ্ধ নারী আর পুরুষ।

জমকালো মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন মূসা ও হারুণ। উপস্থিত হয়েছে জাঁদরেল যাদুকর দল। সমস্ত মানুষ উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছে কখন শুরু হবে প্রতিযোগিতা? আর দেরি নয়, প্রতিযোগিতা এখনই শুরু হবে। কিন্তু আল্লাহর রসূল মূসা শেষ বারের মতো মিশরবাসীকে সতর্ক করা প্রয়োজন মনে করলেন। দাঁড়িয়েই তিনি প্রদান করলেন এক মর্মস্পর্শী ভাষণ। তিনি বললেন :

"দুর্ভাগ্য অপেক্ষা করছে তোমাদের জন্যে। সাবধান! তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করোনা। এখনো সময় আছে আল্লাহর দিকে ফিরে এসো। তা নাহলে কঠিন আযাব দিয়ে তিনি তোমাদের ধ্বংস করে দেবেন।" (সূরা তোয়াহা : ৬১)

মূসার ভাষণ শুনে শোরগোল শুরু হয়ে গেলো। কেউ মূসার পক্ষে চলে এলো। কেউ বলতে লাগলো ফেরাউনের পক্ষে। অবস্থা দেখে ফেরাউনের মন্ত্রীদের মাঝেও দেখা দিলো মতভেদ। পরিস্থিতি কিভাবে সামাল দেবে, তাই নিয়ে বেধে গেলো তাদের মাঝে বাদানুবাদ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে ফেরাউন দিলো এক বক্তৃতা। সে বললো : "ভাইসব! এরা দুই ভাই যাদুকর ছাড়া আর কিছু নয়। তারা তাদের যাদু দিয়ে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইছে। তারা তোমাদের সম্মান মর্যাদা কেড়ে নিতে উদ্যত হয়েছে। (হে যাদুকররা) তোমরা তোমাদের সমস্ত কুটকৌশল একত্র করে এগিয়ে এসো এদের মোকাবেলায়। জেনে রেখো, আজ যে পক্ষ জিতবে তারাই হবে সফলকাম।" (সূরা ২০ তোয়াহা : আয়াত ৬৩-৬৪)

যাদুকররা এগিয়ে এলো। ওরা তো যাদু দেখায় পয়সার জন্যে। তারা ভাবলো বড় দান আদায় করার এটাই মোক্ষম সময়। তাই তারা ফেরাউনকে বললো, আমরা জিতলে আমাদের পয়সা কড়ি কী দিবেন? ফেরাউন বললো : 'তোমাদের অনেক পারিশ্রমিক দেবো। তাছাড়া তোমাদেরকে আমার সভাসদ বানিয়ে নেবো।' পয়সার আশ্বাস পেয়ে যাদুকররা এবার মূসার কাছে এসে বললো : "যাদু আপনি আগে নিক্ষেপ করবেন, নাকি আমরাই আগে নিক্ষেপ করে দেখাবো?"

মূসা বললেন, তোমরাই আগে নিক্ষেপ করো। যাদুকররা নিয়ে এসেছিল অনেক দড়ি আর লাঠি। তারা বিভিন্ন কলাকৌশল দেখিয়ে বললো, ফেরাউনের মান সম্মানের শপথ, আমরা অবশ্যি বিজয়ী হবো। তখন তাদের রশি আর লাঠিগুলো সাপের মতো নড়ে চড়ে উঠলো। মূসা এবং উপস্থিত সকলের চোখ যাদু দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গেলো। তাই তারা দেখতে পেলো সাপগুলো নড়ছে আর দৌড়াচ্ছে।

এরা ছিলো মিশরের সব পাকা যাদুকর। তারা তাদের জানা সমস্ত যাদু ওখানে প্রদর্শন করলো। মূসা যখন ওদের প্রচণ্ড যাদুর খেলা দেখলেন, তখন তিনি আশংকা করলেন, জনগণ আবার ওদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে না পড়ে। আল্লাহ মূসাকে জানিয়ে দিলেন, আশংকার কোনো কারণ নেই, তুমিই বিজয়ী হবে। তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো।

লাঠির মুজিযা প্রদর্শন করার পূর্বক্ষণে মূসা যাদুকরদের বললেন :

"তোমরা যা কিছু প্রদর্শন করলে ওগুলো তো যাদু। আল্লাহ অবশ্যি তোমাদের এসব যাদু নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কাজকে আল্লাহ কখনো সার্থক করেননা। অপরাধীদের জন্যে যতোই অসহনীয় হোকনা কেন, আল্লাহ তাঁর নিদর্শন দ্বারা অবশ্যি সত্যকে সত্য বলে প্রমাণ করে দেবেন।" (সূরা ১০ ইউনুস : আয়াত ৮১-৮২)

একথাগুলো বলে মূসা তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলেন। সাথে সাথে লাঠি এক বিরাট আজদাহা অজগর হয়ে হা করে উঠলো। চোখের নিমিষে সে খেয়ে ফেললো যাদুকরদের প্রদর্শিত সব যাদু। শুধু কি তাই? যাদুকরদের যাদু দেখাবার সব ক্ষমতাও সে খেয়ে ফেললো। অনেক চেষ্টা তদবির করেও তারা আর কোনো যাদু দেখাতে পারলোনা। সব যাদুকর কুপোকাত!

আমরা ঈমান আনলাম

মূসা যে যাদুকর নন, তিনি যে সত্যি আল্লাহর নবী যাদুকররা এ মহাসত্য উপলব্ধি করলো। সত্য তাদের কাছে দিনের আলোর মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। মহান আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন দেখে তারা তাঁর মহিমা অনুভব করলো। তাদের বিবেক জেগে উঠলো। সাথে সাথে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দরবারে তারা সাজদায় লুটিয়ে পড়লো। ফেরাউন ও উপস্থিত জনতার সামনে তারা বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা দিলো : "আমরা নিখিল বিশ্বের মালিক মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম, যিনি মূসা ও হারুণের প্রভু।" (সূরা ২৬ আশ শোয়ারা : আয়াত ৪৬-৪৮)

মূসা যে সর্বশক্তিমান আল্লাহর রসূল সেকথা প্রমাণ হয়ে গেলো। জনগণ মূসার জয়গান গাইতে শুরু করলো। ফেরাউন চরমভাবে পরাজিত হলো। গোটা জাতির সামনে সে অপদস্ত ও অপমানিত হলো। পরাজয় ও অপমানের ক্ষোভে তার ভেতরে জ্বলে উঠলো প্রতিহিংসার আগুন।

তোমরা মূসার শিষ্য

যাদুকরদের পরাজয়ের ফলে ফেরাউনের চরম পরাজয় হলো। মূসা যে যাদুকর নন, তিনি যে আল্লাহর নবী সেকথা বিবেক বুদ্ধিওয়ালা কোনো ব্যক্তিরই আর বুঝতে বাকি থাকলো না। সেই সাথে যাদুকরদের ঈমান গ্রহণের ফলে পরিস্থিতির রূপই পাল্টে গেলো। জনমত মূসার পক্ষে চলে এলো। ঈমান আনার জন্যে বহুলোক প্রস্তুত হয়ে গেলো।

ফেরাউন একদিকে পরাজিত হবার কারণে চরম অপমান অপদস্থ বোধ করলো। অপরদিকে যাদুকরদের ঈমান আনার ফলে তার সবটুকু ভাবমূর্তি শেষ হয়ে গেলো। জনগণের কাছে সে হেয় ও লাঞ্ছিত হলো। তাছাড়া জনমত মূসার পক্ষে চলে গেলো। এখন যে তার রাজ তখ্‌তই নড়ে উঠলো। এধরনের অবস্থা সৃষ্টি হলে সব খোদাদ্রোহী স্বৈরাচারীরাই দুটি অপকৌশল অবলম্বন করে :

এক : বিভ্রান্তি ছড়িয়ে জনমতকে নিজের পক্ষে আনার চেষ্টা করে।

দুই : অত্যাচার নির্যাতন ও নিপীড়নের পথে অগ্রসর হয় এবং এভাবে গায়ের জোরে জনমতকে দাবিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

নিজের অবস্থা বেগতিক দেখে তাগুত ফেরাউনও এ দুটি পথই বেছে নিলো। সে যাদুকরদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিলো :

১. আমার অনুমতি ছাড়াই তোমরা মূসার খোদার প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয়ই মূসা তোমাদের গুরু। সেই তোমাদেরকে যাদু শিখিয়েছে। তোমরা মূসার শিষ্য। তোমরা গুরু শিষ্য মিলে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে তার মালিকদেরকে হটিয়ে দিতে ষড়যন্ত্র করে এসেছো। তোমরা দেশদ্রোহী।

২. এখন আমি তোমাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করাচ্ছি এবং খেজুর গাছের কাণ্ডে তোমাদের শূলবিদ্ধ করাচ্ছি। শীঘ্রি তোমরা জানতে পারবে, আমার আর মূসার মধ্যে কার শাস্তি বেশি কঠিন আর স্থায়ী?

অর্থাৎ ফেরাউন এটাকে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করলো এবং যাদুকরদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে জনগণকে ভীত সন্ত্রস্ত করে দিলো।

আল্লাহ আমাদের প্রভু

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে যাদুকরদের অন্তর হিদায়াতের আলোতে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠলো। মূসার মাধ্যমে তারা যে মহাসত্যের সন্ধান পেলো, তার আলোতে তাদের হৃদয়মন উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। কুরআনে একস্থানে আল্লাহ বলেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ তার অন্তরকে সত্য সঠিক পথে পরিচালিত করেন।" (সূরা ৬৪ আত তাগাবুন : আয়াত ১১)

ঈমান আনার ফলে আল্লাহ এই যাদুকরদের অন্তরকেও সঠিক পথে পরিচালিত করেন। ফেরাউনের চরম অত্যাচার নির্যাতন ও মৃত্যুদণ্ডের মুখেও তারা সত্যের উপর অটল থাকেন। অত্যাচারী শাসকের সামনে তাঁরা সত্যের নির্ভীক ঘোষণা দেন। 'জীবন দেবো ঈমান দেবোনা' বলিষ্ঠ কণ্ঠে তারা ফেরাউনকে এই যে কথাগুলো বলেছিলেন কুরআনে সেগুলো এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে :

১. আল্লাহই আমাদের প্রভু। তোমার দেয়া মৃত্যুদণ্ডে আমাদের কোনো পরোয়া নেই। আমরা তো আমাদের প্রভুর কাছেই পৌঁছে যাবো। (সূরা ২৬ আশ শোয়ারা : আয়াত ৫০)

২. আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে আমরা যে অপরাধ করেছিলাম, আমরা আশা করি তিনি আমাদের সে অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। কারণ আমরাই সবার আগে ঈমান এনেছি। (সূরা ২৬ আশ শোয়ারা : আয়াত ৫১)

৩. সেই মহান সত্তার কসম, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, সত্য পরিষ্কার হয়ে যাবার পর (হে ফেরাউন!) আমরা কিছুতেই তোমাকে গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিতে পারিনা। (সূরা ২০ তোয়াহা : আয়াত ৭২)

৪. তোমার যা খুশি করতে পারো। তুমিতো বড়জোর আমাদের পার্থিব জীবনের ব্যাপারে ফায়সালা নিতে পারো, এর চাইতে বেশি কিছু তুমি করতে পারবেনা। (সূরা ২০ তোয়াহা : আয়াত ৭২)

৫. আমরা আমাদের প্রভুর প্রতি ঈমান এনেছি। আমরা আশা করি, তুমি যে

আমাদের যাদু দেখাতে বাধ্য করেছিলে, সে অপরাধ আমাদের প্রভু আমাদের ক্ষমা করে দেবেন। (সূরা ২০ তোয়াহা : আয়াত ৭৩)

৬. তোমার বাহাদুরি তো ক্ষণস্থায়ী, অথচ আল্লাহ হলেন উত্তম, মহান, চিরন্তন ও চিরস্থায়ী। (সূরা ২০ তোয়াহা : আয়াত ৭৩)

৭. আমরা আমাদের প্রভুর সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখে তা মেনে নিয়েছি বলে তুমি আমাদের থেকে প্রতিশোধ নিচ্ছো। তিনিই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। হে আমাদের প্রভু! আমাদের দৃঢ়তা দান করো এবং তোমার অনুগত অবস্থায় আমাদের ওফাত দান করো। (সূরা ৭ আ'রাফ : আয়াত ১২৬)

ফেরাউনের যাদুর প্রতিযোগিতায় পরাজয় এবং ঈমান আনার পর তার মুখের উপর যাদুকরদের এসব ঘোষণা ফেরাউনকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও অপমানিত করে দিলো। জনগণ বুঝতে পারলো ফেরাউন আসলে প্রতারক, আর মূসাই সত্য ধর্মে আছেন।

শুরু হলো ফেরাউনি নিপীড়ন

ঈমান আনার কারণে যাদুকরদের থেকে প্রতিশোধ নিলে কি হবে, ঈমানের আগুন তো ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে। যাদের বিবেক বুদ্ধি আছে, তারা মিথ্যাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে পারেনা। সত্য প্রমাণিত হয়ে যাবার পর সত্যের পক্ষেই তারা এসে থাকে। বনি ইসরাঈল পূর্ব থেকেই নবীর উম্মত ছিলো। কিন্তু ফেরাউনের অত্যাচারের ভয়ে তারাও মূসার দলে যুক্ত হতে ভয় পাচ্ছিল।

তবে যাদুকরদের দীপ্ত ঈমানের বলিষ্ঠতা দেখে বেশ কিছু যুবকের অন্তরে ঈমানের অগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। তারা ঈমানের ঘোষণা দিয়ে মূসার সাথি হয়ে গেলো। তাদের উপরও শুরু হলো নির্যাতন। অত্যাচারের স্টীম রোলার চালানো হয় তাদের উপর। মূসার বংশের লোক হবার কারণে গোটা বনি ইসরাঈলের উপরও নির্যাতন নিপীড়ন নেমে আসে।

নবীরা কিন্তু কোনো অত্যাচার নির্যাতনের সামনেই দীনের কাজে গাফলতি দেখাতে পারেন না। হযরত মূসা এবং তাঁর যুবক সাথিদের ফেরাউনি নির্যাতন দীনের কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। তাদের অব্যাহত তৎপরতা দেখে ফেরাউনের পারিষদবর্গ তাকে বললো : "দেখুন, আপনি যদি মূসা আর তার অনুগামীদের এভাবে ছেড়ে দিয়ে রাখেন, তাহলে তারা দেশের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ছাড়বে এবং তারা আপনার আর আপনার দেবতাদের উপাসনা পরিত্যাগ করেই চলবে। আপনি এদের আর কতোদিন অবকাশ দেবেন?" (সূরা ৭ আ'রাফ : আয়াত ১২৭)

ফেরাউন ঘোষণা করে দিলো : 'ওদের পুত্রদের হত্যা করা হোক আর কন্যাদের জীবিত রাখা হোক। তারা দেখে নিক আমি কতটা শক্তিশালী।'

আল্লাহর উপর ভরসা করো

নির্যাতনে নিষ্পিষ্ঠ হতে হতে মূসা আলাইহিস সালামের অনুসারীরা বিচলিত হয়ে উঠলো। হযরত মূসা তাদের বললেন : "তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহর উপর ঈমান এনে থাকো, তাহলে তাঁর উপর ভরসা করো।"

মূসার উপদেশে মু'মিন যুবকরা বললো : "আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এই যালিমদের নির্যাতনের শিকারে পরিণত করোনা। দয়া করে তুমি এই কাফিরদের অত্যাচার থেকে আমাদের মুক্তি দাও।" (সূরা ১০ ইউনুস : আয়াত ৮৪-৮৬)

বনি ইসরাঈলিদের প্রবীণরা এসে হযরত মূসার কাছে অভিযোগ করলো : "মূসা! তোমার জন্মের আগে একবার আমরা নির্যাতিত হয়েছি। এখন তুমি নবী হয়ে আসার পর আবার নির্যাতিত হচ্ছি।"

হযরত মূসা বললেন : "তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং আল্লাহর পথে অটল হয়ে থাকো। পৃথিবীর মালিক তো আল্লাহ। তিনি যাকে যান তাকেই এর উত্তরাধিকারী বানান। আর চূড়ান্ত সাফল্য তারাই লাভ করবে, যারা আল্লাহকে ভয় করে। সুতরাং তোমরা দৃঢ়তা অবলম্বন করো। তোমাদের প্রভু তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করে দেবেন। তোমাদের তিনি পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন। তারপর তোমরা কেমন কাজ করো তা তিনি দেখবেন।" (সূরা ৭ আ'রাফ : আয়াত ১২৮-১২৯)

বনি ইসরাঈল মুসলিম হলেও তারা বিজাতির গোলামি করতে করতে কর্মের দিক থেকে ইসলাম থেকে দূরে সরে পড়ে। ইসলামি নেতৃত্বের অভাবে ইবাদতের ব্যাপারে তারা গাফিল হয়ে পড়ে। বিশেষ করে নামাযের ব্যাপারে তারা সবচেয়ে বেশি অলসতা দেখায়। আল্লাহ হযরত মূসার কাছে অহির মাধ্যমে নির্দেশ পাঠালেন :

"আমি মূসা ও তার ভাইকে নির্দেশ দিলাম : মিশরে তোমাদের কওমের জন্যে কিছু গৃহের সংস্থান করো আর ঐ ঘরগুলোকে কিবলা বানিয়ে নিয়ে সালাত কায়েম করো এবং ঈমানদারদের দাও সুসংবাদ। (সূরা ইউনুস : আয়াত ৮৭)

এ থেকে বুঝা গেলো, নির্যাতন নিপীড়নের মাত্রা বেড়ে গেলে সালাত আদায়ের প্রতি মনোযোগের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে হয়। কারণ এরূপ ভয়ংকর পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের দুটি জিনিসের বিনিময়েই সাহায্য প্রদান করেন। একটি হলো সবর (দৃঢ়তা) আর অপরটি হলো সালাত। মহান আল্লাহ বলেন : "তোমরা সাহায্য চাও সবর ও সালাতের মাধ্যমে।"

ফেরাউনের ধূর্তামি

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সময় থেকেই মিশরে ইসরাঈলি এবং মিশরীয় মুমিনদের ধারা চলে আসছে। অবশ্য মুমিনরা ছিলো সংখ্যালঘু। কিন্তু

মূসা আলাইহিস সালামের মর্মস্পর্শী দাওয়াতের ফলে মুমিনদের সংখ্যা কিছু কিছু করে বাড়তে শুরু করে। হকপন্থী লোকেরা সত্যের পথে না এসে পারেনা। অবশ্য ফেরাউনি নির্যাতনের ভয়ে লোকেরা যেভাবে দলে দলে এগিয়ে আসার কথা সেভাবে আসতে পারছিলনা। তা সত্ত্বেও গোপনে এবং প্রকাশ্যে কিছু কিছু লোক ইসলামের পথে আসছেই। আর এ কারণে ফেরাউনের গা জ্বালা বাড়ছেই। সে দেখলো যতোই অত্যাচার নির্যাতন চালাচ্ছে, মূসার দল দিন দিন ভারি হচ্ছে। তাই এবার সে একটা নতুন ফন্দি করলো। সে বললো :

"হে আমার সভাসদরা! তোমাদের সংশয়ের কোনো কারণ নেই। আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো খোদা আছে বলে আমি জানিনা। এ ব্যাপারে আমি তোমাদের সন্দেহ দূর করে দিচ্ছি। হে হামান! ইট পুড়িয়ে আমার জন্যে উঁচু এক প্রাসাদ তৈরি করো। মূসার খোদা যদি থেকেই থাকে, তবে সেখানে উঠলেই দেখা যাবে। আসলে মূসার সব কথা ভূয়া, সে কট্টর মিথ্যাবাদী।" (সূরা ২৮ আল কাসাস : আয়াত ৩৮)

ফেরাউনের এই বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, জনগণের মাঝে তো ইসলামের সাড়া পড়ে গিয়েছিল, সেই সাথে ফেরাউনের সভাসদদের মাঝেও কিছু লোক ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। আর ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়া লোকদের বিভ্রান্ত করার জন্যেই ফেরাউন উঁচু প্রাসাদ তৈরি করেছিল। কিন্তু কখনো কি শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায়? যারা একবার সত্যকে উপলব্ধি করেছেন, ফেরাউন কিছুতেই তাদের বিভ্রান্ত করতে পারলনা।

আসলে ফেরাউন বারবারই এরকম ধূর্তামি করেছে। সে কেবল মূসা আলাইহিস সালামের দাওয়াত এবং মু'জিযাকেই উপেক্ষা করেনি, তার হিদায়াতের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমূহ থেকেও সে শিক্ষা গ্রহণ করেনি। সর্বত্রই সে বাঁদরামি করেছে। এ ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহর বক্তব্য শুনুন :

"ফেরাউনের লোকদের আমি কয়েক বছর দুর্ভিক্ষ আর ফসলহানিতে আক্রান্ত করেছি এ উদ্দেশ্যে, হয়তো তাদের চেতনা ফিরে আসবে। কিন্তু তাদের অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, সুসময় ফিরে এলে তারা বলতো এটাতো আমাদের প্রাপ্য। আর দুঃসময় এলে এর জন্যে মূসা আর তার সাথিদের কুলক্ষণে গণ্য করতো। অথচ তাদের কুলক্ষণ তো ছিলো আল্লাহর কাছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বুঝতোনা। তারা মূসাকে বললো : আমাদের যাদু করার জন্যে তুমি যে কোনো নিদর্শনই আনো না কেন, আমরা তোমার কথা মেনে নেবনা। অবশেষে আমি তাদের উপর দুর্যোগ পাঠালাম, পংগপাল লেলিয়ে দিলাম, উকুন ছড়িয়ে দিলাম, ব্যাঙের উপদ্রব সৃষ্টি করে দিলাম এবং রক্ত বর্ষণ করলাম। এসব নিদর্শন আলাদা আলাদা করে দেখালাম। কিন্তু তারা অহংকারে মেতে রইলো।

আসলে তারা ছিলো বড়ই অপরাধপ্রবণ লোক। যখনই তাদের বিপদ আসতো তারা মূসাকে বলতো : হে মূসা! তোমার প্রভুর কাছে তুমি যে মর্যাদার অধিকারী তার ভিত্তিতে তুমি আমাদের জন্যে দু'আ করো। এবার যদি তুমি আমাদের থেকে বিপদটা দূর করে দাও, তাহলে আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনবো আর বনি ইসরাঈলকে তোমার সাথে পাঠিয়ে দেবো। কিন্তু আমি যখনই তাদের উপর থেকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে বিপদ সরিয়ে নিতাম অমনি তারা তাদের সেই অংগীকার ভংগ করতো।" (সূরা ৭ আল আ'রাফ : আয়াত ১৩০-১৩৫)

এই হলো ইসলামের শত্রুদের ধূর্তামি। হযরত মূসা যখন লাঠির মুজিযা দেখাতেন, লাঠি যখন অজগর হয়ে ফেরাউনের দিকে 'হা' করতো, ফেরাউন তখন ভয়ে চিৎকার করে বলতো : 'মূসা বাঁচাও! এই বিপদ থেকে রক্ষা করলেই আমি তোমার কথা মেনে নেবো।' কিন্তু মূসা যখন অজগরটিকে লাঠিতে পরিণত করতেন, অমনি ফেরাউন প্রতিশ্রুতি ভংগ করতো। সব যুগেই ইসলামের শত্রুরা ইসলামের বাহকদের সাথে এভাবে ধূর্তামি করে আসছে এবং সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করেছে।

আমাকে ছাড়ো মূসাকে হত্যা করি

এভাবে ফেরাউনের ধূর্তামি, ভণ্ডামি আর ষড়যন্ত্র বেড়েই চললো। আল্লাহর নবীর মর্মস্পর্শী আবেদন-আহ্বান, অকাট্য মুজিযা এবং প্রাকৃতিক আযাব কোনো কিছুতেই সে সত্য পথে এলোনা। তার হঠকারিতার মাত্রা দিন দিন বাড়ছেই। এ অবস্থার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ পাক বলেন :

"আমি মূসাকে আমার পক্ষ থেকে নিদর্শনসহ ফেরাউন আর তার সভাসদদের কাছে পাঠিয়েছিলাম। মূসা গিয়ে বলেছিল : আমি বিশ্বজগতের মালিকের রসূল। সেই সাথে সে আমার দেয়া নিদর্শনগুলো পেশ করেছিল। কিন্তু তারা হাসাহাসি করে বিদ্রূপ করলো। আমি তাদের একের পর এক নিদর্শন দেখাতে থাকলাম। এর প্রত্যেকটা ছিলো আগেরটার চেয়ে বড়। আমি তাদের আযাবের মধ্যেও নিপতিত করলাম, যাতে করে তারা হঠকারিতা থেকে ফিরে আসে। প্রত্যেক আযাবে নিপতিত হবার পরই তারা মূসাকে বলতো : হে যাদুকর! তোমার মনিবের পক্ষ থেকে তুমি যে মর্যাদা লাভ করেছো, তার ভিত্তিতে আমাদের মুক্তির জন্যে দু'আ করো। এবার রক্ষা পেলে আমরা সঠিক পথে এসে যাবো। কিন্তু আমি যখনই তাদের উপর থেকে আযাব সরিয়ে নিতাম, তারা তাদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করতো। একদিন ফেরাউন তার কওমের সামনে হুংকার দিয়ে বললো : হে জনগণ! মিশরের রাজত্ব কি আমার নয়? এসব নদী-নালা কি আমার অধীনে প্রবাহিত হচ্ছে না? তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছনা? আমিই কি উত্তম নই? না কি এই হীন নগণ্য (মূসা)? সে তো নিজের বক্তব্যও ঠিকমতো

বলতে পারেনা। সে যদি রসূলই হয়ে থাকবে তার কাছে আকাশ থেকে সোনার কংকন কেন পাঠানো হলোনা? কিংবা আরদালি হিসেবে দলে দলে ফেরেশতা কেন আসলোনা? এভাবে ফেরাউন তার জাতির লোকদের বিবেক বুদ্ধি বিলুপ্ত করে দিলো আর তারা তারই আনুগত্য করলো।" (সূরা ৪৩ যুখরুফ : আয়াত ৪৬-৫৩)

এভাবে অবস্থা যখন চরমে পৌঁছালো, ফেরাউন আর তার অনুসারীদের সত্যপথে আসবার আর কোনো সম্ভাবনাই থাকলোনা, তখন আল্লাহর নবী মূসা ও তাঁর ভাই হারুণ আল্লাহর দরবারে বিনীত আরয করলেন :

"হে আমাদের প্রভু। তুমি ফেরাউন আর তার নেতৃবৃন্দকে দুনিয়ার জীবনের শান শওকত ও ধন দৌলত দান করেছো। হে আমাদের মালিক! একি এজন্যে যে, তারা মানুষকে তোমার পথ থেকে বিপথে সরিয়ে দেবে? ওগো প্রভু! এদের ধন সম্পদ ধ্বংস করে দাও। আর তাদের অন্তরকে এমনভাবে মোহরাঙ্কিত করে দাও, যাতে কঠিন শাস্তি ভোগ না করা পর্যন্ত তারা ঈমান না আনে। (সূরা ১০ ইউনুস : আয়াত ৮৮)

হযরত মূসার দু'আ আল্লাহ কবুল করলেন। তবে দু'আ থেকে বুঝা যায়, ফেরাউনরা নবী আর নবীর অনুসারীদের বিরুদ্ধে কতো চরম বাড়াবাড়ি করছিল। উপরে ফেরাউনের যে বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে তা থেকেও বুঝা যায়, এখন আর ফেরাউনের পায়ের তলায় মাটি নেই। সে এখন পাগলা কুকুরের মতো ক্ষেপে উঠেছে। মানুষকে মূসার ব্যাপারে ভীত সন্ত্রস্ত করছে, বিভ্রান্ত করছে। আর মূসার সাথিদের উপর তো অকথ্য নির্যাতন চালিয়েই যাচ্ছে।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছেনা। মূসা যে আগুন জ্বালিয়েছেন মানুষের অন্তরে, তা যে কিছুতেই নিভছেনা! এ তো ঈমানি আগুন! দাউ দাউ করে জ্বলছে মুমিনদের অন্তরে। যতো আসছে অত্যাচার নির্যাতনের বান তুফান, ততোই মুমিনদের অন্তরে জ্বলে উঠছে ঈমানের লেলিহান শিখা।

ফেরাউন দেখলো, পুরুষদের হত্যা করে, সবাইকে চরম অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে ভয়ভীতি দেখিয়ে বিভ্রান্ত করে কোনোই কাজ হচ্ছেনা। সে ভাবলো, গাছের গোড়া কেটে দিলেই সব ঝামেলা চুকে যায়। যে করেই হোক মূসাকে হত্যা করলেই নিভে যাবে সব আগুন। কিন্তু একাজটি করতে ফেরাউন প্রথম থেকেই ভয় পেয়ে আসছিল। সে ভয় পাচ্ছিল-

১. মূসা আলাইহিস সালামের মুজিযাকে, আল্লাহ প্রদত্ত তাঁর অলৌকিক শক্তিকে।

২. বনি ইসরাঈল ব্যাপকভাবে মূসার নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল। এখনতো মূসা বিশ লাখ বনি ইসরাঈলের নেতা। মূসাকে হত্যা করলে তারা যদি সংগঠিত হয়ে বিদ্রোহ করে বসে।

এসব ভয়ে ফেরাউন এতো দিন মূসাকে হত্যা করার চিন্তা করতে পারেনি। এখন নিজের অবস্থা সাংঘাতিক বেগতিক দেখে ফেরাউন এই চরম পদক্ষেপের দিকে অগ্রসর হলো। কুরআনের ভাষায় :

"ফেরাউন তার সভাসদদের বললো : তোমরা আমাকে ছাড়ো, আমি মূসাকেই হত্যা করবো, সে তার প্রভুকে ডেকে দেখুক, তার প্রভু তাকে বাঁচাতে পারে কিনা? আমার আশংকা হয়, মূসা তোমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা পাল্টে দেবে, কিংবা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।" (সূরা ৪০ আল মু'মিন : আয়াত ২৬)

ফেরাউনের হত্যার ঘোষণা শুনেই হযরত মূসা বলে উঠলেন : "যেসব হঠকারী লোক বিচার দিনের প্রতি ঈমান রাখেনা, আমি তাদের মোকাবেলায় আমার এবং তোমাদেরও মালিক মহান আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি।" (সূরা ৪০ মু'মিন: আয়াত ২৭)

নির্ভীক এক মুমিনের তীব্র প্রতিবাদ

নবীর আহ্বানে ফেরাউনের সভাসদদের মধ্যেও কেউ কেউ গোপনে ঈমান আনেন। কৌশলগত কারণে নিজের ঈমান আনার কথা প্রকাশ না করে ফেরাউনের পারিষদবর্গের অন্তর্ভুক্ত থেকে যান। কিন্তু এখন যখন চরম মুহূর্তটি এলো। ফেরাউন যখন মূসাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলো, তখন কি আর কোনো মুমিন চুপ থাকতে পারেন?

মূসাকে হত্যা করার ঘোষণা দেবার সাথে সাথে ফেরাউনের একজন প্রভাবশালী সভাসদ উঠে দাঁড়ালেন। ইনি একজন মিশরীয়, ফেরাউনেরই বংশধর, তিনি গোপনে গোপনে আগেই ঈমান এনেছিলেন। এই মর্দে মু'মিন দাঁড়িয়েই ফেরাউনের মুখের উপর মূসাকে হত্যা করার সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। পারিষদের সভাতেই প্রতিবাদ, পরামর্শ, আল্লাহর প্রতি আহ্বান এবং মর্মস্পর্শী উপদেশে পরিপূর্ণ এক আবেগোদ্দীপ্ত ভাষণ প্রদান করলেন তিনি। মহান আল্লাহ তাঁর সে ভাষণ কুরআনে উল্লেখ করেছেন। আপনারা কি শুনতে চান তাঁর সে ভাষণটি? তবে শুনুন। তিনি ভাষণ দিলেন :

"আল্লাহ আমার প্রভু শুধু একথাটি বলার কারণেই কি তোমরা একজন মহাপুরুষকে হত্যা করবে? অথচ তিনি তো তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শন নিয়ে এসেছেন। তোমরা যে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলছো, তিনি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকলে তাঁর মিথ্যার দায় দায়িত্ব তো তাঁর। কিন্তু তিনি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকেন, তবে যেসব ভয়ংকর পরিণতির কথা তিনি বলছেন তার কিছুটা হলেও তো গ্রাস করবে তোমাদের। আল্লাহ সীমালংঘনকারী মিথ্যাবাদীদের সঠিক পথ দেখাননা।"

"হে আমার জাতির ভাইয়েরা! আজ তোমরা রাজত্বের অধিকারী এবং এই ভূখণ্ডের বিজয়ী শক্তি। কিন্তু আল্লাহর আযাব এসে পড়লে আমাদের সাহায্য করার কে আছে?"

ফেরাউন (মর্দে মুমিনের ভাষণের মাঝখানে বলে উঠলো) : "আমি যে পথ ভালো মনে করছি সে পথই তোমাদের দেখাচ্ছি আর আমি তো তোমাদের সঠিক পথই দেখাচ্ছি।"

মর্দে মুমিন : "হে আমার জাতির ভাইয়েরা! আমি আশংকা করছি, তোমাদের উপর সেরকম আযাব না এসে যায়, যে রকম আযাব এসেছিল ইতোপূর্বে (নিজেদের নবীকে অস্বীকার ও অমান্য করার কারণে) বিভিন্ন জাতির উপর। যেমন এসেছিল নূহের, আদ, সামুদ এবং তাদের পরবর্তী জাতিসমূহের উপর। আর একথা জেনে রেখো, আল্লাহ্ কখনো তাঁর দাসদের প্রতি অবিচার করেননা।"

"হে আমার জাতি! আমি আশংকা করছি, তোমাদের উপর এমন একটি সময় এসে পড়বে, যখন তোমরা ফরিয়াদ করবে, অনুশোচনা করবে, একে অপরকে ডাকতে থাকবে আর দৌড়ে পালাতে থাকবে, কিন্তু তখন আল্লাহর পাকড়াও থেকে তোমাদের বাঁচাবার কেউ থাকবেনা।"

"ইতোপূর্বে সুস্পষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শন নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছিলেন আল্লাহর নবী ইউসুফ। তোমরা তাঁর আনীত শিক্ষার ব্যাপারেও সন্দেহ পোষণ করেছিলে। তাঁর মৃত্যুর পর তোমরা বলেছিলে : এখন আর আল্লাহ্ কোনো রসূল পাঠাবেননা। তোমরা আল্লাহর নিদর্শনের ব্যাপারে বিরোধ করছো। অথচ তোমাদের মতের সপক্ষে তোমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই।"

"হে আমার জাতির ভাইয়েরা! আমার কথা মেনে নাও। আমি তো তোমাদের সঠিক পথ দেখাচ্ছি।"

"ভাইয়েরা আমার! এই পার্থিব জীবন তো মাত্র কয়েক দিনের। পক্ষান্তরে আখিরাত হলো চিরন্তন, চিরদিন অবস্থানের স্থান। যে এখানে মন্দ কাজ করবে, ওখানে সে অনুরূপ প্রতিফল পাবে। পক্ষান্তরে এখানে নারী পুরুষ যেই পরিশুদ্ধি কাজ করবে, আখিরাতে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তারা জীবিকা লাভ করবে অফুরন্ত, অগণিত।"

"ভাইয়েরা আমার! কি হলো, তোমাদের বিবেক কেন জাগ্রত হয়না? আমি তোমাদের ডাকছি মুক্তির দিকে। অথচ তোমরা আমাকে ডাকছো আগুনের দিকে। আমাকে তোমরা ডাকছো আল্লাহকে অস্বীকার করতে এবং ঐসব জিনিসকে তাঁর প্রতিপক্ষ বানাতে যাদের বিষয়ে আমাদের কিছুই জানা নেই। আমি তোমাদের ডাকছি মহাশক্তিধর পরম ক্ষমাশীল মহান আল্লাহর দিকে।"

"তোমরা আমাকে যাদের দিকে ডাকছো, তাদের না পৃথিবীতে প্রভুত্ব করার অধিকার আছে, আর না পরকালে আছে কর্তৃত্বের অধিকার। আমাদেরকে তো ফিরে যেতে হবে মহান আল্লাহর কাছে। সেখানে সীমা লংঘনকারীরা নিক্ষিপ্ত হবে আগুনে। এর কোনো ব্যতিক্রম হতে পারেনা। আমার কথাগুলো তোমরা অচিরেই স্মরণ করবে। আমার জীবন মৃত্যুর বিষয়টা আমি আল্লাহর উপর ছেড়ে দিচ্ছি। তিনি অবশ্যি তাঁর দাসদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।" (সূরা ৪০ আল মুমিন : আয়াত ২৮-৪৪)

মিশর ছাড়ো হিজরত করো

ফেরাউন যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর অনুসারীদের আর কিছুতেই সহ্য করতে পারলোনা, এমন কি হযরত মূসাকে হত্যা করার কথা ঘোষণা করতেও দ্বিধা করলোনা, তখন উভয় পক্ষের মধ্যে সৃষ্টি হলো চরম উত্তেজনা। পরিস্থিতি একেবারে নাজুক। ফেরাউন পারিষদের যে মুমিন ব্যক্তি এতোদিন ঈমান গোপন রেখেছিলেন, হযরত মূসাকে হত্যা করার ঘোষণা শুনে তিনিও গর্জে উঠলেন। তবে নবীগণ পথ চলার নির্দেশ লাভ করেন আল্লাহর কাছ থেকে। এই চরম সংকট মুহূর্তে মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে রিপোর্ট পেশ করলেন : "আল্লাহ! এরা চরম অপরাধী হয়ে গেছে।" (সূরা দুখান : ২২)

এবার আল্লাহর কাছ থেকে মূসার নিকট নির্দেশ এলো :

"মূসা! এখন আমার বান্দাদের নিয়ে মিশর থেকে রাতারাতি বের হয়ে পড়ো। আর মনে রেখো, ওরা তোমাদের পিছু ধাওয়া করবে।" (সূরা দুখান : ২৩, সূরা শোয়ারা : ৫২, সূরা তোয়াহা : ৭৭)

আল্লাহর নির্দেশ শিরোধার্য। হযরত মূসা মুসলমানদের ঘরে ঘরে সংগোপনে খবর পাঠিয়ে দিলেন হিজরত করার প্রস্তুতি নিতে। কোন্ রাত্রে ঠিক কোন্ সময় বেরিয়ে পড়তে হবে, তাও তিনি জানিয়ে দিলেন সব ঘরে।

যে কথা সে কাজ। নির্দিষ্ট রাতের নির্দিষ্ট সময় চুপেচাপে বেরিয়ে পড়লো মূসার সাথিরা। সবাই এক জায়গায় এসে একত্রিত হলো। তারপর আল্লাহর নবী হযরত মূসার নেতৃত্বে দলেবলে তারা এগিয়ে চললেন ফিলিস্তিনের সিনাই ভূ-খণ্ড অভিমুখে। কিন্তু সামনেই লোহিত সাগর। এ সাগর পাড়ি দিয়েই ওপারে যেতে হবে তাদের। এসময় হযরত মূসার সাথিদের সংখ্যা ছিলো বিশ লক্ষ। তাঁদের সাথে ছিলো নারী, পুরুষ, শিশু এবং বনি ইসরাঈল ছাড়াও মিশরীয় মুসলমানগণ।

ফেরাউন বাহিনী পিছু নিলো

এদিকে ফেরাউনের গোয়েন্দা বাহিনী বসে নেই। মুসলমানদের বেরিয়ে পড়ার বিষয়টি তারা টের পেয়ে গেলো। সাথে সাথেই খবর পৌছলো ফেরাউনের

কানে। সে বিচলিত হয়ে উঠলো। সে ভাবলো আমাকে না জানিয়েই মূসা এদের নিয়ে বেরিয়ে গেলো? যেতে দেবনা, ওদের পাকড়াও করবো। এরা এভাবে সরে পড়লে তো আমি বোকা বনে যাবো। এসব ভেবে ফেরাউন তার উজির, নাজির, সৈন্য সামন্ত নিয়ে মুসলমানদের আক্রমণ করার জন্যে বিরাট বাহিনী সাথে করে বেরিয়ে পড়লো। তাদের বেরিয়ে পড়ার ছবি এঁকেছে কুরআন এভাবে :

"তারা ছেড়ে এলো শত শত বাগ-বাগিচা, মনোরম উদ্যান, নহর আর ঝর্ণাধারা, ক্ষেত খামার, ফল ফসল আর জমকালো প্রাসাদ। রেখে এসেছে হাজারো ভোগের সামগ্রী, যেগুলো নিয়ে ফুর্তিতে মেতে থাকতো তারা দিনরাত।" (সূরা ৪৪ দুখান : আয়াত ২৫-২৭)

লাঠি মারো সমুদ্রে

হযরত মূসা তাঁর সংগি সাথিদের নিয়ে তাঁদের পৈতৃক ভূমি (বর্তমান) ফিলিস্তিন অভিমুখে চলছেন। মিশর থেকে বের হবার জন্যে তিনি যে পথ ধরলেন, সেপথে সামনে অগ্রসর হয়েই তারা পৌঁছে গেলেন লোহিত সাগরের তীরে। এখন চারদিকে মহাবিপদ তাদের ঘিরে ফেললো। সম্মুখে সমুদ্র আর পেছন দিক থেকে ধেয়ে আসছে ফেরাউন আর তার সুসজ্জিত সৈন্য বাহিনী। লোকেরা পিছে তাকাতেই দেখতে পেলো ধামাঢোল পিটিয়ে এগিয়ে আসছে ফেরাউন বাহিনী।

মূসা আলাইহিস সালামের সাথে যেমন ছিলেন পাকা মুমিনেরা তেমনি ছিলো দুর্বল মুমিন আর নামের মুসলমানেরা। তারা চিৎকার করে মূসা আলাইহিস সালামকে বলতে লাগলো: 'মূসা, ফেরাউনের সৈন্য-বাহিনী এখনই আমাদের ধরে ফেলবে, মেরে ফেলবে, পিষে ফেলবে।' ফেরাউন বাহিনী যতোই কাছে আসতে থাকলো, এদের মধ্যে ততোই চিৎকার, আর্তনাদ বাড়তে থাকলো। তাদের চরম সংকটের এই আর্ত চিৎকারের মোকাবেলায় আল্লাহর নবী দৃঢ় চিত্তে তাদের বললেন :

'কখনো নয়, ওরা কিছুতেই আমাদের ধরতে পারবেনা। আমার প্রভু আমার সাথে রয়েছেন। তিনি নিশ্চয়ই আমাকে এ বিপদ থেকে বের হবার পথ দেখাবেন।" (সূরা ২৬ আশ শোয়ারা : আয়াত ৬২)

সাথিদের উদ্দেশ্যে হযরত মূসার এই বলিষ্ঠ ভাষণ শেষ হতে না হতেই তাঁর প্রভু মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে নির্দেশ এলো : 'মূসা! তোমার লাঠি মারো সমুদ্রে।' (সূরা ২৬ আশ শোয়ারা: আয়াত ৬৩)

আপনারা তো আগেই জেনেছেন, মূসার লাঠিটিকে আল্লাহ তা'আলা মু'জিযার লাঠি বানিয়ে দিয়েছিলেন। লাঠিটা তাঁর হাতেই ছিলো। আল্লাহর নির্দেশের সাথে সাথে তিনি লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করলেন। আঘাত লাগতেই সমুদ্রে ঘটে

গেলো এক অবাক কাণ্ড। লোকেরা হতবাক হয়ে গেলো। চোখের সামনে তারা দেখতে পেলো, লাঠির আঘাতে সমুদ্রের পানি ফেটে গেছে। পানিগুলো তরঙ্গের মতো দুই পাশে উঁচু হয়ে পাহাড়ের মতো স্থির হয়ে গেছে। আর সাগরের মাঝখান দিয়ে তৈরি হয়ে গেছে ঠনঠনে শুকনো রাস্তা। আল্লাহর নির্দেশে মূসা ঘোষণা দিলেন এই রাস্তা দিয়ে তোমরা দ্রুত পার হয়ে যাও। ভয় পেয়োনা, ভয়ের কোনো কারণ নেই। একথা বলে মূসা নিজেই যাত্রা করলেন মু'জিযার রাস্তা দিয়ে। তাঁকে অনুসরণ করলো তাঁর লক্ষ লক্ষ সাথি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা পার হয়ে গেলেন নিরাপদে লোহিত সাগর। এভাবেই মহান আল্লাহ সাহায্য করেন তাঁর রসূল এবং মুমিনদের।

মরলো ডুবে দুষ্ট ফেরাউন

এদিকে ফেরাউন তার বাহিনী সমেত এসে পৌছালো লোহিত সাগরের তীরে। সে দেখলো, সাগর শুকিয়ে রাস্তা হয়ে আছে। এ রাস্তা দিয়েই পার হয়ে যাচ্ছে মূসা আর তার সাথিরা। ফেরাউনের সাথিরা এ রাস্তায় পা রাখতে ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু ফেরাউন জিদের বশবর্তী হয়ে ঐ রাস্তায় ঘোড়া চালিয়ে দিলো। মু'জিযার রাস্তা দিয়ে ফেরাউন সদলবলে ধাওয়া করে চললো মূসা আর তার সাথিদের।

কিন্তু আল্লাহ যা চান তাই হয়। আল্লাহর ইচ্ছায় মূসা আর তাঁর সাথিরা ওপারে পৌছে গেছেন। ফেরাউন তার বাহিনী নিয়ে শুকনো সমুদ্র পথের মাঝখানে। এ সময় আল্লাহর নির্দেশে সমুদ্রের পানি হঠাৎ করে তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো। হাবুডুবু খেতে লাগলো ফেরাউন আর তার বাহিনী। ফেরাউন তাকে বাঁচাবার জন্যে চিৎকার করে বলতে লাগলো: "আমি মেনে নিচ্ছি, বনি ইসরাঈল যার প্রতি ঈমান এনেছে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমিও মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হলাম... ।"

এর জবাবে তাকে বলা হলো : "এখন বলছো ঈমান আনার কথা? (এতে কোনো লাভ হবে না) এই ক্ষণিক আগ পর্যন্তও তো তুমি অমান্যই করে আসছিলে আর সৃষ্টি করছিলে ফিতনা ফাসাদ।" (সূরা ১০ ইউনুস: আয়াত ৯০-৯১)

ব্যাস, সাঙ্গ হলো সবকিছু। লাখো লাখো বনি ইসরাঈলের চোখের সামনে ডুবে মরলো তাগুত ফেরাউন আর তার সৈন্য সামন্ত। এভাবেই আল্লাহ সত্য মিথ্যার সংঘাতে সত্যকে করেন বিজয়ী আর মিথ্যাকে করেন বিজিত ও বিনাশ।

রক্ষা পাবে তোমার লাশ

ফেরাউন ডুবে মরার সময় যখন মুসলমান হবার কথা বলছিল, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে একথাও বলে দেয়া হলো : 'আজ তোকে বাঁচাবনা বটে, তবে রক্ষা করবো তোর লাশটাকে।'

হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা তার লাশটাকে রক্ষা করেছেন। আপনাদের কেউ মিশর গেলে কায়রোর যাদুঘরে যাবেন। সেখানে এখনো ফেরাউন মিনফাতার লাশ মমি করা অবস্থায় রয়েছে। ডুবে মরার পর সিনাই উপদ্বীপের পশ্চিমে সাগর তীরে পাওয়া গিয়েছিল তার লাশ। লাশটা যে জায়গায় পাওয়া গেছে, বর্তমানে সে জায়গাটার নাম জাবালে ফেরাউন বা ফেরাউন পর্বত। সেখানে একটি গরম পানির ঝরনা আছে। স্থানীয় লোকেরা এ ঝর্ণার নাম দিয়েছে হাম্মামে ফেরাউন।

১৯০৭ সালে স্যার গ্রাফটিন এলিট স্মিথ ফেরাউন মিনফাতার মমির উপর থেকে একটি পট্টি খুলে দেখতে পান তার লাশের উপর লবনের স্তর জমাট বাঁধা রয়েছে। এটা সাগরের নোনা পানিতে ডুবে মরার সুস্পষ্ট আলামত।

আপনি মিশর গেলে কায়রোর যাদু ঘরে ফেরাউন মিনফাতার লাশ দেখে আসবেন। যারা আল্লাহর নবী এবং নবীর অনুসারীদের নির্মূল করার ষড়যন্ত্র করে, তাদের আল্লাহ তা'আলা কিভাবে নির্মূল করেন, তার জ্বলন্ত নিদর্শন হলো ফেরাউনের এই লাশ। মহান আল্লাহ ডুবন্ত ফেরাউনকে লক্ষ্য করে বলেন : "আমি তোমার লাশটাকে রক্ষা করবো, যাতে করে পরবর্তী লোকদের জন্যে তুমি হয়ে থাকো শিক্ষনীয় নিদর্শন। অবশ্য অনেক মানুষই এমন যে, পরিণতির নিদর্শন দেখেও সতর্ক হয়না।" (সূরা ১০ ইউনুস : আয়াত ৯২)

হায়রে পরিণতি!

ফেরাউন আর তার অনুসারীদের এই করুণ পরিণতিতে কেউই দুঃখ পায়নি। ব্যথিত হয়নি কেউ তার জন্যে। কেউ এ কথা মনে করেনি যে তার প্রতি অবিচার করা হয়েছে। তাই সে এবং তার গোটা বাহিনী নির্মূল হয়ে গেলেও তাদের জন্যে কারো চোখে এক ফোটা পানিও আসেনি। মহান আল্লাহ বলেন :

"ফেরাউন বাহিনী ডুবে মরলো। আর এই ডুবে মরার জন্যে তারা ছেড়ে এসেছে কতো যে বাগ বাগিচা, ঝরনা-ধারা, ফল ফসল ও জমকালো প্রাসাদ এবং হাজারো ভোগের উপকরণ। এখন এই হলো তাদের পরিণাম। অন্যদেরকে আমি এসব জিনিসের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছি। এমন করুণ পরিণতির পরও তাদের জন্যে না আকাশ কেঁদেছে আর না জমিন ফেলেছে এক ফোটা চোখের পানি।" (সূরা ৪৪ দুখান : আয়াত ২৫-২৯)

মৃত্যু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় মানুষের আত্মাকে যেখানে রাখা হয় তার নাম 'আলমে বরযখ'। এর দুটি অংশ। এক অংশের নাম 'ইল্লিন' আর অপর অংশের নাম 'সিজ্জিন'। ইল্লিনে রাখা হয় নেক লোকদের আত্মা। আর 'সিজ্জিনে' রাখা হয় অপরাধীদের আত্মা। এই 'সিজ্জিনে' ফেরাউন আর তার সাথিদের সকাল সন্ধ্যা দোযখ দেখানো হয়। দোযখে তাদের জন্যে কি ভয়াবহ শাস্তি অপেক্ষা করছে, সেটা দেখানো হয়। এভাবে প্রতি মুহূর্তে তাদের ভীত সন্ত্রস্ত রাখা হচ্ছে।

আতংক আর মানসিক যাতনায় অতিবাহিত করছে তারা প্রতিক্ষণ। মহান আল্লাহ আল কুরআনে বলেন :

"আল্লাহ তাকে (সেই মর্দে মুমিনকে) এদের জঘন্য ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করলেন। আর ফেরাউন এবং তার সাঙ্গ পাঙ্গরাই পড়ে গেলো জঘন্য শাস্তির চক্রজালে। দোযখের দাউ দাউ করা আগুন, সে আগুনের সম্মুখীন হয় তারা সকাল আর সন্ধ্যায়। আর কিয়ামত যখন সংঘটিত হবে, তখন নির্দেশ দেয়া হবে: ফেরাউন আর তার সাঙ্গ পাঙ্গদের নিক্ষেপ করো কঠিনতম শাস্তির মাঝে। এরপর তারা দোযখের ভেতর বিবাদে লিপ্ত হবে। দুর্বল অনুসারীরা অহংকারী নেতাদের বলবে: আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম। এখন কি তোমরা আমাদের জাহান্নামের আযাব লাঘব করবেনা? তখন দুনিয়ার সেই অহংকারী নেতারা বলবে: আল্লাহ তো তাঁর বান্দাদের মাঝে ফয়সালা করে দিয়েছেন। এখন আমাদের কিছুই করার নেই। তখন এসব দোযখবাসী জাহান্নামের কর্মকর্তাদের বলবে: তোমাদের প্রভুর কাছে একটু আবেদন করো, তিনি যেনো একদিনের জন্যে হলেও আমাদের শাস্তি লাঘব করেন। জবাবে তারা বলবে: কেন তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি নিয়ে রসূলগণ আসেননি? অপরাধীরা বলবে, হ্যাঁ, এসেছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁদের বিরোধিতা করেছিলাম। তখন দোযখের কর্মকর্তারা বলবে, আবেদন নিবেদন করতে থাকো, তবে বিদ্রোহীদের নিবেদন নিষ্ফল। (সূরা ৪০ আল মুমিন : আয়াত ৪৫-৫০)

সিনাই মরুভূমিতে বনি ইসরাঈল

লোহিত সাগরের পানিতে ডুবে নিমজ্জিত হয়ে গেলো ফেরাউনের সমস্ত ফখর। বিলীন হয়ে গেলো তার ক্ষমতার দম্ভ ও বড়াই। এসব কিছুই ঘটলো বনি ইসরাঈলের চোখের সামনে। আল্লাহ ফেরাউনকে তার বাহিনী সমেত সমুদ্রে নিমজ্জিত করে তাদের উদ্ধার করলেন মহাবিপদ থেকে। আল্লাহর নবী হযরত মূসা তাদের বললেন, যে মহান আল্লাহ তোমাদের উদ্ধার করেছেন এই মহাবিপদ থেকে, তোমরা তাঁর শোকর গুযারি করো।

ফেরাউন নিমজ্জিত হবার পর হযরত মূসা বনি ইসরাইলকে নিয়ে লোহিত সাগরের পূর্ব তীর ঘেঁষে সম্মুখে অগ্রসর হলেন। এখানে রয়েছে দীর্ঘ মরু প্রান্তর। এটি আরব এলাকা। এই মরুভূমি তূর পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। বর্তমানে এ মরু অঞ্চলের নাম সিনাই মরু অঞ্চল। তুর পাহাড় এই মরুভূমিরই এক প্রান্তে অবস্থিত বলে ওটাকে 'তুরে সাইনা' বলা হয়। সিনাই মরুভূমির সাথে বনি ইসরাঈলের দীর্ঘ ইতিহাস জড়িত। বনি ইসরাঈলকে চল্লিশ বছর এ মরুভূমিতে অবস্থান করতে হয়। মিশরে ইসলামের শত্রুরা হযরত মূসাকে যে কষ্ট দিয়েছিল

এ মরুভূমিতে ইসলামের নামধারী বনি ইসরাঈল তাঁকে তার চেয়ে কিছুটা কম কষ্ট দেয়নি।

মূর্তি পূজার খায়েশ

সিনাইর পথে চলছে বনি ইসরাঈল। চলতে চলতে তারা একটি মূর্তিপূজক বসতির নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিল। তারা দেখলো, ঐ বসতির লোকেরা মূর্তির সামনে মাথা নত করে পূজা করছে। ওদের পূজা দেখে এদের মনেও মূর্তি পূজার খায়েশ জেগে বসলো। তারা আল্লাহর নবীকে বললো : "হে মূসা! এদের দেবতাগুলোর মতো আমাদের জন্যেও একটা মূর্তির দেবতা বানিয়ে দাও।" (সূরা ৭ আ'রাফ : আয়াত ১৩৮)

দেখলেন তো মুসলিম নামধারী বনি ইসরাঈলের কাণ্ড! আসলে দীর্ঘদিন তারা অনৈসলামী সমাজে বসবাস করছিল। মিশরীয় মূর্তি পূজকদের অধীনে কাজকর্ম ও চাকরি বাকরি করে আসছিল। বহু বছর যাবত মিশরীয় মূর্তি পুজকরাই ছিলো এদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রভু। ফলে বনি ইসরাঈলের মন মগজে মূর্তি পূজার প্রভাব জেঁকে বসেছিল। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাদের মধ্যে খাঁটি ঈমান আকিদা সৃষ্টি করার আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাদের মন মগজ পুরোপুরি পরিশুদ্ধ হয়নি। তাই পথিমধ্যে কিছু লোককে মূর্তিপূজা করতে দেখে তাদের মনেও মূর্তিপূজার সাধ জেগে উঠলো এবং হযরত মূসার কাছে মূর্তির দেবতা বানিয়ে দেবার দাবি করলো। হায়, কী নির্লজ্জ দাবি তারা করলো। আল্লাহর দীনের মর্মবাণী তাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি।

তাদের এই ন্যাক্কারজনক দাবি শুনে হযরত মূসা বললেন : "আফসুস! তোমরা বড়ই অজ্ঞ জাতি! ঐ মূর্তিপূজকদের পথ তো ধ্বংসের পথ, ওদের পথ একেবারেই ভ্রান্ত পথ। আমি কি তোমাদের জন্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য মাবুদ খুঁজবো? অথচ আল্লাহই তো তোমাদেরকে জগতে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।" (সূরা ৭ আ'রাফ : ১৩৮-১৪০)

পানি নাই পানি চাই

সিনাই প্রান্তরে এসে বনি ইসরাঈল দারুন পানির সংকটে পড়লো। নদী নালা পানি ফোয়ারা বিহীন এক মরুপ্রান্তর এই সিনাই। কোথায় পাবে এখানে তারা পানি? আল্লাহর নবী মূসা আলাইহিস সালাম নিজ কওমের জন্যে পানি চাইলেন আল্লাহর কাছে। আল্লাহ বললেন, তোমার লাঠিটা অমুক পাথরে মারো। আবার সেই লাঠির মু'জিযা। তিনি আল্লাহর হুকুমে লাঠি মারলেন পাথরে। সাথে সাথে পাথরটি থেকে বারটি ঝর্নাধারা প্রবাহিত হলো। বইয়ে চললো বারটি নহর। মহান আল্লাহ বলেন :

"মূসা যখন তার কওমের জন্যে পানি প্রার্থনা করলো, তখন আমি বললাম, ঐ পাথরটির উপর তোমার লাঠি মারো। এর ফলে সেখান থেকে বারটি ঝর্নাধারা উৎসারিত হলো। প্রত্যেক গোত্র তার পানি সংগ্রহের স্থান জেনে নিলো।" (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ৬০)

বনি ইসরাঈলের ছিলো বারটি গোত্র। তাদের মাঝে পানি নিয়ে যেনো কোনো কলহ সৃষ্টি না হয় সেজন্যে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক গোত্রের জন্যে আলাদা আলাদা ঝর্নাধারা সৃষ্টি করে দেন।

খাবার নাই খাদ্য চাই

নবীর দোয়ায় দয়া করলেন আল্লাহ বনি ইসরাঈলকে। পানি বিহীন প্রান্তরে তিনি তাদের পানির ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু শুধু পানি খেয়ে তো আর মানুষ বাঁচতে পারেনা। পানের সাথে আহারও করতে হয়। বেঁচে থাকার জন্যে পানাহার দুটোই চাই। আল্লাহর নবী আবার তাঁর কওমের জন্যে দু'আ করলেন।

আল্লাহ পাক তাদের জন্যে ব্যবস্থা করে দিলেন প্রাকৃতিক খাদ্য। তিনি নিজের পক্ষ থেকে তাদের জন্যে মান্না ও সালওয়া পাঠান। মান্না ছিলো ধনিয়ার বীজের মতো এক প্রকার ছোট ধরনের খাদ্য। এগুলো কুয়াশার মতো আসমান থেকে বর্ষিত হতো এবং জমিনে পড়লেই জমে যেতো। এগুলো রাত্রে পড়ে জমে থাকতো। সকালে উঠে তারা মান্না কুড়িয়ে নিতো। এগুলো ছিলো দারুণ সুস্বাদু মিষ্টি খাবার।

সালওয়া ছিলো কবুতরের মতো একপ্রকার ছোট পাখি। এই পাখি দিনের বেলায় ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে প্রান্তর জুড়ে ছড়িয়ে পড়তো। বনি ইসরাঈল অতি সহজেই পাখিগুলোকে ধরে ফেলতো। এগুলোর গোশত ছিলো দারুণ মজাদার। বনি ইসরাঈল চল্লিশ বছর সিনাই প্রান্তরে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়ায়। এই চল্লিশ বছর আল্লাহ তা'আলা তাদের মান্না সালওয়া প্রদান করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "আমি তোমাদের জন্যে নাযিল করেছি মান্না আর সালওয়া। আমি বলেছিলাম, তোমরা আমার দেয়া পবিত্র জীবিকা থেকে আহার করো।" (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ৫৭)

ছায়া নাই ছায়া চাই

পানির ব্যবস্থা হলো, খাবার ব্যবস্থা হলো, মহান আল্লাহ তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে তাদের জন্যে অলৌকিকভাবে এই সুস্বাদু পানাহারের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সিনাই মরু প্রান্তরে কোথাও গাছ গাছালি নেই, ঘরবাড়ি নেই, ছায়াদার কিছুই নেই। প্রখর রোদ আর রোদ। সূর্যের তাপদাহে তাদের জ্বলে পুড়ে শুকিয়ে মরার অবস্থা দেখা দিলো। এই রিফিউজি জীবনে তাবু বানিয়ে থাকার সামর্থও তাদের

ছিলনা। সমুদ্র পার হয়ে সিনাই প্রান্তরে পা ফেলতেই রোদের তাপে তাদের মাঝে শুরু হলো হাহাকার। আল্লাহর নবী দু'আ করলেন আল্লাহর কাছে। তিনি ছায়া চাইলেন নিজ কওমের জন্যে।

দয়াময় রহমান তাদের ছায়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। মেঘমালা পাঠিয়ে দিলেন তাদের মাথার উপর। এটিও ছিলো তাদের জন্যে আল্লাহর এক বিরাট অনুগ্রহ। মহান আল্লাহ বলেন : "আমি মেঘমালা দিয়ে তাদের উপর ছায়া বিস্তার করলাম এবং তাদের জন্যে অবতীর্ণ করলাম মান্না আর সালওয়া। আমি তাদের বলেছিলাম আমার দেয়া পবিত্র জিনিস থেকে তোমরা খাও। কিন্তু এরপর তারা যা কিছু করলো তাতে আমার উপর নয়, বরং তারা নিজেদের উপরই নিজেরা যুলম করলো। (সূরা ৭ আল আ'রাফ : আয়াত ১৬০, সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ৫৭)

তুর পাহাড়ে চল্লিশ দিন

আল্লাহর রসূল মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছ থেকে নিজ কওমের জন্যে চেয়ে নিলেন ছায়া, পানি ও খাদ্য। তাদের জরুরি সমস্যাগুলোর সমাধান হলো। এবার আল্লাহ মূসাকে ডেকে পাঠালেন নির্জনবাসে তুর পাহাড়ে। সূরা তীনে এ পাহাড়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে 'তুরে সাইনা'।

মূসা আলাইহিস সালাম ভাই হারূণকে কওমের কাছে নিজের প্রতিনিধি বানিয়ে পাহাড়ে চলে এলেন নির্জনে আল্লাহর ইবাদত করার জন্যে। আল্লাহ তাঁকে প্রথমে ত্রিশ দিনের জন্যে ডেকেছিলেন। পরে তিনি এ নির্জনবাসের মেয়াদ চল্লিশ দিন করে দেন। এখানে তিনি প্রতিদিন দিনের বেলায় রোযা রাখতেন আর রাতদিন আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন। যিকর আযকার, দু'আ ও চিন্তা গবেষণা করে কাটিয়ে দেন তিনি চল্লিশ দিন।

আল্লাহ! তোমাকে দেখতে চাই

আজ মূসার নির্জনবাসের চল্লিশতম দিন। আল্লাহর নির্ধারিত মেয়াদ তিনি পূর্ণ করলেন। আল্লাহ দারুণ খুশি হলেন মূসার উপর। আজ মূসার জীবনের সোনালি দিন। মহান আল্লাহ সরাসরি কথা বললেন মূসার সাথে। তিনি বললেন : 'হে মূসা! আমি তোমাকে লোকদের উপর আমার রিসালাত এবং আমার সাথে সরাসরি কথা বলার জন্যে মনোনীত করেছি। কাজেই আমি তোমাকে যা কিছু দিচ্ছি তাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।'

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কথা শুনে মূসা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। তাঁর মনে স্বাদ জাগলো আল্লাহকে দেখতে! বললেন: আল্লাহ! আমি তোমাকে দেখতে চাই, দেখার শক্তি দাও!

আল্লাহ বললেন : তুমি কিছুতেই আমাকে দেখতে পাবেনা। কোনো দৃষ্টি আমার পর্যন্ত পৌঁছায় না। তবে--

তবে হ্যাঁ, পাহাড়ের দিকে তাকাও। পাহাড়টা যদি স্থির থাকতে পারে, তবে তুমি আমাকে দেখতে পাবে।'

'অতপর মহান আল্লাহ যখন পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন, তখন সে জ্যোতি তাকে অস্থির করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলো আর মূসা পড়ে গেলো সংজ্ঞাহীন হয়ে।'

তারপর যখন মূসার সংজ্ঞা ফিরে এলো, তখন তিনি বুঝতে পারলেন, কোনো মানুষের পক্ষে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়। তিনি নিজের আবদারের জন্য আল্লাহর কাছে তওবা করলেন। বললেন : 'প্রভু, অতি পবিত্র মহান তোমার সত্তা। আমি তোমার দিকে রুজু হলাম, আমিই পয়লা মুমিন।' (সূরা ৭ আল আ'রাফ : আয়াত ১৪২-১৪৩)

তাওরাত পেলেন মূসা

আজ মূসার তুর পাহাড়ে নির্জনবাসের চল্লিশ দিন পূর্ণ হলো। আজ তিনি আল্লাহকে দেখতে চেয়েও দেখতে পারলেন না। কারণ আল্লাহকে দেখা তো কোনো সৃষ্টির পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে তিনি আজ আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন। সে কি আনন্দ! মহামনিব আল্লাহর সাথে কথা বলার সৌভাগ্য কার আছে? এ সৌভাগ্য তো সব নবী রসূলদেরও হয়নি। এ সৌভাগ্য হয়েছে শুধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আর মূসা আলাইহিস সালামের।

এখন আল্লাহর সেই বিশেষ সান্নিধ্য থেকে বিদায় নেবার পালা। এ সময় মহান আল্লাহ তার প্রতি নাযিল করলেন তাওরাত। তাওরাত আল্লাহর কিতাব। আল্লাহ ফলকে লিখে এ কিতাব মূসাকে প্রদান করলেন। মহান আল্লাহ বলেন : "অতপর আমি মূসাকে (তাওরাত) লিখে দিলাম কতগুলো ফলকে। তা ছিলো উপদেশে পরিপূর্ণ এবং জীবনের সকল বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশিকা। এ কিতাব প্রদান করে আমি তাকে বললাম : এটাকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং তোমার জাতিকে এর উত্তম হুকুম আহকাম মেনে চলবার নির্দেশ দাও।" (সূরা ৭ আ'রাফ : আয়াত ১৪৫)

মূসা কিতাব পেয়ে আল্লাহর শোকর আদায় করলেন এবং ফিরে চললেন নিজ কওমের কাছে।

সামেরির ষড়যন্ত্র

বনি ইসরাঈলিদের মধ্যে সামেরি নামের বা সামেরি বংশের একটি লোক ছিলো। সে ছিলো নামের মুসলমান। তার অন্তরে শিরক ও মূর্তি পূজার বীজ শিকড়

বিস্তার করেছিল। হযরত মূসা যখন তুর পাহাড়ে চল্লিশ দিনের নির্জনবাসে গেলেন, সেই সুযোগে এই ব্যক্তি মহিলাদের সোনার অলংকারসমূহ চেয়ে নিলো। সেগুলো আগুনে গলিয়ে একটি গোবাছুর তৈরি করলো। বিশেষ প্রক্রিয়ায় সেটি 'হাম্বা' করে উঠলো। সামেরি তখন লোকদের বললো : দেখো, মূসা ভুল করে খোদাকে তালাশ করার জন্যে তুর পাহাড়ে গেছে। আসলে তোমাদের খোদা তো এই বাছুর। তোমরা একে পূজা করো।

হযরত হারুণ আলাইহিস্ সালাম তাকে বাধা দিলেন এবং লোকদের গো-পূজা করতে নিষেধ করলেন। কিন্তু এতে খাঁটি মুসলিম এবং অখাঁটি লোকদের মধ্যে বিবাদ লেগে গেলো। যাদের অন্তরে শিরকের বীজ শিকড় গেড়েছিল তারা গো-পূজা শুরু করে দিলো।

মূসা ফিরে এসে তাদের এই কাণ্ড দেখে রাগে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। উত্তেজনায় তাঁর হাত থেকে তাওরাত লিখিত ফলকগুলো নিচে পড়ে গেলো। তিনি ভাই হারুনকে ধরে বললেন : এরা যখন এই অপকর্ম করছিল, তুমি বাধা দাওনি কেন?

হারুণ বললেন, আমি তাদের নিষেধ করেছি। কিন্তু তারা আমার কথা শুনেনি। এবার মূসা সামেরিকে জিজ্ঞেস করলেন : কেন তুমি একাজ করলে?

সামেরি প্রতারণামূলক জবাব দিলো। সে বললো, আমি দূতের পদাংক থেকে এক মুঠো তুলে নিয়েছি এবং এতে নিক্ষেপ করেছি। আমার প্রবৃত্তি আমাকে এ কাজের দিকে ধাবিত করেছে।

হযরত মূসা তার প্রতারণামূলক কথা শুনে আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, যা এখন থেকে তোর এই ব্যারাম লেগে থাকবে, তুই সারাজীবন মানুষ দেখলেই বলবি : 'আমাকে ছুঁয়োনা, আমাকে ছুঁয়োনা'। তাছাড়া পরকালে তোর জন্যে অপেক্ষা করছে কঠিন শাস্তি। অতপর মূসা সেই গো মূর্তিটি সকলের সামনে পুড়িয়ে ফেললেন এবং তার ছাই ভষ্ম সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন। তিনি সবাইকে বলে দিলেন : আল্লাহই তোমাদের একমাত্র প্রভু। (সূরা তোয়াহা : আয়াত ৮৬-৯৮, সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৪৯-১৫০)

জাতির নেতা হিসেবে হযরত মূসা জাতির এ অপরাধের জন্যে নিজেকে এবং নিজের ভাইকে দোষী মনে করলেন। তাই তিনি কাতর কণ্ঠে নিজের জন্যে এবং নিজের ভাইয়ের জন্যে ক্ষমা চাইলেন মহান আল্লাহর কাছে। বললেন : "আমার প্রভু! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করে দাও আর আমাদের সিক্ত করো তোমার রহমত দ্বারা। তুমিই তো সর্বোত্তম রহমকারী।" (সূরা ৭ আ'রাফ: আয়াত ১৫১)

হযরত মূসার প্রার্থনার জবাবে আল্লাহ বললেন, যারা বাছুরকে খোদা বানিয়েছে, তারা আমার গজবে নিপতিত হয়েছে। তবে যারা এই অপকর্ম করার পর তওবা করেছে এবং ঈমানের পথে এসেছে, আমি তাদের ক্ষমা করে দেবো। (সূরা ৭ আ'রাফ : আয়াত ৫২-৫৩)

অতপর হযরত মূসা তাওরাতের ফলকগুলো কুড়িয়ে নিলেন এবং জাতিকে সম্বোধন করে বললেন, এ হলো আল্লাহর কিতাব। এতে তোমাদের জন্যে রয়েছে জীবন যাপনের বিধান এবং রহমত। তোমরা এর বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করো।

আবার তুর পাহাড়ে

বনি ইসরাঈল চরম বেয়াড়া, বেয়াদব ও তর্কবাগিশ জাতি। তারা আল্লাহর নবী হযরত মূসাকে কতো যে জ্বালাতন করেছে তার ইয়ত্তা নেই। তাদের জ্বালাতনের কাহিনী বলে শেষ করা যাবে না। হযরত মূসার একটি ভাষণ থেকেই তাদের জ্বালাতনের নির্মমতা আপনারা বুঝতে পারবেন। কুরআনে তাঁর সেই ভাষণ উল্লেখ হয়েছে। তিনি তাদের বলেছিলেন :

"হে আমার জাতির ভাইয়েরা! তোমরা তো জানোই আমি আল্লাহ তা'আলার রসূল। তারপরও কেন তোমরা আমাকে এতো কষ্ট দিচ্ছো! (সূরা ৬১ আস সফ : আয়াত ৫)

এবার আসুন কথার ধারাবাহিকতায়। হযরত মূসা যখন ফলকগুলো হাতে নিয়ে তাদের বললেন, এ হচ্ছে আল্লাহর কিতাব তাওরাত, তোমরা এর নির্দেশ পালন করো।' তখন তারা বললো, এ যে আল্লাহর কিতাব সেকথা আমরা কিভাবে বিশ্বাস করবো। এ কিতাব যে আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে তা আমাদের সরাসরি দেখাতে হবে। যতোক্ষণ আল্লাহ নিজে না বলে দেবেন যে এটা তাঁর কিতাব, ততোক্ষণ আমরা তোমার কথা মানবো না।

অগত্যা আল্লাহর নবী বনি ইসরাঈলের প্রতিটি শাখা থেকে একজন করে প্রতিনিধি মনোনীত করলেন এবং সত্তরজন প্রতিনিধি নিয়ে পুনরায় তুর পাহাড়ে গেলেন। সেখানে মূসার আবেদনে আল্লাহ তা'আলা আড়াল থেকে তাঁর সাথে কথা বললেন। সত্তরজন প্রতিনিধি নিজেদের কানে মূসার সাথে আল্লাহর কথাবার্তা শুনলো। আল্লাহ বললেন : "তোমাদের হিদায়াতের জন্যে মূসাকে কিতাব প্রদান করেছি, তাতে রয়েছে সত্য মিথ্যার মানদণ্ড।"

নিজেদের কানে আল্লাহর কথা শুনেও বেয়াড়া লোকগুলো বললো : "মূসা আল্লাহকে প্রকাশ্যে তোমার সাথে কথা বলতে না দেখলে আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করবোনা।" (সূরা২ আল বাকারা : আয়াত ৫৫)

এ-অবাস্তব দাবি করার সাথে সাথে সেখানে এক ভয়ংকার বজ্রপাত হলো। বজ্রপাতে ওরা সত্তরজনের সবাই মারা গেলো। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা মূসা আ.-এর দোয়ায় তাদেরকে আবার জীবিত করে দিলেন যাতে করে তারা কৃতজ্ঞ হয়। (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ৫৫-৫৬)

পাহাড় চাপার আতংক

এই সত্তরজন ফিরে এসে জাতির লোকদের বললো : মূসা যা বলছে আল্লাহর পক্ষ থেকেই বলছে। আমরা নিজ কানে মূসার সাথে আল্লাহর কথোপকথন শুনেছি। তারা সব ঘটনাই খুলে বললো। কিন্তু লোকগুলোর অন্তর পাথরের মতো শক্ত হয়ে গিয়েছিল। তারা কিছুতেই আল্লাহর বিধান গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলোনা। হযরত মূসা তাদের কতোভাবে বুঝালেন, কতো মনগলানো উপদেশ দিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাদের মন গললোনা। তারা আল্লাহর নবীকে কষ্ট দিয়েই চললো।

এবার আল্লাহ তা'আলা তাদের মাথার উপর তুর পাহাড় উঠিয়ে ধরলেন। তারা দেখতে পেলো, উপর থেকে পাহাড় তাদের উপর পড়ছে, এখনই সবাই পাহাড় চাপা পড়ে বিনাশ হয়ে যাবে। চরম আতংক সৃষ্টি হলো তাদের মাঝে। এ সময় আল্লাহ তাদের কাছে থেকে অংগীকার নিলেন আল্লাহর কিতাবকে আঁকড়ে ধরার এবং আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে জীবন যাপন করার। তারা অংগীকার করলো। কিন্তু অংগীকারের কথা কি আর তাদের মনে থাকে?

তুমি আর তোমার খোদা গিয়ে যুদ্ধ করো

বনি ইসরাঈল এভাবে ভবঘুরের মতো মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াক, এমন ইচ্ছা আল্লাহর ছিলনা। সম্মুখে উত্তর দিকে এগিয়ে গেলেই রয়েছে উর্বর মাটির সবুজ বনানীতে ঘেরা জেরুজালেম দেশ। একদল দুর্ধর্ষ খোদাদ্রোহী লোক ছিলো তখন জেরুজালেমের শাসক। আল্লাহ হযরত মূসার মাধ্যমে বনি ইসরাঈলকে নির্দেশ দিলেন সম্মুখে অগ্রহর হয়ে ঐ দুর্ধর্ষ জাতিটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। তিনি বলে দিলেন, যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেই তিনি তাদের সাহায্য করবেন এবং ঐ সুন্দর ও প্রাচুর্যে ভরা ভূখণ্ডটি তাদের উপহার দেবেন। এ সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা শুনুন:

"মূসা বললো : হে আমার জাতি! তোমরা ঐ পবিত্র ভূখণ্ডে প্রবেশ করো, আল্লাহ সেটি তোমাদের জন্যে লিখে দিয়েছেন। সম্মুখে এগিয়ে যাও, পিছপা হয়োনা। পিছে হটলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারা বললো : হে মূসা! সেখানে তো রয়েছে একটি দুর্ধর্ষ জাতি। তারা সেখান থেকে বেরিয়ে না গেলে আমরা কিছুতেই সেখানে ঢুকবোনা। তারা দেশটি ছেড়ে চলে গেলেই আমরা সেখানে প্রবেশ করবো। তবে এই ভীরু লোকগুলোর মধ্যে দু'জনের প্রতি আল্লাহ তাঁর

অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। ওরা দু'জন বললো : তোমরা এগিয়ে চলো, ওদের সাথে মোকাবেলা করে গেইটের ভেতর ঢুকে পড়ো। ভেতরে ঢুকে পড়লে তোমরাই বিজয়ী হবে। মুমিন হয়ে থাকলে তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা করো। তারা বললো : 'হে মূসা এই দুর্ধর্ষ লোকগুলো সেখানে থাকা অবস্থায় আমরা কিছুতেই প্রবেশ করবোনা। গেলে তুমি আর তোমার প্রভু যাও। তোমরা দু'জনে গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, আমরা এখানে বসে থাকলাম।' ওদের কথা শুনে মূসা বললো : আমার প্রভু! আমার আর আমার ভাই ছাড়া আর কারো উপর তো আমার ইখতিয়ার নাই। তাই তুমি ওদের থেকে আমাদের আলাদা করে দাও। জবাবে আল্লাহ বললেন : ঠিক আছে, এদের জন্যে ঐ দেশটি চল্লিশ বছর হারাম করে দেয়া হলো। তারা এখন এই চল্লিশ বছর এ প্রান্তরেই উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াবে। এই সীমালংঘনকারীদের জন্যে যেনো তোমার কোনো সমবেদনা না থাকে। (সূরা ৫ আল মায়িদা : আয়াত ২১-২৬)

নিজেদের ভীরুতা ও কাপুরুষতার জন্যে বনি ইসরাঈলকে জেরুজালেম প্রবেশ করতে চল্লিশ বছর অপেক্ষা করতে হয়। এই চল্লিশ বছরে ঐ দুইজন মর্দে মুমিন ছাড়া বাকি ভীরু কাপুরুষগুলো সবাই মারা যায়। চল্লিশ বছর পর নতুন প্রজন্মকে সাথে নিয়ে ঐ দুইজনের একজন হযরত ইউশা বিন নূন জেরুজালেম দখল করেন।

রসুন পেঁয়াজ ডাল গম চাই

এই চল্লিশ বছর তারা মরুভূমিতে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়ায়। তবে মান্না সালওয়া পেতে থাকে। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে প্রতি বেলা একই খাবার আর তাদের সহ্য হচ্ছিলনা। তখন তারা হযরত মূসাকে বললো :

"মূসা! একই খাদ্য আমাদের আর সহ্য হয়না। তুমি তোমার প্রভুর কাছে দু'আ করো তিনি যেনো আমাদের জন্যে শাক সব্জি, গম, রসুন পেঁয়াজ, ডাল ইত্যাদি কৃষিজাত খাদ্য উৎপন্ন করে দেন।' মূসা বললো : তোমরা কি একটি উত্তম জিনিসের বদলে নিম্নমানের জিনিস নিতে চাও? তবে কোনো শহরে গিয়ে বসবাস করো, সেখানে যা চাইবে সবই পাবে। অতপর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অধ:পতন, দুরাবস্থা ও অনটন তাদের উপর চেপে বসলো আর তাদের ঘিরে ফেললো আল্লাহর গজব। এ ছিলো আল্লাহর নিদর্শনের সাথে তাদের বিদ্রোহের পরিণতি।" (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ৬১)

বনি ইসরাঈলের অধঃপতন ও লাঞ্ছনা

শত শত বছর মিশরীয় মুশরিকদের সাথে মিলে মিশে বসবাস করা এবং তাদের গোলামির জীবন যাপন করে। এ কারণে বনি ইসরাঈল নিমজ্জিত হয় চরম ঈমানি ও নৈতিক অধঃপতনে। ফলে তারা সত্যের বাহক নবী মূসা আলাইহিস

সালামকে চরম কষ্ট দেয়। তাদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হচ্ছে মহান আল্লাহর কতিপয় বাণী। পড়ে দেখুন :

১. আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার কিতাব নিয়ে মতভেদ করা হয়। (সূরা হূদ : আয়াত ১১০)

২. হে বনি ইসরাঈল! আমার দেয়া অনুগ্রহরাজির কথা স্মরণ করো। আমার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো, তাহলে আমিও আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবো আর কেবল আমাকেই ভয় করো। আমি যে কিতাব পাঠিয়েছি তার উপর ঈমান আনো। (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ৪০-৪১)

৩. তোমরা গো-বাছুরকে উপাস্য বানিয়ে নিজেদের উপর যুল্ম করেছো। (সূরা আল ২ বাকারা : আয়াত ৫১)

৪. তাদের (বনি ইসরাঈলের) অবাধ্যতার কারণে আমি আকাশ থেকে তাদের উপর আযাব নাযিল করেছি। (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ৫৯)

৫. আল্লাহর আয়াত অমান্য করা, নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং অবাধ্যতা ও সীমালংঘনের কারণে তাদের উপর চেপে বসে লাঞ্ছনা, অধঃপতন, দুরাবস্থা ও অনটন আর তাদের ঘিরে ফেলে আল্লাহর গজব। (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ৬১)

৬. অংগীকার ভংগ করার কারণে আমি তাদেরকে আমার রহমত থেকে দূরে নিক্ষেপ করেছি আর তাদের হৃদয়কে করে দিয়েছি কঠিন। (সূরা মায়েদা : ১৩)

৭. (হে বনি ইসরাঈল) এই সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখার পরও তোমাদের দিল পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেছে, বরং তার চেয়েও অধিক কঠিন। (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ৭৪)

৮. বনি ইসরাঈলের একদল লোকের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী আল্লাহর কালাম শুনতো তারপর জেনে বুঝে সজ্ঞানে তাতে বিকৃতি ঘটাতো। (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ৭৫)

৯. স্মরণ করো, আমি বনি ইসরাঈল থেকে এই মর্মে পাকা ওয়াদা নিয়েছিলাম যে, তারা আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করবেনা; মা, বাবা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও মিসকিনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, মানুষের সাথে উত্তম কথা বলবে, সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে। কিন্তু (হে বনি ইসরাঈল) সামান্য ক'জন ছাড়া তোমরা সবাই এই অংগীকার ভংগ করেছো। (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ৮৩)

১০. (হে বনি ইসরাঈল!) তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশ মানছো আর কিছু অংশ অমান্য করছো? তোমাদের মাঝে যারাই এমনটি করছে তাদের

এছাড়া আর কি শাস্তি হতে পারে যে, দুনিয়ার জীবনে তারা লাঞ্ছিত ও পর্যদুস্ত হবে আর পরকালে তাদের নিক্ষেপ করা হবে কঠিনতম আযাবে?... এরা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়া ক্রয় করেছে। কাজেই তাদের শাস্তি কমানো হবেনা এবং তারা কোনো সাহায্যও পাবেনা।" (সূরা ২ : আয়াত ৮৫-৮৬)

১১. তোমাদের কাছে মূসা এসেছিল সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে। সে একটু আড়াল হলেই তোমরা গো-বাছুরকে উপাস্য বানাতে। এমনি যালিম ছিলে তোমরা। স্মরণ করো তোমাদের থেকে নেয়া আমার সেই অংগীকারের কথা যা তোমাদের উপর তুর পাহাড় উঠিয়ে তোমাদের থেকে নিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম, আমি যে কিতাব দিলাম তা তোমরা শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং মন দিয়ে তা শুনো। তারা বললো, আমরা শুনেছি, কিন্তু মানবোনা। (সূরা ২ : আয়াত ৯৩)

দেখলেন তো কতোটা অধঃপতি জাতি এই বনি ইসরাঈল। হযরত মূসার পরে তারা শত শত নবীকে হত্যা করেছে। তারা আল্লাহর নবী যাকারিয়া এবং ইয়াহইয়াকেও হত্যা করেছে। হযরত ঈসাকেও হত্যা করার ষড়যন্ত্র তারাই করেছিল। এই জন্যে তারা অভিশপ্ত জাতি। তবে তাদের মধ্যে একদল ভালো লোকও ছিলেন। তাঁরা আল্লাহর কিতাব ও নবীগণের অনুসারী ছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন : "মূসার জাতির মধ্যে এমন একটি দলও ছিলো, তারা সত্য (আল্লাহর কিতাব) অনুযায়ী মানুষকে পথ প্রদর্শন করতো এবং তারই ভিত্তিতে সুবিচার করতো।" (সূরা আল আ'রাফ : আয়াত ১৫৯)

গরু যবাই করো

গরু পূজার প্রভাব বনি ইসরাঈলের মন মগজ থেকে দূর হচ্ছিলনা। গরুর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা, বিনয়, ভক্তি থেকেই যাচ্ছিল। ফলে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসার মাধ্যমে তাদের গরু যবাই করার নির্দেশ প্রদান করেন। এ নির্দেশ শুনে তারা তা সরাসরি অমান্য করতে পারছিলনা। কারণ, অমান্য করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আবার কোন্ বিপদ এসে পড়ে। তবে গরু যবাই করা নিয়ে তারা টালবাহানা শুরু করলো। কুরআন ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছে :

"স্মরণ করো, মূসা যখন তার জাতিকে বললো : আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন একটি গাভি যবেহ করতে। তারা বললো : তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছো? মূসা বললো, আমি কখনো মূর্খদের মতো কথা বলিনা, এ থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। তারা বললো : তবে তোমার প্রভুর কাছে আবেদন করো, তিনি যেনো সে গাভির বিস্তারিত বিবরণ আমাদের জানিয়ে দেন। মূসা বললো, আল্লাহ বলেছেন : সেটি অবশ্যি এমন একটি গাভি হতে হবে, যেটি একেবারে বুড়োও নয়, আবার একেবারে বাছুরও নয়। বরং মাঝামাঝি বয়েসের। কাজেই তোমাদের যা হুকুম দেয়া হলো তা করো। তারা

বললো : তোমার প্রভুর কাছে জিজ্ঞেস করো সেটির রং কি হবে? মূসা বললো : তিনি বলেছেন, গাভিটি অবশ্যি হলুদ রং-এর হতে হবে। তার রং এতোই উজ্জ্বল হতে হবে যা দেখে মানুষের চোখ ভরে যাবে। তারা আবারও বললো: মূসা তোমার প্রভুর কাছ থেকে শুনে নাও তিনি আসলে কেমন ধরনের গরু চান? গাভিটি কেমন হবে, সে ব্যাপারে আমরা সন্দেহে আছি। মূসা বললো, আল্লাহ বলেছেন : সেটি হবে এমন একটি গাভি, যাকে দিয়ে কোনো কাজ করানো হয়নি, জমি চাষ বা পানি সেচ করানো হয়নি, সুস্থ সবল ও নিখুঁত একটি গাভি। তারা বললো: হ্যাঁ এবার তুমি ঠিকই সন্ধান দিয়েছো। অতপর তারা সেটিকে যবেহ করলো। তবে সহজে তারা সেটি যবেহ করছিলনা।" (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ৬৭-৭১)

দেখলেন তো, গরুর প্রতি তাদের কী ভক্তি? কতো গড়িমসি তারা করলো গরুটি যবেহ করতে? গরু যবেহ করার মাধ্যমে আল্লাহ তাদের অন্তর থেকে গরুর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা নির্মূল করতে চেয়েছিলেন।

তলিয়ে গেলো কারূণ

বনি ইসরাঈলের মধ্যে ছিলো এক ধনী ব্যক্তি। নাম ছিলো তার কারূণ। বেটা ছিলো বিশ্বসেরা কৃপণ। তার মতো কৃপণ আর দ্বিতীয়টি এ পৃথিবীতে আসেনি। তাই মানুষ কৃপণের অপর নাম দিয়েছে কারূণ। সে কারণে কারূণ বলতে এখন কৃপণ বুঝায়।

কারূণ বনি ইসরাঈলের লোক হলেও নিজের ধূর্তামি দিয়ে ফেরাউনের সভাসদ হয়েছিল। নবী বংশের লোক হলেও সে ছিলো আসলে ইসলামের শত্রু। ফেরাউনের সাথেই ছিলো তার যোগসাজশ। এবার শুনুন তার ধনভাণ্ডার ও তার পরিণতি সম্পর্কে কুরআনের বাণী :

"কারূণ ছিলো মূসার কওমের লোক। কিন্তু সে নিজ কওমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। আমি তাকে এতো ধনরত্ন দিয়েছিলাম যে তার ধন ভাণ্ডারের চাবি বহন করতো বলবান লোকদের একটি দল বহু কষ্টে। তার কওমের লোকেরা তাকে বললো : অর্থ সম্পদ নিয়ে অহংকার করোনা। আল্লাহ অহংকারীদের পছন্দ করেননা। আল্লাহ তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের ঘর তৈরি করো। আর পৃথিবীতে তোমার (দায়িত্বের) অংশ ভুলে যেয়োনা। মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করো, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সে বললো: আমার এ সম্পদ থেকে আমি কাউকেও দেবনা। এই সম্পদ তো আমি আমার বিশেষ জ্ঞান দ্বারা লাভ করেছি। এ থেকে অন্যদের দেবো কেন?... শেষ পর্যন্ত আমি তাকে তার ঘর সমেত ভূগর্ভে তলিয়ে দিলাম। তখন আল্লাহর সামনে কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি আর সে নিজেও নিজের সাহায্য করতে

পারেনি। আখিরাতের সেই ঘরতো আমি তৈরি করে রেখেছি সেইসব লোকদের জন্যে, যারা পৃথিবীতে বড়াই করে চলেনা আর সৃষ্টি করেনা বিপর্যয়। শুভ পরিণাম তো আল্লাহভীরু লোকদের জন্যে।" (সূরা ২৮ আল কাসাস : ৭৬-৮৩)

এ হলো কারূণের পরিণতি। ইহুদি কিংবদন্তী থেকে জানা যায়, কারূণ এতো অগাধ অর্থ সম্পদের মালিক ছিলো যে, তার ধন ভাণ্ডারের চাবি বহন করতো তিনশ খচ্চর। কিন্তু সে কৃপণতা করে একটি কানাকড়িও আল্লাহর পথে ব্যয় করতো না। গরিব দুঃখীদের দিতোনা। ফলে এই সম্পদ ভোগ করা তার ভাগ্যেও জোটেনি। তলিয়ে গেলো সব, সবই তলিয়ে গেলো।

আমি কি আপনার সাথি হতে পারি?

হাদিস থেকে জানা যায়, একবার এক ব্যক্তি হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করে : বলুন তো এ যুগে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী কে? মূসা আলাইহিস সালাম নবী হবার কারণে তাঁর প্রতি অহি নাযিল হতো। অহি ও রিসালাতের কারণে নবীগণই নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকেন। তাই হযরত মূসা ঐ ব্যক্তির জিজ্ঞাসার জবাবে বললেন, এ যুগে আমিই সবচে বড় জ্ঞানী।

এ উত্তরটি আল্লাহর পছন্দ হয়নি। তিনি যদি বলতেন : 'আল্লাহই অধিক জানেন', তাহলেই জবাবটি যথার্থ হতো। তাই আল্লাহ অহির মাধ্যমে মূসাকে জানালেন দুই নদীর সংযোগস্থলে আমার এক বান্দা আছে সে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। তাকে আমি একটি বিষয়ে অধিক জ্ঞান দান করেছি।

মূসা বললেন, প্রভু আমি আপনার সেই বান্দার সাথে সাক্ষাত করতে চাই, আমাকে তার সন্ধান বলে দিন।

আল্লাহ বললেন, তোমার থলের মধ্যে একটি ভাজা মাছ নিয়ে যাত্রা করো। যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে সেখানেই আমার ঐ বান্দার সাক্ষাত পাবে। অতপর এ সাক্ষাতের ঘটনাটি কুরআনে সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত মূসা তাঁর ঘনিষ্ঠ সাথি ও ছাত্র ইউশা বিন নুনকে সাথে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। মূসার মৃত্যুর পর এই ইউশাই বনি ইসরাইলের নেতা হন। এ সময় ইউশা ছিলেন যুবক। যুবক ইউশাকে সাথে নিয়ে মূসা চললেন। চলতে চলতে একস্থানে নদীর তীরে ক্লান্ত হয়ে তাঁরা বিশ্রাম নিলেন। সেখানে তারা ঘুমিয়েও পড়লেন। ঘুম থেকে উঠে যাত্রা করার সময় মাছটির কথা ভুলে যান তাঁরা। এক দুই দিনের পথ সম্মুখে চলার পর তাঁদের তীব্র ক্ষিধে পায়। মূসা বললেন, ভাজা মাছটি দাও, সেটি খাই। ইউশা বললেন, সেটিতো আনা হয়নি। আমরা যেখানে বিশ্রাম নিয়েছিলাম সেটি ওখানে রয়ে গেছে।

একথা শুনে মূসা বললেন, ঐ জায়গাটিই তো আমরা খুঁজছি। ফিরে চলো মাছটি হারিয়ে যাবার স্থানে। অতপর তারা নিজেদের পদরেখা অনুসরণ করে ফিরে

এলেন সেখানে। সেখানে এসে তারা পেলেন আল্লাহর এক নেক বান্দাহকে। হাদিসে তাঁর নাম বলা হয়েছে খিযির।

মূসা তাঁকে বললেন : আমি কি আপনার সাথি হতে পারি? আমার ইচ্ছা, আপনাকে যে জ্ঞান শেখানো হয়েছে, আপনি সেখান থেকে আমাকেও কিছু শেখাবেন।

খিযির বললেন : আপনি আমার সাথি হবার মতো ধৈর্য ধরতে পারবেননা।

মূসা : ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আমি আপনার কোনো হুকুম অমান্য করবোনা।

খিযির : আচ্ছা, তবে আমি যতোক্ষণ নিজের পক্ষ থেকে আপনাকে কিছু না বলি ততোক্ষণ আপনি আমাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারবেননা।

একথার উপর তারা পথ চলতে শুরু করলেন। কিছু দূর গিয়ে নদী পার হবার জন্যে একটি নৌকায় উঠলেন। নৌকাওয়ালা তাঁদের কাছ থেকে কোনো ভাড়া নিলোনা। কিন্তু নামার আগে খিযির নৌকাটিতে ছিদ্র করে দিলেন।

মূসা বললেন : আপনি তো একটা জঘন্য অন্যায় কাজ করলেন। সে করলো আমাদের উপকার আর আপনি করলেন তার ক্ষতি।

খিযির : আমি না বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না?

মূসা : আমার ভুল হয়ে গেছে। ভুলে যাওয়া জিনিসের জন্যে আমাকে পাকড়াও করবেন না। আপনি আমার প্রতি সদয় ও কোমল হোন।

আবার চললেন দু'জনে। সামনে অগ্রসর হয়েই দেখলেন একটি বালক। খিযির বালকটিকে হত্যা করলেন।

মূসা : বিনা অপরাধে আপনি একটি বালককে হত্যা করলেন? সে তো কাউকেও হত্যা করেনি? আপনি একটি জঘন্য অন্যায় কাজ করলেন।

খিযির : আমি তো আপনাকে বলেছি, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরে চলতে পারবেন না।

মূসা : ঠিক আছে, এরপর যদি আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করি, তাহলে আমাকে আর আপনার সাথে রাখবেননা। আশা করি, নিশ্চয়ই আপনি আমার ওজর কবুল করবেন।

আবারও চললেন দু'জনে। এবার এলেন এক গ্রামে। হাঁটতে হাঁটতে ভীষণ ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা। তাঁরা ঐ গ্রামবাসীর কাছে কিছু খাবার চাইলেন। কিন্তু তারা এদের আপ্যায়ন করতে রাজি হলোনা। সে গ্রামেই একটি দেয়াল পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। খিযির হেলে পড়া দেয়ালটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে দিলেন।

মূসা বললেন : আপনি ইচ্ছা করলে তো এ কাজের বিনিময়ে কিছু পারিশ্রমিক নিতে পারতেন।

খিযির : এখানেই আমার সাথে আপনার চলা শেষ। তবে আপনি যে বিষয়গুলো নিয়ে ধৈর্য ধরতে পারছিলেন না, সেগুলোর গূঢ়তত্ত্ব বলে দিচ্ছি :

নৌকা : নৌকাটা একজন গরিব লোকের। তারা নদীতে নৌকা বয়ে উপার্জন করে। কিন্তু সামনেই আছে এক যালিম শাসক। সে নতুন নৌকা পেলেই জোর করে নিয়ে যায়। তাই আমি ওর নৌকাটা দোষযুক্ত করে দিয়েছি। ফলে ঐ যালিম এর নৌকাটা আর নেবেনা।

বালক হত্যা : বালকটির বাবা-মা হলেন নেককার মুমিন। আমাদের আশংকা হয়েছে সে তার অন্যায় ও কুফরি দ্বারা তার বাবা মাকে বিব্রত করবে। তাই আমরা চাইলাম, আল্লাহ যেনো তার বদলে তার বাবা-মাকে একটি নেক সন্তান দান করেন।

দেয়াল : দেয়ালটি হলো শহরে অবস্থানকারী দুটি এতিম বালকের। ঐ দেয়ালের নিচে তাদের সম্পদ লুকানো আছে। তাদের সম্পদের নিরাপত্তার জন্যে দেয়ালটি ঠিক করে দিয়েছি।

খিযির আরো বললেন : মূসা আমি নিজের ইচ্ছায় একাজগুলো করিনি। করেছি আল্লাহর নির্দেশে।

দেখলেন তো সব জ্ঞানীর উপরই একজন জ্ঞানী আছেন। এবার হযরত মূসা বুঝলেন নিজের জ্ঞান নিয়ে কখনো ফখর করতে নেই। এমনকি নবী হলেও তা করতে নেই।

আল্লাহই প্রকৃত জ্ঞানী। তিনি যাকে যতোটুকু চান, নিজের জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে দান করেন।

হযরত মূসা ও খিযিরের বিস্তারিত ঘটনা জানার জন্যে দেখুন সূরা ১৮ আল কাহাফ : আয়াত ৬১-৮৩।

শেষ কথা

হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সংগ্রামী জীবনের ইতিহাস অনেক লম্বা হয়ে গেলো। তাঁকে যেমন কষ্ট দিয়েছে ফেরাউন ও তার সাংগ পাংগরা, তেমনি কষ্ট দিয়েছে তাঁর নিজের জাতি বনি ইসরাঈল। মরুভূমিতে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। তাঁর আগেই তাঁর ভাই হারুণ আলাইহিস সালামের মৃত্যু হয়। হযরত মূসার পর তাঁর যোগ্য ছাত্র ইউশা বিন নুন তাঁর খলিফা নিযুক্ত হন। নতুন প্রজন্ম হযরত ইউশার নেতৃত্বে জিহাদ করে জেরুজালেম দখল করেন। অতপর সেখানেই প্রেরিত হন

শত শত নবী। নবীগণের সাথে বনি ইসরাঈল খুবই খারাপ ব্যবহার করেছে। তাই আল্লাহও তাদের লাঞ্ছিত অভিশপ্ত করেছেন।

হযরত মূসার সংগ্রামী জীবন থেকে আমরা জানতে পারলাম, ইসলামি নেতৃত্বকে যেমন বাইরের শত্রুদের মোকাবেলা করতে হয়, ঠিক তেমনি নিজ জাতি, সমাজ ও দলের ফেতনাবাজ লোকদের ফেতনা দমনেও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে হয়। নিজের লোকদের সংশোধনের জন্যেও কোমলতার সাথে কঠোরতা গ্রহণ করতে হয়। তাদেরকে যেমন সুসংবাদ দিতে হয় তেমনি সতর্কও করতে হয়। আর সইতে হয় তাদের পক্ষ থেকে অবর্ণনীয় কষ্ট।

আল কুরআনে হযরত মূসা

আল কুরআনে হযরত মূসাকে অনেক বড় মর্যাদাবান নবী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্ণনা করা হয়েছে তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামের মর্মস্পর্শী ঘটনাবলি। আল কুরআনে হযরত মূসার নাম যতোবার উল্লেখ করা হয়েছে অপর কোনো নবীর নাম এতো বেশি উল্লেখ করা হয়নি।

আল কুরআনে হযরত মূসার নাম উল্লেখ হয়েছে ১৩৬ বার। হযরত মূসার সংগ্রামী জীবন বিস্তারিত জানতে পারবেন নিম্নোক্ত সূরাগুলো পড়লে : আল বাকারা : ৪০-১০২ আয়াত। আল আ'রাফ : ১০৩-১৭১ আয়াত। ইউনুস : ৭৫-৯৩ আয়াত। আল কাহাফ : ৬০-৮২ আয়াত। তোয়াহা : ৯-৯৮ আয়াত। আশ শোয়ারা : ১০-৬৭ আয়াত। আল কাসাস : ৩-৪৭ এবং ৭৬-৮৪ আয়াত। আল মুমিন/গাফির : ২৩-৫৪ আয়াত।

হযরত মূসা আলাইহিস সালামের এই জীবনী আল কুরআনের উক্ত আয়াতগুলোর আলোকেই রচিত হয়েছে।

❖

(১৬)

হারূণ

আলাইহিস্ সালাম

কি তাঁর পরিচয়?

নাম হারূণ। তিনি আল্লাহর একজন রসূল। মূসা কলিমুল্লাহ আলাইহিস সালামের বড় ভাই তিনি। তিন বছরের বড় তিনি মূসার চেয়ে। আল্লাহ যখন মূসা আলাইহিস সালামকে রসূল নিয়োগ করেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিলেন তিনি যেনো তাঁর ভাই হারূণকেও রসূল নিয়োগ করে তাঁর হাত শক্ত করেন। আল্লাহ তাঁর দু'আ কবুল করেন এবং হারূণকে মূসার সহযোগি রসূল নিয়োগ করেন। হযরত হারূণ ছিলেন বনি ইসরাঈলের শ্রেষ্ঠ রসূলগণের একজন। তিনি ছিলেন সুবক্তা।

দাওয়াতি ও সাংগঠনিক জীবন

মহান আল্লাহ বলেন : "আমি মূসা ও হারূণের প্রতি অনুগ্রহ করেছি। তাদের উভয়কে আমি উদ্ধার করেছি মহাকষ্ট থেকে। আমি তাদের সাহায্য করেছি। ফলে তারা বিজয়ী হয়েছে। তাদের আমি সঠিক পথ দেখিয়েছি। তাদের উভয়কে আমি সুস্পষ্ট কিতাব দান করেছি। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তাদের উভয়ের সুনাম অক্ষুণ্ন রেখেছি। মূসা ও হারূণের প্রতি বর্ষিত হোক সালাম। এভাবেই আমি উপকারী লোকদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। আসলে ওরা দু'জনেই ছিলো আমার বিশ্বস্ত দাস।" (সূরা ৩৭ আস সাফফাত : আয়াত ১১৪-১২২)

আল্লাহর এ বাণী থেকে হযরত হারূণের সঠিক মর্যাদা বুঝা যায়। তিনি ভাই মূসার সাথে ফেরাউনের দরবারে উপস্থিত হন। ফেরাউনকে দাওয়াত প্রদান করেন। ফেরাউন তাঁদের দু'জনকেই মিথ্যাবাদী বলে অস্বীকার করে। সে বলে, এরা দুই ভাই রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার জন্যে এসেছে। অতপর ফেরাউন হযরত মূসা ও হারূণ দু'জনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। অতপর মূসা ও হারূণের সাথে ফেরাউনের যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত হয়, তার পরিণতিতে আল্লাহ ফেরাউনকে ধ্বংস ও নির্মূল করে দেন।

ফেরাউন ডুবে মরার পর সিনাই মরুভূমিতে থাকাকালে হযরত মূসা হযরত হারূণকে নিজের খলিফা বা ভারপ্রাপ্ত নেতা নিযুক্ত করে চল্লিশ দিনের জন্যে তুর পাহাড়ে নির্জনবাসে যান। হযরত হারূণ ভারপ্রাপ্ত নেতা থাকাকালেই সামেরি গো-বাছুর বানিয়ে সেটার পূজা করতে বলে সবাইকে। হারূণ তাকে বারণ করেন। এ ব্যাপারে তিনি কঠোর পদক্ষেপ নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জাতি দ্বিধা-বিভক্ত হবার উপক্রম হয়ে পড়ায় তিনি সেই পদক্ষেপ নেননি।

হযরত মূসা চল্লিশ দিন পর তাওরাত নিয়ে ফিরে এসে হযরত হারূণের উপর ক্রোধান্বিত হন। এ ঘটনাটি কুরআনে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে :

"(গো-বাছুর পূজা করতে নিষেধ করে) হারূণ তাদের বলেছিল, হে আমার জাতি! তোমরা তো পরীক্ষায় পড়েছো। তোমাদের প্রভু বড় করুণাময়। কাজেই তোমরা আমার অনুসরণ করো এবং আমার নির্দেশ মানো। কিন্তু তারা তাকে বলে দিলো মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এর পূজা করবো। মূসা ফিরে এসে বললো : হে হারূণ! তুমি যখন দেখলে এরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তখন এদেরকে আমার অনুসরণের পথে আনতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছে? তুমি কি আমার হুকুম অমান্য করলে? হারূণ বললো : হে আমার সহোদর ভাই! আমার দাড়ি ও চুল ধরে টেনোনা। আমার ভয় হচ্ছিল তুমি এসে বলবে : হারূণ তুমি কেন বনি ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করলে? কেন আমার কথা রক্ষা করোনি? (সূরা ২০ তোয়াহা : আয়াত ৯০-৯৪)

অন্যস্থানে বলা হয়েছে : "মূসা নিজের ভাইয়ের চুল ধরে টানলো। হারূণ বললো : হে আমার সহোদর! এ লোকগুলো আমাকে কোণঠাসা করে ফেলেছিল এবং আমাকে হত্যা করবার জন্যে উদ্যত হয়েছিল। কাজেই তুমি শত্রুদের কাছে আমাকে হেয় করোনা এবং আমাকে যালিম গণ্য করোনা। তখন মূসা দু'আ করলো : প্রভু! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করে দাও। আর আমাদের প্রবেশ করাও তোমার অনুগ্রহের মধ্যে। তুমিই তো সব দয়াবানের বড় দয়াবান।" (সূরা ৭ আরাফ : আয়াত ১৫০-১৫১)

এ থেকে বুঝা যায়, হযরত হারূণ জীবনের ঝুঁকি নিয়েও নিজ কওমকে সত্য পথে পরিচালিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। তবে জাতির মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি হোক সেটা তিনি চাননি। আসলে তিনি ছিলেন বড়ই প্রজ্ঞাবান ও মহান রসূল।

হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মৃত্যুর এগার মাস পূর্বে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। ভাই মূসার মতোই তিনি ছিলেন এক বলিষ্ঠ সংগ্রামী পুরুষ। তাঁরা দুই ভাই নেতৃত্ব প্রদান করেন এক বিরাট জাতির।

আল কুরআনে হযরত হারূণ

আল কুরআনে হযরত হারূণ আলাইহিস সালামের নাম ২০ (কুড়ি) বার উল্লেখ হয়েছে। যেসব স্থানে উল্লেখ হয়েছে, সেগুলো হলো : আল বাকারা : ২৪৮; আন নিসা : ১৬৩; আল আনআম ৮৪; আল আ'রাফ ১২২, ১৪২; ইউনুস : ৭৫; মারইয়াম : ২৮, ৫৩; তোয়াহা : ৩০, ৭০, ৯০, ৯২; আল আম্বিয়া : ৪৮; আল মুমিনুন : ৪৫; আল ফুরকান : ৩৫; আশ শুয়ারা : ১৩, ৪৮; আল কাসাস : ৩৪; আস সাফফাত : ১১৪, ১২০।

সম্রাট নবী দাউদ
আলাইহিস্ সালাম

দাউদ আলাইহিস সালামের নাম তো আপনারা সবাই জানেন। মহান আল্লাহ তাঁকে দান করেছিলেন বিরাট মর্যাদা। তাঁকে অধিকারী করেছিলেন অনেক অনেক গুণাবলির। তিনি ছিলেন একাধারে–

১. বিরাট উচ্চ মর্যাদার নবী।
২. তাঁর উপর নাযিল হয়েছিল 'যবুর' কিতাব।
৩. তিনি ছিলেন অসীম সাহসী বীর সেনানী।
৪. তিনি ছিলেন এক বিরাট সাম্রাজ্যের সম্রাট।
৫. তিনি ছিলেন একজন সফল বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারক।
৬. ছিলেন মহাজ্ঞানী, ন্যায় বিচারক।
৭. তিনি ছিলেন মুমিনদের নেতা।
৮. ছিলেন আল্লাহর আইনের শাসক। শাসন পরিচালনা করতেন আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানের ভিত্তিতে।
৯. তিনি ছিলেন আকর্ষণীয় সুবক্তা ও সুভাষী।
১০. পাখি ও পর্বত তাঁর সাথে আল্লাহর তসবিহ্‌তে মশগুল হতো।
১১. তিনি ছিলেন পরম জনদরদী, জনসেবক।
১২. মহান আল্লাহ প্রাকৃতিক জগতের অনেক কিছুকেই তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলেন।
১৩. তিনি ছিলেন পরম আল্লাহভীরু, আল্লাহওয়ালা।
১৪. ছিলেন একজন নবীর পিতা। তাঁর পুত্র সুলাইমানকেও আল্লাহ নবুয়্যত দান করেছিলেন।
১৫. আল কুরআনে স্বয়ং আল্লাহ তাঁর উচ্ছসিত প্রশংসা করেন।

বীর সেনানী দাউদ

দাউদ ছিলেন একজন বনি ইসরাঈল। বনি ইসরাঈল কারা তা কি আপনারা জানেন? হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের একটি নাম ছিলো ইসরাঈল। আর বনি মানে মানব সন্তান বা বংশধর। সুতরাং বনি ইসরাঈল মানে হযরত ইয়াকুব বা ইসরাঈল আলাইহিস সালামের বংশধর। এ বংশেই মূসা আলাইহিস সালামের পরে এক সময় জন্ম নেন দাউদ আলাইহিস সালাম। দাউদ তাঁর

পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি যখন একজন বালক মাত্র, তখন বনি ইসরাঈলের নবী ছিলেন শামাবিল আলাইহিস্ সালাম। এই নবীর নাম অবশ্য কুরআনে উল্লেখ হয়নি। এ সময় জেরুজালেমের রাজা ছিলো যালিম জালুত। বনি ইসরাঈলের ছিলো জালুতদের সাথে যুদ্ধ। তাই এসময় বনি ইসরাঈলের প্রয়োজন ছিলো একজন বলিষ্ঠ শাসকের। হযরত শামাবিল আলাইহিস সালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে অতি বিজ্ঞ ও বীর তালুতকে বনি ইসরাঈলের শাসক ঘোষণা করেন।

তালুত এক বিরাট বনি ইসরাঈলি সেনাদল নিয়ে জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে যাত্রা করেন। বালক দাউদও এ বাহিনীর সাথে রওয়ানা করেন। এ সময় বনি ইসরাঈলের অধিকাংশ লোকই ছিলো আল্লাহর নাফরমান। সেনাপতি তালুতের নির্দেশ অমান্য করে পথিমধ্যে অধিকাংশ লোকই যুদ্ধ থেকে কেটে পড়ে।

এক সময় যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। জালুত হুংকার ছেড়ে গর্জে উঠে : তোমাদের মাঝে কে আছে আমার সাথে লড়বার? জালুত এগিয়ে এলো। কিন্তু বনি ইসরাঈলের মধ্যে থেকে কেউ তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এগিয়ে আসেনি। হঠাৎ গর্জে উঠে এগিয়ে এলো এক যুবক। জালুত নিজের মোকাবেলায় তাকে মনে করলো নস্যি। কিন্তু বেপরোয়া বালক এগিয়ে এসে জালুতের উপর হানলো আঘাত। শুরু হলো তরবারির ঝনঝনানি। এক পর্যায়ে বালকের তরবারির তীব্র আঘাতে জালুত লুটিয়ে পড়লো ভূমির উপর। দেহত্যাগ করলো তার জীবন। সেনাপতির এই করুণ দশা দেখে পিছু হটতে লাগলো জালুতের সেনাদল। অবশেষে তারা পরাজিত হলো, পালিয়ে গেলো।

আপনারা কি জানেন কে এই বালকটি? হ্যাঁ, এই বালকটিই দাউদ। তাঁর সম্পর্কেই কুরআনে বলা হয়েছে : 'ওয়া কাতালা দাউদু জালুতা- আর দাউদ হত্যা করলো জালুতকে।' বিজয়ী হলো ইসলামি বাহিনী।

আল্লাহর নবী হলেন দাউদ

ছোটবেলা থেকেই দাউদ ছিলেন অত্যন্ত আল্লাহভীরু। আল্লাহর দাসত্ব আর অসংখ্য মানবিক গুণাবলি নিয়ে বেড়ে উঠেন দাউদ। তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রিয় দাস। ফলে মহান আল্লাহ তাঁর কাছে অহি নাযিল করেন। দান করেন নবুয়্যত। তাঁর উপর অবতীর্ণ করেন আসমানি কিতাব। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন সে কিতাব হলো 'যবুর'।

হযরত দাউদ ছিলেন শ্রেষ্ঠ রসূলগণের একজন। মহান আল্লাহ আল কুরআনে তাঁর ভূয়সি প্রশংসা করেছেন। ঘোষণা করেছেন তাঁর উচ্চ মর্যাদার কথা :

১. 'আমি দাউদকে আমার পক্ষ থেকে একটি বিশেষ মর্যাদা দান করেছি।' (সূরা ৩৪ সাবা : আয়াত ১০)

২. আমি দাউদ আর সুলাইমানকে দান করেছি বিশেষ জ্ঞান। তারা বিনীত হয়ে বললো : শোকর সেই মহান আল্লাহর যিনি তাঁর বহু সংখ্যক মুমিন বান্দাহর উপর আমাদের মর্যাদাবান করেছেন। (সূরা আন নামল : ১৬)
৩. আর আল্লাহ তাকে দান করেছেন প্রজ্ঞা, এবং যা চেয়েছেন তাই তাকে শিখিয়েছেন। (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ২৫২)
৪. আমি দাউদকে প্রদান করেছি যবুর। (সূরা ৪ নিসা : আয়াত ১৬৩)
৫. আমার দাস দাউদের কথা ওদের শুনাও। সে ছিলো বিরাট শক্তিধর আর আমার প্রতি বিনীত। (সূরা সোয়াদ : আয়াত ১৭)

নবী হলেন সম্রাট

দাউদকে আল্লাহ তা'আলা শুধু নবুয়্যতই দান করেননি, সাম্রাজ্যও প্রদান করেছেন। দাউদ যখন পরাক্রমশালী জালুতকে হত্যা করেন, তখন থেকেই ইসরাঈলি জনগণ দাউদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। দিন দিন তিনি জনগণের প্রিয় নেতা হয়ে উঠেন। জানা যায়, সম্রাট তালুত দাউদের কাছে নিজের কন্যা বিয়ে দেন। অতপর মহান নেতা তালুতের মৃত্যুর পর জনগণ হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে তাদের শাসক নির্বাচিত করে নেয়। মহান আল্লাহ বলেন : "আল্লাহ দাউদকে সাম্রাজ্য ও প্রজ্ঞা দান করেছেন।" (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ২৫১)

"হে দাউদ আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলিফার (শাসকের) পদে অধিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি মানুষের মাঝে ন্যায় ও সত্য সহকারে শাসন পরিচালনা করো, নিজের ইচ্ছা বাসনার অনুসরণ করোনা।" (সূরা ৩৮ সোয়াদ : আয়াত ২৬)
মহান আল্লাহই হযরত দাউদকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেছিলেন। খৃষ্টপূর্ব ১০২০ সাল থেকে ১০০৪ সাল মহান নেতা তালুত বনি ইসরাঈলদের সম্রাট ছিলেন। তিনি বনি ইসরাঈলকে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং এক বিশাল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে যান। অতপর খৃষ্টপূর্ব ১০০৪ সাল থেকে ৯৬৫ সাল পর্যন্ত হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম বনি ইসরাঈল রাষ্ট্রের শাসক ছিলেন। দাউদ আলাইহিস সালাম ফিলিস্তিন, ট্রান্স জর্ডান এবং সিরিয়ার বিরাট অঞ্চল নিয়ে ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাষ্ট্র ছিলো অত্যন্ত শক্তিশালী ও সুখ শান্তিতে পরিপূর্ণ।

দাউদের রাজ্যে শিল্পোন্নতি

হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের শাসনকালকে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্নভাবে সোনালি শাসনকাল বানিয়ে দেন। তাঁর শাসনকালে এসে বিশ্ব যেসব দিক থেকে উন্নতি লাভ করে, তন্মধ্যে শিল্পোন্নতি অন্যতম। মহান আল্লাহ হযরত দাউদকে দান করেছিলেন উন্নত কারিগরি বিদ্যা। তাঁর শাসনকাল থেকেই লৌহ গালিয়ে প্রস্তুত করা শুরু হয় বিভিন্ন লৌহজাত দ্রব্য। উন্নতি লাভ করে পোশাক শিল্প। নির্মাণ শুরু হয় উন্নত যুদ্ধোপকরণ। মহান আল্লাহ বলেন :

"আর আমি তোমাদের উপকারার্থে দাউদকে বর্ম নির্মাণ শিল্প শিখিয়েছিলাম, যা তোমাদেরকে পরস্পরের আঘাত থেকে রক্ষা করে।" (সূরা ২১ আল আম্বিয়া : ৮০)

"দাউদকে আমি নিজের কাছ থেকে বিরাট অনুগ্রহ দান করেছি। আমি হুকুম দিয়েছিলাম, হে পর্বতমালা, দাউদের সাথে একাত্মতা করো। এ নির্দেশ আমি পাখিদেরও দিয়েছিলাম। আমি তাঁর জন্যে লোহাকে নরম করে দিয়েছি। তাকে নির্দেশ দিয়েছি বর্ম নির্মাণ করো এবং সেগুলোর পরিমাপ সঠিক আন্দাজে রাখো।" (সূরা ৩৪ সাবা : ১০-১১)

সুকণ্ঠ ও সঠিক ফায়সালার অধিকারী

মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী দাউদ আলাইহিস সালামকে দান করেছিলেন সুমিষ্ট কণ্ঠ, মধুভাষী যবান, স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ভাষণের যোগ্যতা, আর দিয়েছেন অকাট্য ফায়সালা করার ক্ষমতা। মহান আল্লাহ বলেন :

"আমার দাস দাউদের কথা স্মরণ করো। সে ছিলো বিরাট শক্তিধর। সে ছিলো আল্লাহমুখী। আমি পর্বতমালাকে নিয়োজিত করে রেখেছিলাম তার সাথে। ফলে তারা সকাল সন্ধ্যায় তার সাথে আমার গুণগান করতো, আমার পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করতো। পাখ পাখালিও সমবেত হতো, তারাও তার সাথে আমার তসবিহ অভিমুখী হয়ে যেতো। আমি মজবুত করে দিয়েছিলাম তার সাম্রাজ্য এবং তাকে প্রদান করেছিলাম জ্ঞান বিজ্ঞান আর অকাট্য কথা বলার দক্ষতা।" (সূরা ৩৮ সোয়াদ : আয়াত ১৭-২০)

হযরত দাউদের কণ্ঠস্বর এতোই সুমিষ্ট ছিলো যে, তিনি যখন মহান আল্লাহর তসবিহ করতেন, যখন যবুর তিলাওয়াত করতেন, তখন তাঁর মনোমুগ্ধকর সুরের সুবাসে শুধু মানুষই বিমুগ্ধ হতোনা, সেই সাথে পাখ পাখালি এবং পাহাড় পর্বতও বিমুগ্ধ হয়ে পড়তো। তারা সকলেই আল্লাহর প্রিয় দাস দাউদের সাথে তাঁর গুণগান ও মহিমা বর্ণনা করতে শুরু করতো। সকলেই তাঁর সাথে সাথে আল্লাহমুখী হয়ে যেতো। গোটা পরিবেশ আল্লাহর জন্যে আত্মহারা হয়ে উঠতো। আল্লাহর পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য বর্ণনায় মশগুল হয়ে পড়তো। আল্লাহর জন্যে আবেগ উদ্দীপনায় সম্মোহিত হয়ে পড়তো। তাইতো মহান আল্লাহ বলেন : "আর আমি দাউদের সাথে বশীভূত করে দিয়েছিলাম পাহাড় পর্বত ও পাখ পাখালিকে। তারাও তার সাথে আমার তসবিহতে মশগুল হয়ে পড়তো।" (সূরা ২১ আল আম্বিয়া : আয়াত ৭৯)

বড় ইবাদত গুজার

মহান নবী দাউদ আলাইহিস সালাম একদিকে ছিলেন নিষ্পাপ নবী, অন্যদিকে ছিলেন এক বিশাল সাম্রাজ্যের সম্রাট। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন বড় ইবাদত

গুজার। সব সময় আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন তিনি। মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

১. দাউদ ছিলেন মানুষের মাঝে সর্বাধিক ইবাদত গুজার মানুষ। (বুখারি)
২. আল্লাহর নবী দাউদ সারা জীবন একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন আর প্রতি রাত্রের তিন ভাগের একভাগ সালাতে কাটাতেন। (মুসলিম)
৩. আল্লাহর নবী দাউদ নিজের হাতের পরিশ্রম দ্বারা নিজের জীবিকা উপার্জন করতেন। (বুখারি)

এতো বড় সম্রাট হয়েও হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম সব সময় সরল ও সাদাসিধা জীবন যাপন করতেন। এসব কারণেই তো মহান আল্লাহ তাঁকে অনেক বড় মর্যাদা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন :

১. আমি কোনো কোনো নবীকে কোনো কোনো নবীর উপর মর্যাদাবান করেছি আর দাউদকে প্রদান করেছি যবুর। (সূরা বনি ইসরাঈল : আয়াত ৫৫)
২. আমার দাস দাউদের কথা চিন্তা করো। সে ছিলো বড় শক্তিশালী আর বিনীত- আল্লাহমুখী। (সূরা সোয়াদ : ৩০)

দেখলেন তো, স্বয়ং আল্লাহ হযরত দাউদকে শক্তিশালী বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে কিসের শক্তি ছিলো তা কি আপনারা জানেন? হ্যাঁ, তিনি সত্যি শক্তিশালী ছিলেন। আর তাঁর সে শক্তি ছিলো ঈমানি শক্তি, ইবাদতের শক্তি, নৈতিক শক্তি, বিনয়, সরলতা ও স্বচ্ছতার শক্তি, সুকণ্ঠ ও সুভাষণের শক্তি, সর্বোপরি সুনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র শক্তি।

বনি ইসরাঈল ও দাউদ

হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম বনি ইসরাঈলের শ্রেষ্ঠ নবীদের একজন। বনি ইসরাঈলের ছিলো ১২টি শাখা সম্প্রদায়। এরা কখনো ঐক্যবদ্ধ ছিলো না। এদের শাসন ব্যবস্থা ছিলো আলাদা আলাদা। সম্রাট তালুত এদেরকে একক শাসনের অধীনে আনবার প্রক্রিয়া শুরু করেন। দাউদ আলাইহিস সালাম এই প্রক্রিয়াকে পূর্ণ করেন। তিনি গোটা বনি ইসরাঈলকে শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ শাসনের অধীনে সুনিয়ন্ত্রিত করেন।

কথিত আছে, বনি ইসরাঈল বংশে চার হাজার নবীর আগমন ঘটে। কিন্তু তারা নবীদেরকে চরমভাবে কষ্ট দিতো, নির্যাতন করতো। কুরআন বলে : 'তারা অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করতো।' হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে কতো যে কষ্ট এরা দিয়েছে! কুরআনে উল্লেখ হয়েছে : মূসা তাঁর কওমকে বলেছিল "হে আমার জাতি! তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছো, অথচ তোমরা তো জানো আমি আল্লাহর রসূল।"

এরা দাউদ আলাইহিস সালামকেও কষ্ট দিয়েছে। আহলে কিতাব হয়ে তারা আল্লাহর হুকুম, নবীর হুকুম অমান্য করতো। আল্লাহর নবী দাউদ এই বনি

ইসরাঈলের অসৎ লোকদের চরম অভিশাপ দিয়ে যান। এই অভিশাপের কথা কুরআনে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে :

"বনি ইসরাঈলের যেসব লোক কুফরির পথ অবলম্বন করেছে, তাদের উপর দাউদ ও মরিয়ম পুত্র ঈসার মুখ দিয়ে অভিসম্পাত করা হয়েছে। কারণ তারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করেছিল, সীমালংঘন করেছিল, আর পরস্পরকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা বন্ধ করে দিয়েছিল।" (সূরা ৫ আল মায়িদা : আয়াত ৭৮-৭৯)

তবে বনি ইসরাঈলের মাঝে ভালো লোকও ছিলো। তাদেরকে আল্লাহও ভালোবাসতেন, হযরত দাউদও ভালবাসতেন।

আমরা কী শিক্ষা পেলাম?

হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের জীবন চরিত থেকে আমরা কী শিক্ষা পেলাম? হ্যাঁ তাঁর জীবনাদর্শে আমাদের জন্যে অনুকরণীয় অনেক কিছু আছে। তাঁর জীবন চরিত থেকে আমরা শিখলাম :

১. মুমিনের জীবন হবে সাহসী বীরের জীবন।

২. আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করতে হবে।

৩. রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে আল্লাহর আইন অনুযায়ী।

৪. বেশি বেশি জ্ঞানার্জন করতে হবে, বিজ্ঞান মনস্ক হতে হবে, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনী প্রবণতা রাখতে হবে।

৫. আল্লাহর কিতাবকে জ্ঞানের উৎস বানাতে হবে। আল্লাহর কিতাবকে সর্বাধিক অধ্যয়ন করতে হবে।

৬. আল্লাহর অনুগ্রহের জন্যে সবসময় শোকর আদায় করতে হবে।

৭. সব সময় আল্লাহমুখী, আল্লাহভীরু ও ইবাদতের জীবন যাপন করতে হবে। বেশি বেশি রোজা ও রাত জেগে নামায পড়ার অভ্যাস করতে হবে।

৮. সুভাষী হতে হবে। স্বচ্ছ ও স্পষ্ট কথা বলার অভ্যাস করতে হবে।

৯. সব সময় হকের পথে ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। সকলের প্রতি সুবিচার করতে হবে।

কুরআনে উল্লেখ

আল কুরআনে হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের নাম উল্লেখ হয়েছে ষোল বার। কোথায় কোথায় তাঁর নাম উল্লেখ হয়েছে তা আপনাদের বলে দিচ্ছি : সূরা আল বাকারা : ২৫১, আন নিসা : ২৬৩, আল মায়িদা ৭৮, আল আন'আম : ৮৪, বনি ইসরাঈল : ৫৫, আল আম্বিয়া : ৭৮, ৭৯, আন নামল : ১৫, ১৬, সাবা : ১০, ১৩, সোয়াদ : ১৭, ২২, ২৪, ২৬, ৩০।

দাউদ আলাইহিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের নাম যবুর। আল কুরআনে এ কিতাবের নাম উল্লেখ হয়েছে তিনবার। যেসব স্থানে উল্লেখ হয়েছে সেগুলো হলো, আল আম্বিয়া : ১০৫, আন নিসা : ১৬৩, বনি ইসরাইল : ৫৫।

কুরআনের আয়াতগুলো বলে দিলাম। আপনারা সরাসরি আল কুরআন থেকে দাউদ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আরো অনেক কথা জানতে পারবেন।

যবুরের একটি বাণী

আল কুরআনে যবুরের একটি বাণী উল্লেখ হয়েছে। আল কুরআনও আল্লাহর বাণী। যবুরও ছিলো আল্লাহর বাণী। আল কুরআনে যবুরের বাণীটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে : "আর উপদেশের পর যবুরে আমি লিখে দিয়েছিলাম : পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে আমার নেক দাসেরা।" (সূরা ২১ আল আম্বিয়া : ১০৫)

কিন্তু আফসোস! এই কিতাবটি আর অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান নেই। তবে পূর্বের সমস্ত আসমানি কিতাবের সারমর্ম আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনে গ্রন্থাবদ্ধ করে দিয়েছেন।

❖

বিশ্বের অনন্য সম্রাট সুলাইমান

আলাইহিস সালাম

মহান আল্লাহর ঘোষণা

"আর আমি দাউদকে সুলাইমানের মতো সন্তান দিয়েছি। সে ছিলো আমার অতি উত্তম দাস। ছিলো একান্ত বিনীত আল্লাহমুখী।...

আর আমি সুলাইমানকেও পরীক্ষা করেছি। তার আসনে নিক্ষেপ করেছি একটি দেহ। অতপর সে আমার মুখী হয়ে নিবেদন করলো : 'ওগো আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা করে দাও, আর আমাকে এমন এক (অনন্য) রাজত্ব দান করো, যা আমার পরে আর কারো জন্যে শোভনীয় হবেনা। নিঃসন্দেহে তুমিই প্রকৃত দাতা।' তখন আমি বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম। সে যেদিকে চাইতো বাতাস মৃদুমন্দ গতিতে সে দিকে প্রবাহিত হতো। আর জিনদেরও তার বশীভূত করে দিয়েছি সব ধরনের নির্মাণ কারিগর ও ডুবুরি হিসেবে। আর তাদেরকেও তার বাধ্যগত করে দিয়েছি, যারা ছিলো শৃঙ্খলিত। (আমি তাকে বলে দিয়েছি) এগুলো হলো আমার দান। যাকে ইচ্ছে অনুগৃহীত করো, কিংবা যার ব্যাপারে ইচ্ছা বিরত থাকো। এতে তোমার কোনো জবাবদিহিতা নেই। সুলাইমানের জন্যে অবশ্যি আমার কাছে রয়েছে নৈকট্য আর শুভ পরিণাম।" (আল কুরআন সূরা ৩৮ সোয়াদ : আয়াত ৩০-৪০)

কে এই সৌভাগ্যবান?

কে এই অনন্য সম্রাট? কে এই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি? হ্যাঁ, ইনি আল্লাহর প্রিয় দাস সুলাইমান। হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের পুত্র। পিতার মতো তিনিও নবী ছিলেন আবার সম্রাটও ছিলেন। যেমন বাপ তেমন ছেলে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দান করেছেন অনেক অনেক মর্যাদা। তিনি তাঁকে নবীর পুত্র বানিয়েছেন। নবী বানিয়েছেন। সম্রাটের পুত্র বানিয়েছেন। সম্রাট বানিয়েছেন। বাতাসকে তাঁর অনুগত করেছেন। জিনদের তাঁর অনুগত করেছেন। পাখি ও পিপীলিকাদের ভাষা বুঝবার ক্ষমতা দিয়েছেন। তীক্ষ্ণ বিচার ক্ষমতা দিয়েছেন। দিয়েছেন আরো যে কতো কি! এসব পেয়ে তিনি অহংকারী হননি। আল্লাহমুখী হয়েছেন। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়েছেন, বিনীত হয়েছেন। সব সময় তিনি আল্লাহকে ভয় করতেন। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত ইয়াকুব তথা হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বংশধর।

সুলাইমানের রাজত্বকাল

আপনাদের আগেই বলেছি, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশধরদের বনি ইসরাঈল বলা হয়। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বনি ইসরাঈলকে মিশর থেকে বের করে এনে জেরুজালেম এলাকায় রেখে যান। বনি ইসরাঈল জেরুজালেম দখল করে বটে, কিন্তু কখনো একক রাষ্ট্র গঠন করতে পারেনি। তারা বিভিন্ন গোত্রীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীকালে শত্রুরা যখন ইসরাঈলিদের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়, তখন ইসরাঈলিরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি একক রাষ্ট্র গঠন করতে উদ্যোগ নেয়। তারা হযরত শামুয়েল নবীকে এ ব্যাপারে দায়িত্ব অর্পণ করে। হযরত শামুয়েল জ্ঞানী ও বীর তালুতকে ইসরাঈলিদের এই একক রাষ্ট্রের সম্রাট নিযুক্ত করেন। তাঁর রাজত্বকাল ছিলো খ্রিষ্টপূর্ব ১০২০-১০০৪ সাল। তারপর দাউদ আলাইহিস সালাম সম্রাট হন। তাঁর রাজত্বকাল ছিলো খৃষ্টপূর্ব ১০০৪-৯৬৫ সাল। এর পরই সম্রাট হন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম। তাঁর রাজত্বকাল ছিলো খৃষ্টপূর্ব ৯৬৫-৯২৬ সাল। মূলত এই তিন জনই ছিলেন ইসরাঈলিদের একক রাষ্ট্রের শাসক। হযরত সুলাইমানের পর এ রাষ্ট্র আবার ভেঙ্গে দ্বি-খন্ডিত হয়ে যায়। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের সম্রাজ্য ছিলো সিরিয়া ও ফিলিস্তিন এলাকা জুড়ে।

শৈশবকাল ও নবুয়্যত লাভ

এতোক্ষণে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম কোন্ দেশের এবং কোন সময়কার নবী ও সম্রাট ছিলেন? তিনি ছিলেন পিতার সর্বকনিষ্ঠ ছেলে। ছোটবেলা থেকেই বুঝা যাচ্ছিল, তাঁর মধ্যে রয়েছে অনেক প্রতিভা আর অনেক যোগ্যতা। তাই ছোটবেলা থেকেই পিতা তাঁকে রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে শরিক করতেন। তাঁর সাথে বিভিন্ন সময় পরামর্শ করতেন। বিভিন্ন কাজকর্মের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করতেন।

এরি মধ্যে তিনি নবীর ঘরে এবং রাজ পরিবারে অনন্য প্রতিভা নিয়ে বেশ বড় হয়েছেন। শৈশব কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে উপনীত হয়েছেন। যৌবন পেরিয়ে এখন বেশ পাকা বুদ্ধির লোক হয়েছেন। এবার মহান আল্লাহ্ তাঁকে নবী নিযুক্ত করেন। হযরত দাউদ বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়েছেন। এখন তিনি জ্ঞান, নবুয়্যত ও সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে অত্যন্ত যোগ্য ছেলে রেখে যাচ্ছেন বলে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। শাসন ও বিচার কার্যে ছেলের দক্ষতা দেখে তিনি আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠেন।

একদিনের ঘটনা। এক ব্যক্তি এসে হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের দরবারে আরেক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। সে বলে: অমুক ব্যক্তির ছাগলগুলো রাত্রে আমার শস্যক্ষেতে ঢুকে ক্ষেত সাবাড় করে ফেলেছে, আপনি এর বিচার করুন। হযরত দাউদ ছাগলওয়ালার ছাগলগুলো ক্ষেতওয়ালাকে দিয়ে

দেবার ফায়সালা প্রদান করেন। কিন্তু সুলাইমান ভিন্নমত প্রকাশ করেন। তিনি রায় দেন, ছাগলগুলো কেবল ততোদিন ক্ষেতওয়ালার কাছে থাকবে, যতোদিনে ক্ষেতওয়ালার জমিতে ফসল আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। এসময় ক্ষেতওয়ালা ছাগলগুলোর দুগ্ধ থেকে উপকৃত হবে। এ ক্ষেত্রে সুলাইমানের ফায়সালাই গৃহীত হলো। মহান আল্লাহ বলেন :

"স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন দাউদ ও সুলাইমান একটি শস্য ক্ষেতের মামলার ফায়সালা দিচ্ছিল, যে জমিটিতে রাতের বেলায় অন্যদের ছাগল ঢুকে পড়েছিল। আমি তাদের বিচার প্রত্যক্ষ করছিলাম। তখন আমি সুলাইমানকে সঠিক ফায়সালা বুঝিয়ে দিলাম। অথচ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আমি উভয়কেই দান করেছি।" (সূরা ২১ আল আম্বিয়া : আয়াত ৭৮-৭৯)

হাদিস থেকে আরো একটি বিচারের ঘটনা জানা যায়। সেটা হলো, দুই মহিলা তাদের দুইজনের দুইটি শিশুকে একস্থানে শুয়ে রেখে কোনো কাজে যায়। এরি মধ্যে বড় মহিলাটি ফিরে এসে দেখে তার শিশুটিকে একটি নেকড়ে মুখে করে নিয়ে যাচ্ছে। নিজের সন্তানকে নেকড়ে খেয়ে ফেলায় মহিলাটি দারুণ ব্যথা পায়। কিন্তু মহিলাটি ছিল খুবই ধূর্ত। সে ছোট মহিলাটির বাচ্চাটাকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে চিৎকার করে তাকে ডেকে বলে, তোমার বাচ্চাকে বাঘে নিয়ে গেছে। চিৎকার শুনে ছোট মহিলাটি কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে আসে।

এসে দেখে তার বাচ্চাটিই বড় মহিলার কোলে। সে বলে তোমার কোলের বাচ্চাটাই তো আমার। বড়জন বলে, না এটাতো আমার বাচ্চা। এই নিয়ে দু'জনের মধ্যে বেধে যায় বিবাদ। ছোট মহিলা বিচার চেয়ে হযরত দাউদের দরবারে মামলা দায়ের করে। হযরত দাউদ উভয়ের বক্তব্য শুনেন। কিন্তু বড় মহিলাটির জোরগলা ও কিরা-কসম খাওয়া দেখে তিনি মনে করেন বাচ্চাটি বড় মহিলার এবং বড় মহিলাকেই দিয়ে দেন।

কিন্তু ছোট মহিলা নিজ সন্তানের দাবি প্রত্যাহার করছেনা। সে বলে, চলো সুলাইমানের কাছে যাই। ফলে তারা সুলাইমানের কাছে এলো। তিনি দুজনের বক্তব্যই শুনলেন তারা কেউই নিজের দাবি প্রত্যাহার করতে রাজি নয়। তখন হযরত সুলাইমান তাঁর তলোয়ার নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন, বললেন, তোমরা কেউই যখন দাবি ত্যাগ করছনা তখন আমি বাচ্চাটিকে দুই টুকরা করে দুইজনকে দুইভাগ দেবো। একথা শুনে ছোট মহিলা চিৎকার করে উঠলো। বললো, 'আমি আমার দাবি ত্যাগ করলাম, দয়া করে বাচ্চাটিকে কাটবেননা।'

এবার হযরত সুলাইমানের কাছে ঘটনা পরিষ্কার হয়ে গেলো। বাচ্চাটা যে ছোট মহিলার সেকথা বুঝতে আর কোনো অসুবিধা থাকলোনা। তিনি বাচ্চাটি ছোট মহিলাকে দিয়ে দিলেন।

পিতা দাউদ পুত্রের বিচার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হন। দুজনে বিনীত কণ্ঠে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। কুরআনের ভাষায় :

"আমি দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছি। তাঁরা নিবেদন করেছিল : সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা মহান আল্লাহর, যিনি তাঁর অসংখ্য মুমিন বান্দার উপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।" (সূরা ২৭ নামল : আয়াত ১৫)

নবী হলেন রাজা

এরি মধ্যে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম ইন্তেকাল করলেন। ইসলামি সাম্রাজ্যের সর্বজন প্রিয় নেতা এবং আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম রাজ সিংহাসনে পিতার উত্তরাধিকারী হলেন। মহান আল্লাহ তাঁকে এমন এক সাম্রাজ্য দান করেন, যা এ পৃথিবীতে আর কাউকেও দেননি। আল্লাহ তাঁকে অনেক ক্ষমতা এবং অনেক কিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রদান করেন। তাঁকে প্রদান করেন এক বহুপ্রজাতিক সেনাবাহিনী। মহান আল্লাহ বলেন :

"আর দাউদের উত্তরাধিকারী হলো সুলাইমান। সে জনসমাবেশে বললো: হে জনগণ! আমাকে পাখিদের ভাষা শেখানো হয়েছে আর আমাকে দেয়া হয়েছে সব রকমের জিনিস।' সুলাইমানের জন্যে জিন, মানুষ ও পাখিদের সেনাবাহিনী গঠন করা হয়। তাদেরকে রাখা হয় পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে।" (সূরা ২৭ নামল : ১৬-১৭)

হযরত সুলাইমানের সেনাবাহিনীতেই শুধু জিন ছিলনা বরং অনেক জিন তাঁর কর্মচারীও ছিলো। তারা তাঁর নির্দেশে সব ধরনের কাজ করতো। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

"আর এমন কিছু জিন ছিলো, যারা আল্লাহর নির্দেশে সুলাইমানের ওখানে কাজ করতো।.... এই জিনরা তার জন্যে তৈরি করতো সে যা কিছু চাইতো, উঁচু উঁচু অট্টালিকা, ছবি-প্রতিকৃতি, বড় বড় পুকুরের মতো থালা আর বৃহদাকার স্থির ডেগসমূহ। হে দাউদের বংশধররা কৃতজ্ঞ হয়ে কাজ করো। (সূরা ৩৪ সাবা আয়াত ১২-১৩)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"আরেক দল জিন তার জন্যে সমুদ্রে ডুব দিতো। (অর্থাৎ মূল্যবান সামুদ্রিক দ্রব্য উঠিয়ে আনতো) এবং এছাড়া অন্যান্য কাজ করতো।" (সূরা ২১ আল আম্বিয়া : আয়াত ৮২)

কুরআনের এই বাণীসমূহ থেকে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, হযরত সুলাইমানের রাজ্যে নাগরিকদের জন্যে থাকার জায়গা এবং রান্না করা খাবার সরবরাহ করা হতো। ইসলামের বিধান হলো, নাগরিকদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্ব।

হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের ছিলো বিরাট নৌবহর। এগুলো যুদ্ধ এবং ব্যবসায়ের কাজে ব্যবহৃত হতো। সেকালে জাহাজ নৌকা ইঞ্জিনে চলতো না।

কারণ তখনো ইঞ্জিন আবিষ্কার হয়নি। এগুলো চলতো বাতাসে। বাতাসের অনুকূলে পাল তুলে দেয়া হতো। কিন্তু মহান আল্লাহ সুলাইমান আলাইহিস সালামের জন্যে বাতাসকে বশীভূক্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁর নৌবহর যেদিকে যেতো, বাতাস সেদিকেই বইতো। তাই অনেক দূরের পথ তিনি অল্প সময়েই পাড়ি দিতে পারতেন। তাছাড়া হযরত সুলাইমানের সময় বিপুল তামার খনি আবিষ্কার হয়। তাঁরা তামা দিয়ে সব রকমের গড়ন ও উন্নয়নের কাজ করতেন। মহান আল্লাহ বলেন :

"আমি সুলাইমানের জন্যে বাতাসকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম। ফলে সকালে সে এক মাসের পথ চলতো আর সন্ধ্যায় চলতো একমাসের পথ। তাছাড়া আমি তার জন্যে গলিত তামার ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিয়েছিলাম। (সূরা ৩৪ সাবা : ১২)

এভাবে আল্লাহ তাঁর প্রিয় দাস সুলাইমানকে নবুয়্যত দান করেন, রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেন এবং সেই সাথে দান করেন এমন অনেক লৌকিক ও অলৌকিক ক্ষমতা, যা অন্য আর কাউকেও দান করেননি। আল্লাহর দেয়া এসব নিয়ামতের সাহায্যে হযরত সুলাইমান অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। তিনি একটি পরিপূর্ণ ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলাম প্রতিষ্ঠার ফলে দেশের সকল মানুষ সুখে শান্তিতে ও পরম আনন্দে দিনাতিপাত করে। যেখানেই আল্লাহর দেয়া আইন ও বিধানের ভিত্তিতে দেশ চালানো হয়। সেখানেই মানুষ সব রকম সুখ শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করে।

পিঁপড়েরা ভয় পেলো

একদিন হযরত সুলাইমান তাঁর সৈন্য সামন্ত নিয়ে সিরিয়ার দিকে কোথাও যাচ্ছিলেন। তাঁর সাথে ছিলো মানুষ সৈনিক, জিন সৈনিক, পাখি সৈনিক। যেতে যেতে সামনে পড়লো এক উপত্যকা। এ উপত্যকায় বাস করতো লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ে। হযরত সুলাইমানের বাহিনী ওদের দিকে আসছে দেখে ওরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো। ওদের ছিলো এক জাঁদরেল নেত্রী। নেত্রী সবাইকে ডেকে বললো: হে পিঁপড়েরা! জলদি করে নিজেদের গর্তে ঢুকে পড়ো। সুলাইমান আর তার সেনাবাহিনী আসছে। তোমরা গর্তে না ঢুকলে তারা তোমাদের পিষে রেখে যাবে এবং তোমরা যে পিষে ভর্তা হয়ে গেছো তা তারা টেরও পাবেনা।'

হযরত সুলাইমান পিঁপড়েদের নেত্রীর কথা শুনে হেসে ফেললেন। আর সাথে সাথে মহান আল্লাহর দরবারে নিবেদন করলেন : ওগো আমার প্রভু! আমাকে তৌফিক দাও, আমি যেনো তোমার সেই সব দান ও অনুগ্রহের শোকর আদায় করতে থাকি, যা তুমি আমাকে এবং আমার পিতামাতাকে দিয়েছো। আর আমি যেনো এমন সংস্কার সংশোধনের কাজ করি, যা তুমি পছন্দ করো। (সূরা ২৭ আন নামল : আয়াত ১৮-১৯)

দেখলেন তো পিঁপড়েদের কাণ্ড! আপনারা কিন্তু পিঁপড়েদের মতো ভীরু হবেন না। আপনারা হবেন হযরত সুলাইমানের মতো বুদ্ধিমান বীর।

হুদ হুদ কি উধাও হলো?

সুলাইমান আলাইহিস সালামের সেনাবাহিনীতে ছিলো এক দুর্দান্ত পাখি। ওর নাম 'হুদহুদ'। সে হয়তো 'পাখি রেজিমেন্টের' অধিনায়ক ছিলো। পিঁপড়েদের উপত্যকা পার হবার পর হযরত সুলাইমান পাখি বাহিনীর খোঁজ নিলেন। কিন্তু দেখলেন 'হুদহুদ' নেই। সে উধাও। না বলেই সে কোথাও চলে গেছে। কী হয়েছে তার? ওকে খোঁজ করে না পাওয়ায় হযরত সুলাইমানের ভীষণ রাগ হলো। তিনি ঘোষণা দিলেন : 'আমি ওকে কঠিন শাস্তি দেবো, হয়তো জবাই করে ফেলবো। অথবা তাকে যুক্তিসংগত কারণ দেখাতে হবে।'

বলতে না বলতেই হুদহুদ এসে হাযির। এসেই সে বললো : হুজুর! আমি আপনার জন্য এমন একটা খবর নিয়ে এসেছি যা আপনি জানেন না। আমি সাবা জাতির খবর নিয়ে এসেছি। এক জাঁদরেল মহিলা তাদের সম্রাজ্ঞী। তার সাম্রাজ্যে সব ধরনের উপায় উপকরণ বিপুলভাবে মওজুদ। তার সিংহাসন অত্যন্ত জমকালো। তবে সম্রাজ্ঞী আর তার জাতির লোকেরা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সাজদা করে। শয়তান তাদের কার্যকলাপ তাদের সামনে চাকচিক্যময় করে দিয়েছে। সে তাদেরকে বিপথে পরিচালিত করে, তাই তারা সরল সোজা পথ দেখতে পায়না।'

এক ঐতিহাসিক চিঠি

হুদহুদের বক্তব্য শুনে হযরত সুলাইমান বললেন : তুমি যেসব কথা বললে তা সত্য না মিথ্যা এখনই আমি পরীক্ষা করবো। একথা বলে তিনি সাবার সম্রাজ্ঞীর কাছে একটি চিঠি লিখলেন। হুদহুদকে চিঠিটা দিয়ে বললেন, চিঠিটা নিয়ে রাণীর সামনে ফেলো। তারপর লক্ষ্য করবে, চিঠি পড়ে তাদের প্রতিক্রিয়া কী হয়?

যে কথা সে কাজ। হুদহুদ চিঠি নিয়ে রাণীর সামনে ফেললো। রাণী সুলাইমানের চিঠি পেয়ে হতবাক হয়ে গেলেন। সাথে সাথে মন্ত্রীদের বৈঠক ডাকলেন। বললেন, আমার কাছে একটি সম্মানিত ও গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পৌঁছেছে। চিঠিটি পাঠিয়েছেন সুলাইমান। তিনি লিখেছেন :

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আমার অবাধ্য হয়োনা। অনুগত হয়ে আমার কাছে হাজির হয়ে যাও।'

চিঠি পড়ে শুনাবার পর রাণী বললেন : 'হে জাতীয় নেতৃবৃন্দ। আমার সামনে এখন যে সমস্যা দেখা দিয়েছে সে বিষয়ে আপনারা আমাকে পরামর্শ দিন। আমি তো আপনাদের উপস্থিতিতে ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিনা।

জাতীয় নেতারা বললেন : আমরা শক্তিধর যোদ্ধা জাতি। ফায়সালা দেয়ার দায়িত্ব আপনার। আপনি ভেবে দেখুন কি ফায়সালা দেবেন। আমরা আপনার হুকুম তামিল করার জন্যে প্রস্তুত।

রাণী বললেন : রাজ রাজড়ারা যখন কোনো দেশে ঢুকে পড়ে, তখন সে দেশটিকে ধ্বংস করে ছাড়ে। সেখানকার সম্মানিত লোকদের লাঞ্ছিত করে। সব সময় এরকমই হয়ে আসছে। বরং আমি সুলাইমানের কাছে একটি উপঢৌকন পাঠিয়ে দেখি, আমার দূত কি জবাব নিয়ে আসে।

রাণীর উপঢৌকন

রাণীর সভাসদগণ রাণীর মতকেই সঠিক মনে করলেন। ফলে রাণী অনেক হাদিয়া, তোহফা ও উপঢৌকনসহ হযরত সুলাইমানের কাছে একজন দূত পাঠিয়ে দিলেন। অনেক দিনের পথ পাড়ি দিয়ে দূত এসে পৌঁছালো এবং হযরত সুলাইমানের সামনে রাণীর উপঢৌকন পেশ করলো। এগুলো দেখে তিনি রাণীর দূতকে বললেন : তোমরা কি অর্থ সম্পদ দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি দিয়েছেন। এগুলো নিয়ে রাণীর কাছে ফেরত যাও। আমি এমন এক সেনাবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে পাঠাবো, তোমরা যার মোকাবেলাই করতে পারবেনা।

রাণীর দূত হযরত সুলাইমানের কথা শুনে এবং তাকে আল্লাহ যেসব সাজ সরঞ্জাম দিয়েছেন সেগুলো সচোখে দেখে নিজেকে লজ্জিত মনে করলেন। তিনি ফিরে গিয়ে রাণীকে সবকিছুর রিপোর্ট দিলেন। রাণীও হযরত সুলাইমানের উচ্চমর্যাদা ও আদর্শের কথা অনুভব করলেন। রাণী সব দিক চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি নিজেই সুলাইমানের সাথে সাক্ষাত করতে যাবেন।

সুলাইমানের দরবারে সাবার রাণী

সাবার রাণী জেরুজালেম অভিমুখে রওয়ানা করলেন। রাণীর নাম কি আপনারা জানেন? রাণীর নাম কুরআনে উল্লেখ নেই। তবে ইসরাঈলি বর্ণনায় রাণীর নাম বলা হয়েছে বিলকিস। দীর্ঘ পথ পাড়ি জমিয়ে রাণী বিলকিস আসছেন। পথের দূরত্বটা আপনারা জানেন? তবে শুনুন সাবার রাজধানী ছিলো মায়ারিব। সাবা ছিলো বর্তমানকার ইয়েমেন দেশ জুড়ে। ইয়েমেনের বর্তমান রাজধানী সানা থেকে মায়ারিব ৫৫ মাইল উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত। মায়ারিব থেকে হযরত সুলাইমানের রাজধানী বাইতুল মাকদাসের দূরত্ব কমপক্ষে দেড় হাজার মাইল। এই দেড় হাজার মাইল পথ পাড়ি জমিয়ে বিলকিস রাণী আসছেন।

এদিকে রাণী হযরত সুলাইমানকে তাঁর যাত্রার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। হযরত সুলাইমান যখন তাঁর আসার খবর পান, তখন রাণী বাইতুল মাকদাসের কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। কিন্তু রাণী পৌঁছুলে তাঁকে বসতে দেবেন কিসে?

হযরত সুলাইমান ভাবলেন, রাণীর সিংহাসনটাই আনিয়ে নেয়া যাক। তার নিজের সিংহাসনেই তাকে বসতে দেয়া হবে।

সুলাইমান তাঁর সভাসদদের বললেন, তারা অনুগত হয়ে আমার কাছে আসার আগেই তোমাদের মধ্যে কে রাণীর সিংহাসনটা আমার কাছে নিয়ে আসতে পারো? বিশাল এক জিন উঠে বললো : হুজুর, আপনি আপনার আসন থেকে উঠবার আগেই আমি সেটা আপনার সামনে হাজির করতে পারবো। আমি এ কাজের ক্ষমতা রাখি। তাছাড়া আমি অত্যন্ত বিশ্বস্ত।

কিন্তু হযরত সুলাইমান চান এর চাইতেও দ্রুত সিংহাসনটি আনা হোক। কে আছে চোখের পলকে ওটি আনতে পারে? 'আমি' এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন। এ লোকটির কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিলো। তিনি বললেন, হুজুর! আমি আপনার চোখের পলক ফেলার আগেই তা আপনাকে এনে দিচ্ছি।

হযরত সুলাইমান পলক ফেলে চোখ খুলতেই দেখতে পেলেন, সাবার রাণীর সিংহাসনটা তাঁর সামনেই হাজির। তিনি আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলে উঠলেন : এটা আমার প্রতি আমার প্রভুর অনুগ্রহ। তিনি আসলে আমাকে পরীক্ষা করতে চান, আমি তাঁর কৃতজ্ঞ থাকি নাকি অকৃতজ্ঞ হই? যে কৃতজ্ঞ হয়, সেটা তার নিজের জন্যেই কল্যাণকর।'

দেড় হাজার মাইল দূর থেকে এক ব্যক্তি চোখের পলকে কী করে সিংহাসনটি আনলো তা কি আপনারা বলতে পারেন? তাছাড়া তখন কিন্তু রেল, মটরগাড়ি, উড়োজাহাজ এসব কিছুই আবিষ্কার হয়নি। আসলে জ্ঞান থাকলে মানুষ অনেক অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারে। এই লোকটির কাছে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান ছিলো। আর এই জ্ঞানের বলেই তিনি এমন অসম্ভব কাজটি সম্ভব করেছিলেন।

তারপর কি হলো?

তারপর হযরত সুলাইমান নিজের লোকদের বললেন, সিংহাসনটি পুনর্বিন্যাস তাঁর সামনে রাখো। দেখি, তিনি চিনতে না পারেন কিনা?

রাণী এলেন। তাঁকে জমকালো অভ্যর্থনা জানানো হয় এবং রাজ মহলে আনা হয়। এখানে তাঁর সিংহাসনটি রাখা ছিলো। তাতেই তাকে বসতে দেয়া হয়। সিংহাসনটির প্রতি ইংগিত করে তাকে বলা হলো : আচ্ছা সম্রাজ্ঞী! আপনার সিংহাসনটি কি এমন?' সাথে সাথে রাণী বলে উঠলেন : 'এটিই যেনো সেটি।'

রাণী অত্যন্ত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, এটা সম্পূর্ণ অলৌকিক কাজ, আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া কোনো মানুষের পক্ষে এমনটি করা সম্ভব নয়।

রাণীর ইসলাম গ্রহণ

রাণী বললেন, আমরা আপনার সম্পর্কে আগেই জানতে পেরেছি, সে জন্যেই

তো নত হয়ে এলাম। এরপর যে প্রাসাদে রাণীর থাকার ব্যবস্থা করা হয়, রাণীকে তাতে আগমন করতে বলা হয়। রাণী সে প্রাসাদের দিকে রওয়ানা করলেন। রাণী প্রাসাদটি দেখে মনে করলেন জলাশয়। তিনি তা পার হবার জন্যে পায়ের গোড়ালির দিক থেকে পরিধেয় উঠিয়ে নিলেন। কিন্তু আসলে রাণী ব্যাপারটি বুঝতে পারেননি।

সুলাইমান বললেন : 'এতো পানি নয়, কাঁচের মসৃণ মেঝে।' এবার রাণী হযরত সুলাইমানের সঠিক মর্যাদা আরো স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলেন। এতো বড় জমকালো প্রাসাদের অধিকারী হয়েও সুলাইমানের চমৎকার ব্যবহার, নিরহংকার জীবন যাপন এবং এক আল্লাহমুখী জীবনধারা দেখে রাণী ইসলামের মর্ম উপলব্ধি করেন এবং ঈমানের ঘোষণা দেন। তিনি বলে উঠেন: "হে আমার রব! এতোদিন আমি আমার নিজের উপর ভীষণ অবিচার করেছি। আজ আমি সুলাইমানের বিশ্বজগতের মালিকের প্রতি আত্মসমর্পণ করলাম।" ('পিঁপড়েরা ভয় পেলো' থেকে 'রাণীর ইসলাম গ্রহণ' পর্যন্ত দেখুন : আল কুরআন, সূরা ২৭ আন নামল : আয়াত ১৫-৪৪)

হযরত সুলাইমানের মৃত্যু

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে হযরত সুলাইমানের মতো শক্তি ক্ষমতা আর কোনো রাজা বাদশাহকে দেননি। শুধু তাঁকেই দিয়েছিলেন। তাঁর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ সীমাহীন। কিন্তু তাই বলে তিনি চিরঞ্জীব ছিলেন না। তাঁকেও মরতে হয়েছে। আল্লাহর অমোঘ প্রাকৃতিক বিধান হলো, প্রতিটি মানুষকেই মরতে হবে। সে যেই হোকনা কেন, যেখানেই থাকনা কেন, মৃত্যুর হাত থেকে তার রেহাই নেই। সকল মানুষ, সকল রাজা বাদশা এবং সকল নবী রসূলের মতো হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামও মৃত্যুবরণ করেছেন। তবে তাঁর মৃত্যুর ঘটনাটা বেশ বিস্ময়কর।

আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন হযরত সুলাইমানের মৃত্যুর ফায়সালা আসে, তখন তিনি একটি লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। জিনেরা তাঁর নির্দেশে বায়তুল মাকদাসে একটি বড় ধরনের নির্মাণ কাজ করছিল। তিনি লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সে নির্মাণ কাজ তদারকি করছিলেন। এসময় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর লাশ লাঠির উপর ভর করা অবস্থায় দাঁড়িয়েই ছিলো। তিনি যে মারা গেছেন জিনেরা তা টেরই পায়নি। কিন্তু পরে তাঁর লাঠিটা ঘুনে খেয়ে ফেলায় তাঁর লাশ মাটিতে পড়ে গেলো। এবার জিনেরা আফসুস করলো, হায় আমরা যদি গায়েবের খবর জানতাম, তবে তো এ লাঞ্ছনা ও কষ্টের মধ্যে এতোদিন আমাদের লেগে থাকতে হতোনা। (দেখুন সূরা সাবা, আয়াত : ১৪)

এ ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, সব মানুষকেই মরতে হবে আর জিনেরা গায়েব বিষয়ে কোনো জ্ঞান রাখেনা।

আমরা কী শিখলাম?

আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত সুলাইমানের জীবন কাহিনী থেকে আমরা কী শিখলাম? অনেক অনেক শিক্ষা রয়েছে তাঁর জীবনাদর্শে।

আসলে পৃথিবীতে নবীদের মতো শ্রেষ্ঠ মানুষ আর কেউ হয়না। সে কারণেই নবীরা হয়ে থাকেন আদর্শ মানুষ। তাঁদের জীবন চরিত হয় অনুসরণীয় অনুকরণীয়। তাহলে এবার আসুন দেখি আল্লাহর নবী সুলাইমান আলাইহিস সালামের জীবন কাহিনী থেকে আমরা কি শিখলাম? তাঁর কাছ থেকে আমাদের জন্যে শিক্ষণীয় হলো :

১. তাঁর পিতা ছিলেন একজন নবী, একজন আদর্শ মানুষ। সুলাইমান ছোটবেলা থেকেই নবীর আনুগত্য করেন, নবীকে অনুসরণ করেন। নবীর আদর্শে নিজেকে গড়ে তোলেন।

২. তিনি ছিলেন অনেক বড় জ্ঞানী। জ্ঞানার্জনে ছিলো তাঁর প্রবল উদ্যম। জ্ঞানের সাথে ছিলো তাঁর প্রখর বুদ্ধি। তিনি সবসময় জ্ঞান ও বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করতেন।

৩. তিনি নিজেকে অত্যন্ত দক্ষ যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতা হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। ফলে আল্লাহও তাঁকে দান করেন অফুরন্ত নিয়ামত।

৪. তিনি বিরাট শক্তিধর সম্রাট এবং মানুষ, জিন, পাখি ও অন্যান্যদের আনুগত্য লাভ এবং বিপুল পরিমাণ সাজ সরঞ্জাম ও অর্থ সম্পদের অধিকারী হয়েও মহান আল্লাহর একান্ত অনুগত, বিনত ও কৃতজ্ঞ দাস হয়ে জীবন যাপন করেন।

৫. তিনি সব সময় আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতেন এবং তাঁর কৃতজ্ঞ দাস হিসেবে জীবন যাপন করতে পারার তৌফিক চাইতেন।

৬. তিনি রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করেন এবং আল্লাহর দেয়া আইন, বিধান ও অনুশাসন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

৭. তিনি সব সময় ন্যায়বিচার ও সুবিচার করতেন।

৮. তিনি মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাতেন।

আসুন, আমরা আমাদের জীবনে হযরত সুলাইমানের এসব আদর্শ অনুসরণ করি। আমাদের জীবনকেও উন্নত ও শ্রেষ্ঠ মানুষের জীবন হিসেবে গড়ে তুলি।

কুরআনে উল্লেখ

এবার আপনাদের বলে দিচ্ছি কুরআন থেকে হযরত সুলাইমানকে জানার সূত্র। আল কুরআনে হযরত সুলাইমানের নাম ১৭ (সতের) বার উল্লেখ হয়েছে। যেসব জায়গায় উল্লেখ হয়েছে সেগুলো হলো : সূরা আল বাকারা : ১০২, ১০২;

আননিসা : ১৬৩; আল আন'আম : ৮৪, আল আম্বিয়া : ৭৮, ৭৯, ৮১; আন নামল : ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ৩০, ৩৬, ৪৪; সাবা : ১২; সোয়াদ : ৩০, ৩৪।

তবে বিস্তারিত ঘটনা আপনারা জানতে পারবেন সূরা আল আম্বিয়া : ৭৮-৮২ আয়াতে। সূরা আন নামল : ১৫-৪৪ আয়াতে। সূরা সাবা : ১২-১৪ আয়াতে এবং সূরা সোয়াদ : ৩০-৪০ নম্বর আয়াতে।

আপনারা তো নিশ্চয়ই জানেন, আল কুরআনের বাংলা অনুবাদ হয়েছে, তফসির হয়েছে। একবার সরাসরি কুরআন থেকে হযরত সুলাইমানের জীবন কাহিনী পড়ে নিন।

❖

ইলিয়াস

আলাইহিস সালাম

ইলিয়াস আলাইহিস সালাম ছিলেন বনি ইসরাঈলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নবী। ছিলেন বড় ইবাদত গুজার, আল্লাহভীরু এবং বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কুরআন মজিদে তাঁর নাম তিনবার উল্লেখ হয়েছে। উল্লেখ হয়েছে সূরা আন'আমের ৮৫ আয়াতে এবং সূরা আস্ সাফফাতের ১২৩ ও ১৩০ আয়াতে। তিনি আল্লাহর কাছে বড় মর্যাদাবান ও সম্মানিত ছিলেন। কুরআন মজিদে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি সালাম বর্ষিত হয়েছে। বাইবেলে তাঁর নাম বলা হয়েছে 'ইলিয়া'। আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম।

হযরত ইলিয়াসের কাল ও এলাকা

আধুনিক কালের গবেষকগণ খৃষ্টপূর্ব ৮৭৫ থেকে ৮৫০ এর মাঝামাঝি সময়টাকে তাঁর নবুয়্যত কাল বলে চিহ্নিত করেছেন। হযরত ইলিয়াস ছিলেন জিল'আদের অধিবাসী। সেকালে জিল'আদ বলা হতো বর্তমান জর্দানের উত্তরাঞ্চলকে। এলাকাটি ইয়ারমুক নদীর দক্ষিণে অবস্থিত। আপনি কি কখনো সে এলাকায় গিয়েছেন?

কুরআনে তাঁর মর্যাদার বর্ণনা

কুরআন মজিদে ইলিয়াস আলাইহিস সালামকে হযরত ইবরাহিমের বংশধর শ্রেষ্ঠ নবীদের একজন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরা আল আন'আমে বলা হয়েছে : "ইবরাহিমকে আমি ইসহাক ও ইয়াকুবের মতো সন্তান দিয়েছি। তাদের সবাইকে সত্য পথ প্রদর্শন করেছি, যা প্রদর্শন করেছিলাম ইতোপূর্বে নূহকে। তাছাড়া তার বংশধরদের মধ্য থেকে দাউদ, সুলাইমান, আইউব, ইউসুফ, মূসা এবং হারূণকে সঠিক পথ দেখিয়েছি। উপকারী লোকদের আমি এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি। তার সন্তানদের মধ্য থেকে যাকারিয়া, ইয়াহয়িয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকেও সঠিকপথ প্রদর্শন করেছি। এরা প্রত্যেকেই ছিলো যোগ্য সংস্কারক। তারই বংশ থেকে ইসমাঈল, আলইয়াসা, ইউনুস এবং লুতকেও সঠিক পথ দেখিয়েছি। এদের প্রত্যেককে আমি বিশ্ববাসীর উপর মর্যাদা দান করেছি।" (সূরা আল আন'আম : ৮৪-৮৬)

তাঁর সংস্কারমূলক কাজ

কুরআনের বর্ণনা থেকেই আপনারা জানতে পারলেন হযরত ইলিয়াস কতো বিরাট মর্যাদার অধিকারী নবী ছিলেন এবং আল্লাহর কতোটা প্রিয় ছিলেন? সূরা

আস-সাফফাতে তাঁর সংস্কারমূলক আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ চমৎকার বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে :

"আর ইলিয়াসও ছিলো একজন রসূল। স্মরণ করো, যখন সে তার জাতিকে বলেছিল, তোমরা কি সতর্ক হবেনা? তোমরা কি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদের প্রভু মহামহিম স্রষ্টা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে বা'আলের পূঁজা অর্চনা করবে? কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করলো। কাজেই এখন অবশ্যি তাদের হাজির করা হবে শাস্তি ভোগের জন্যে, তবে আল্লাহর নিষ্ঠাবান দাসদের নয়। আর পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে আমি ইলিয়াসের সুখ্যাতি অব্যাহত রেখেছি। ইলিয়াসের প্রতি সালাম। উপকারী লোকদের আমি এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি। সে ছিলো আমার একনিষ্ঠ মুমিন দাসদেরই একজন।" (সূরা ৩৭ আস সাফফাত : আয়াত ১২৩-১৩২)

বা'আল কে?

আল্লাহর উপরোক্ত বাণী থেকে আমরা জানতে পারলাম হযরত ইলিয়াসের জাতি বা'আলের পূজা অর্চনা করতো। বা'আলের কাছেই প্রার্থনা করতো এবং তাকেই খোদা বলে ডাকতো। তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে বা'আলকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছিল। আপনারা কি জানেন এই বা'আল কে?

'বা'আল' এর আভিধানিক অর্থ স্বামী বা পতি। প্রাচীন কালে সিরিয়া ও জর্দান অঞ্চলে পূজনীয়, উপাস্য, প্রভু ও দেবতা অর্থে এ শব্দটি ব্যবহার করা হতো। সেকালে লেবাননের ফিনিকি সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের সবচে' বড় দেবতাটিকে বলতো বা'আল। এ ছিলো পুরুষ দেবতা। এ মূর্তিটির স্ত্রীর নাম ছিলো আশারত। এ ছিলো ওদের সবচে' বড় দেবী। আবার কোনো কোনো সম্প্রদায় সূর্য পূজা করতো। তারা সূর্যকেই বা'আল বলতো। আর চন্দ্র অথবা শুক্রগ্রহ ছিলো তাদের আশারত। ইতিহাস থেকে জানা যায়, সেকালে বেবিলন থেকে নিয়ে মিশর পর্যন্ত গোটা মধ্যপ্রাচ্যে বা'আলের পূজা বিস্তার লাভ করে। বিশেষ করে লেবানন, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের মুশরিক জাতিগুলো বা'আল পূজায় আপাদমস্তক ডুবে গিয়েছিল। এবার আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন বা'আল কে?

বনি ইসরাঈলের বা'আল পূজা

হযরত মূসা আলাইহিস সালামের পরে বনি ইসরাঈলিদের মধ্যে বা'আল পূজার প্রবণতা শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত তারা বা'আল পূজায় চরম আসক্ত হয়ে পড়ে। জানা যায় তারা কোনো একস্থানে বা'আলের যজ্ঞবেদী তৈরি করে নিয়েছিল এবং সেখানে তারা বা'আলের নামে বলিদান করতো। একবার একজন খাঁটি মুমিন

এই বেদীটি ভেঙ্গে ফেলে। পরদিন লোকেরা সমাবেশ করে তার মৃত্যুদণ্ড দাবি করে। অবশেষে হযরত সামুয়েল, তালুত, দাউদ এবং সুলাইমান বনি ইসরাঈলকে মূর্তি পূজার কলুষতা থেকে মুক্ত করেন। তারা মধ্যপ্রাচ্যে বিরাট শক্তিশালী ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। সে রাষ্ট্র থেকে শিরক ও মূর্তিপূজা উচ্ছেদ করেন।

কিন্তু হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রহুবমের অযোগ্যতার কারণে বনি ইসরাঈল রাজ্য ভেঙ্গে দুভাগ হয়ে যায়। একভাগে ছিলো বাইতুল মাকদাস সহ দক্ষিণ ফিলিস্তিন নিয়ে গঠিত ইহুদি রাষ্ট্র। আর উত্তর ফিলিস্তিনের নাম থাকে ইসরাঈল রাষ্ট্র।

ইসরাইল রাষ্ট্রের লোকেরা আবার মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা শিরক, মূর্তিপূজা, ফাসেকি, চরিত্রহীনতা এবং যাবতীয় বদ আমলের মধ্যে নিমজ্জিত হয়। বা'আলকে তারা দেবতা বানিয়ে নেয়। তারা নবীদের বংশধর হয়েও আল্লাহকে বাদ দিয়ে বা'আলের উপাসনায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

মুক্তির বাণী নিয়ে এলেন ইলিয়াস

বনি ইসরাঈল শিরক ও চরম পাপাচারের কারণে ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। এ সময় মহান আল্লাহ ইলিয়াসকে নবুয়্যত দান করেন। বনি ইসরাঈলকে সতর্ক করবার নির্দেশ দেন। তাদেরকে মুক্তি ও কল্যাণের পথে আসার আহ্বান জানাতে বলেন।

ইলিয়াস শাসকবর্গ ও জনগণের সামনে হাজির হন। তাদের সতর্ক করে দেন। আল্লাহকে ভয় করতে বলেন। মূর্তিপূজা ও পাপাচার ত্যাগ করতে বলেন। বা'আলকে পরিত্যাগ করতে বলেন। তাদেরকে আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে জীবন যাপন করতে বলেন।

তখন ইসরাঈলের রাজা ছিলো আখিয়াব। আখিয়াব লেবাননের (সেকালে লেবাননকে বলা হতো সাঈদা) মুশরিক রাজ কন্যাকে বিয়ে করে নিজেও মুশরিক হয়ে পড়েন। হযরত ইলিয়াস আখিয়াবের কাছে এসে তাকে বলে দেন, তোমার পাপের কারণে এখন আর ইসরাঈল রাজ্যে এক বিন্দু বৃষ্টিও হবেনা। শিশির এবং কুয়াশাও পড়বেনা।

আল্লাহর নবীর উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য হলো। সাড়ে তিন বছর পর্যন্ত ইসরাঈল রাষ্ট্রে বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে থাকলো। এবার আখিয়াবের হুঁশ হলো। সে হযরত ইলিয়াসকে সন্ধান করে আনলো। অনুনয় বিনয় করে হযরত ইলিয়াসকে বৃষ্টির জন্যে দোয়া করতে বললো। হযরত ইলিয়াস এই সুযোগে বা'আলকে মিথ্যা প্রমাণ করে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি আখিয়াবকে শর্ত দিলেন, একটি

জনসমাবেশ ডাকতে হবে। সেখানে বা'আলের পূজারীরা বা'আলের নামে বলিদান করবে আর আমি আল্লাহ্‌র নামে কুরবানি করবো। গায়েবি আগুন এসে যে পক্ষের কুরবানিকে জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দিয়ে যাবে সে পক্ষের মাবুদকেই সত্য বলে মেনে নিতে হবে। আখিয়াব এ শর্ত মেনে নিলো। তারপর কি হলো?

তারপর আখিয়াব সাধারণ জনসমাবেশ ডাকলো। সেখানে সাড়ে আটশ বা'আল পূজারি একত্রিত হলো। কুরবানি হলো, বলিদান হলো। তারপর? অতপর আকাশ থেকে আগুন এসে হযরত ইলিয়াসের কুরবানি ভষ্মিভূত করে দিয়ে গেলো। সমস্ত জনগণের সামনে বা'আল মিথ্যা খোদা বলে প্রমাণিত হলো। জনগণ বা'আল পূজারিদেরকে হত্যা করলো। হযরত ইলিয়াস সেখানেই সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্যে দোয়া করলেন। সাথে সাথেই আকাশে মেঘ করলো। প্রচুর বৃষ্টিপাত হলো। জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

নবীর উপর নির্যাতন

কিন্তু আখিয়াব ছিলো স্ত্রৈণ। স্ত্রৈণ মানে স্ত্রীর অনুগত। সে স্ত্রীর গোলামি থেকে মুক্ত হতে পারেনি। তার মুশরিক স্ত্রী হযরত ইলিয়াসের ঘোরতর শত্রু হয়ে পড়ে। স্ত্রীর খপ্পরে পড়ে আখিয়াব আল্লাহর নবীর উপর নির্যাতন শুরু করে। তার স্ত্রী ইসাবেলা ঘোষণা করে দেয়, বা'আল পূজারীদের যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, ইলিয়াসকেও সেভাবে হত্যা করা হবে। তারা অত্যাচার নির্যাতনের দাপটে জনগণের মুখ বন্ধ করে দিলো। ইলিয়াস একাকী হয়ে পড়লেন। তিনি বাধ্য হয়ে দেশ থেকে হিজরত করেন এবং সিনাই পর্বতের পাদদেশে আশ্রয় নেন।

সংস্কার কাজ চালিয়ে যান

হযরত ইলিয়াস কয়েক বছর সিনাইর পাদদেশে অবস্থান করেন। এরি মধ্যে দক্ষিণ ফিলিস্তিনের ইহুদি শাসক ইয়াহুরাম ইসরাঈল রাজ্যের শাসক আখিয়াবের মুশরিক কন্যাকে বিয়ে করে। তার প্রভাবে ইহুদি রাষ্ট্রেও ব্যাপক মূর্তিপূজার প্রচলন শুরু হয়। ইলিয়াস এখানে আসেন। তাদের সতর্ক করেন। তাদের আল্লাহর পথ দেখান। মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করতে বলেন। মর্মস্পর্শী অনেক উপদেশ দিয়ে রাজা ইয়াহুরামকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রও প্রদান করেন। কিন্তু তারা শিরক, মূর্তিপূজা ও পাপাচার থেকে বেরিয়ে আসেনি। শেষ পর্যন্ত রাজা ধ্বংস হয়ে যায়।

কয়েক বছর পর ইলিয়াস আবার ইসরাঈল রাষ্ট্রে ফিরে আসেন। আখিয়াব ও তার পুত্র আখযিয়াকে সঠিক পথে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু তারাও আল্লাহর পথে ফিরে আসেনি। অবশেষে হযরত ইলিয়াসের বদ দোয়ায় আখিয়াবের রাজ পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়।

হযরত ইলিয়াসের সুখ্যাতি

জীবদ্দশায় হযরত ইলিয়াসের প্রতি চরম অত্যাচার নির্যাতন চালালেও তাঁর মৃত্যুর পর বনি ইসরাঈল তাঁর ভক্ত অনুরক্ত হয়ে পড়ে। বাইবেল থেকে জানা যায়, বনি ইসরাঈল ধারণা করতো, ইলিয়াসকে আল্লাহ তা'আলা উঠিয়ে নিয়ে গেছেন এবং তিনি আবার পৃথিবীতে আসবেন। তারা ইলিয়াসের আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলো। তাঁর আটশ বছর পর হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম হয়। তিনি তাঁর সাথিদের বলে যান, ইলিয়া (ইলিয়াস) আটশ বছর আগে অতীত হয়ে গেছেন। তিনি আর পৃথিবীতে আসবেন না। যাই হোক, পরবর্তী লোকদের মাঝে হযরত ইলিয়াসের প্রচুর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সেকথাই মহান আল্লাহ কুরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন :

"আর পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে আমি ইলিয়াসের সুখ্যাতি অব্যাহত রেখেছি।" (সূরা ৩৭ আস সাফফাত : আয়াত ১২৯)

'সালামুন আ'লা ইলিয়াসিন।'

❖

আলইয়াসা

আলাইহিস সালাম

আল কুরআনে হযরত আলইয়াসা

"ইসমাঈল, আলইয়াসা, ইউনুস এবং লুত-এদের প্রত্যেককেই আমি বিশ্ববাসীর উপর মর্যাদাবান করেছি।" (সূরা ৬ আল আন'আম : আয়াত ৮৬)

"আর ইসমাঈল আলইয়াসা ও যুলকিফ্‌ল-এর কথা স্মরণ করো। এরা প্রত্যেকেই ছিলো মহোত্তম। (সূরা ৩৮ সোয়াদ : আয়াত ৪৮)

আল কুরআনে হযরত আলইয়াসার নাম এই দু'টি স্থানেই উল্লেখ হয়েছে। মহান আল্লাহ তাকে তাঁর শ্রেষ্ঠ নবী রসূলগণের মধ্যে গণ্য করেছেন। তিনি তাঁকে দিয়েছিলেন অনেক বড় মর্যাদা ও উচ্চাসন। তিনি ছিলেন বনি ইসরাঈলের শ্রেষ্ঠ নবীগণের অন্যতম। ইহুদি খৃষ্টানদের কাছে তাদের গ্রন্থাবলিতে তিনি ইলিশা (Elisha) হিসেবে পরিচিত।

প্রশিক্ষণ ও মনোনয়ন

আলইয়াসা ছিলেন হযরত ইলিয়াসের ছাত্র ও শিষ্য। হযরত ইলিয়াস তাঁকে উত্তম প্রশিক্ষণ দিয়ে যোগ্য করে গড়ে তোলেন। কুরআন মজিদে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো বিবরণ নেই। বাইবেলে বলা হয়েছে, আল্লাহ ইলিয়াসকে নির্দেশ প্রদান করেন আলইয়াসাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে যোগ্য করে গড়ে তুলতে। এ নির্দেশ অনুযায়ী ইলিয়াস হযরত আলইয়াসার বসবাসের এলাকায় গিয়ে পৌঁছেন।

ইলিয়াস দেখতে পান, আলইয়াসা বার জোড়া গরু নিয়ে জমিতে চাষ দিচ্ছেন। তিনি তাঁর পাশ দিয়ে যাবার কালে নিজের চাদর তাঁর গায়ে নিক্ষেপ করেন। সাথে সাথে আলইয়াসা ক্ষেতখামার চাষবাস ছেড়ে দিয়ে তাঁর সাথে চলে আসেন। প্রায় দশ বার বছর আলইয়াসা হযরত ইলিয়াসের প্রশিক্ষণাধীন থাকেন। অতপর ইলিয়াসকে উঠিয়ে নেবার পর আল্লাহ আলইয়াসাকে নবুয়্যত দান করেন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন, হযরত আলইয়াসা হযরত ইলিয়াসেরই চাচাতো ভাই ছিলেন।

সংশোধনের কাজ

হযরত ইলিয়াসের মৃত্যুর পর হযরত আলইয়াসা বলিষ্ঠভাবে ইসরাঈলি শাসক ও জনগণকে সংশোধনের পদক্ষেপ নেন। শির্‌ক, মূর্তিপূজা ও অনাচারের মূল

অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলো স্বয়ং রাজ পরিবার। হযরত আলইয়াসা তাদের সতর্ক করে দেন। আল্লাহর ভয় দেখান। কিন্তু কিছুতেই তারা আল্লাহর পথে আসতে রাজি হয়নি।

শেষ পর্যন্ত হযরত আলইয়াসা জনৈক যিহুকে রাজ পরিবারের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিলেন। যিহু রাজ পরিবারকে হত্যা করে এবং বা'আলের পূজা নিষিদ্ধ করে দেয়। কিন্তু জনগণের মনমগজে মূর্তি পূজার কুসংস্কার বদ্ধমূল হয়ে থাকে। হযরত আলইয়াসার মৃত্যুর পর পুনরায় ইসরাঈলি সমাজ শিরকের পূঁতিগন্ধময় গহ্বরে নিমজ্জিত হয়।

মাছওয়ালা নবী ইউনুস
আলাইহিস সালাম

"আর ইউনুস ছিলো অবশ্যি রসূলদেরই একজন।" (আল কুরআন ৩৮: ১৩৯)

ইউনুস কোন্ দেশের নবী?

হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম একজন সম্মানিত নবী ছিলেন। তাঁর ব্যাপারে সরাসরি কুরআনে বিস্তারিত আলোচনা হয়নি। হাদিস, তফসির এবং ইতিহাসের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি সিরিয়ার লোক ছিলেন এবং ইসরাঈল বংশের লোক ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আসিরিয়াবাসীর হিদায়াতের জন্যে ইরাক যেতে নির্দেশ দেন। সে হিসেবে তিনি ইরাকে গিয়ে আসিরিয়াবাসীকে আল্লাহর পথে আনবার চেষ্টা সংগ্রামে নিরত হন। ইতিহাস খ্যাত নিনোভা নগরী ছিলো এ জাতির প্রধান কেন্দ্রীয় শহর।

ইমাম বুখারি এবং অন্যান্য ইতিহাস বিশ্লেষকদের মতে তাঁর সময়কাল ছিলো খৃষ্টপূর্ব ৮৬০ থেকে ৭৮৪ সালের মাঝামাঝি সময়টা। এ সময় আসিরিয়াবাসী ছিলো অত্যন্ত দুধর্ষ ও প্রতাপশালী জাতি। তাদের রাজধানী নিনোভা নগরী ছিলো প্রায় ৬০ মাইল জুড়ে।[১] তখন এ জাতি বস্তুগত উন্নতির পথে অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। আজো দাজলা নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত বর্তমান মুসেল শহরের ঠিক বিপরীত দিকে সে জাতির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। ইউনুস আলাইহিস সালামকে তাদের নবী নিযুক্ত করায় কুরআন মজিদে তাদের 'কওমে ইউনুস' বা 'ইউনুসের জাতি'[২] বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ইউনুসের জাতির হঠকারিতা

হযরত ইউনুসের জাতি আসিরিয়াবাসী ছিলো কাফির মুশরিক। তারা আল্লাহর সাথে শিরক করতো। মূর্তিপূজা করতো। নানা রকম পাপাচারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে তারা। বৈষয়িক উন্নতি আর নৈতিক অধগতি তাদেরকে অন্যায় অনাচারের চরম সীমায় পৌছে দেয়। হযরত ইউনুস তাদের কাছে নিয়ে আসেন আদর্শের বাণী। তিনি তাদের শিরকের পথ ত্যাগ করতে বলেন। অন্যায় অনাচার এবং পাপ ও যুলুম ত্যাগ করতে বলেন। তিনি তাদের আল্লাহর পথে আসতে বলেন। ঈমানের পথে আসতে বলেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহর বিধান মতো জীবন যাপন করতে বলেন।

কিন্তু না, তারা আল্লাহর রসূলের কথায় কর্ণপাত করেনি। শিরক ত্যাগ করেনি। কুফরির পথ ছাড়েনি। পাপের পথ থে.কে ফিরে আসেনি। হযরত ইউনুস তাদের

অনেক বুঝালেন। কিন্তু তারা বুঝলনা। তারা হঠকারিতা করলো। তারা অহংকারে নিমজ্জিত হলো, পাপের মধ্যে ডুবে রইলো। নবীর ডাকে সাড়া না দিলে যে ধ্বংস হয়ে যেতে হয় সে বোধ তাদের উদয় হলোনা। চরম গাফিল হয়ে থাকলো তারা।

ধ্বংসের হুঁশিয়ারি

যখন তারা আল্লাহর নবীর আহ্বানে সাড়া দিলনা। আল্লাহর পথে এলোনা। মুক্তির ও কল্যাণের পথে এলোনা। তখন নবী দেখলেন, তাদের জন্যে ধ্বংস অবধারিত হয়ে গেছে। তিনি তাদের তিন দিন সময় দিলেন। বললেন, এর মধ্যে ফিরে না এলে আল্লাহর গজবে নিপতিত হবে। গোটা জনপদসহ ধ্বংস হয়ে যাবে। তিন দিনের মাথায় তোমরা নিরাশ হয়ে যাবে।

জনপদ ত্যাগ করলেন ইউনুস

তারা কুফরির উপর অটল হয়ে থাকলো। হযরত ইউনুস দেখলেন তাদের ধ্বংসের আর মাত্র একদিন বাকি। এখন তাদের ধ্বংস আর কেউ ঠেকাতে পারবেনা। তাই তিনি আগের রাত্রেই সেই জনপদ ত্যাগ করেন। যাত্রা করেন সেখান থেকে দূরে বহু দূরে। সামনেই ফোরাত নদী। নদী পার হবার জন্যে অন্যান্য যাত্রীদের সাথে উঠে পড়েন এক নৌকায়।

কিন্তু হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই নিনোভা ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন। এটা ছিলো নবী হিসেবে তাঁর জন্যে বেমানান। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি বেজার হন।

মাছের পেটে ইউনুস নবী

হযরত ইউনুস যে নৌকায় উঠেন সম্ভবত লোক বেশি হবার কারণে নৌকাটি কাঁপছিল এবং ডুবে যাবার উপক্রম হচ্ছিল। ফলে তারা লটারি করে একজনকে নৌকা থেকে ফেলে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। যেই কথা সেই কাজ। লটারি অনুষ্ঠিত হয়। লটারিতে কার নাম উঠে জানেন? লটারিতে হযরত ইউনুসের নাম উঠে। সাথে সাথে সবাই ধরে তাঁকে নদীতে ফেলে দেয়। তারা তো আর হযরত ইউনুসকে চিনতো না। মনে করেছিল হয়তো সাঁতার কেটে কিনারে চলে যাবে। অথবা তারা নিষ্ঠুর ছিলো। মনে করেছিল ডুবে মরে গেলেই বা আমাদের কি? তারপর কি হলো?

তারপর আল্লাহর হুকুমে বিরাট এক মাছ হা করে হযরত ইউনুসকে গিলে ফেলে। আল্লাহর হুকুমে মাছটি তাঁকে খাদ্য হিসেবে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেনি। বরং গোটা গিলে ফেলে পেটে ঢুকিয়ে রাখে। সম্ভবত ওটা ছিলো বিশাল আকারের তিমি মাছ। তিন দিন তিনি এই গভীর অন্ধকারে থাকেন। একেতো মাছের অন্ধকার পেট। তার উপর গভীর সমুদ্রের অন্ধকার তলদেশ। হযরত

ইউনুস বুঝতে পারেন, তিনি আল্লাহর নির্দেশ এবং অনুমতি ছাড়াই জাতিকে ত্যাগ করে আসায় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ পরীক্ষায় ফেলেছেন। ফলে তিনি দারুণ লজ্জিত এবং চরম অনুতপ্ত হন।

আল্লাহর সাহায্য চান তিনি

হযরত ইউনুস যখনই বুঝতে পারলেন মাছের পেটে তিনি জীবিত আছেন, সাথে সাথে দয়াময় আল্লাহকে ডাকতে শুরু করেন। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান। আল্লাহর কাছে কাঁদতে থাকেন। তাঁর এ সময়কার অবস্থা সম্পর্কে স্বয়ং মহান আল্লাহ বলেন :

"আর মাছওয়ালাকেও (ইউনুসকে) আমি দয়া করেছিলাম। স্মরণ করো, যখন সে রাগ করে চলে গিয়েছিল আর মনে করেছিল, আমি তাকে পাকড়াও করবোনা। শেষে তিমিরান্ধকার থেকে সে আমাকে ডাকলো। বললো : ওগো আল্লাহ! তুমি ছাড়া তো আর কোনো ইলাহ (ক্ষমতার মালিক ও ত্রাণকর্তা) নাই। পবিত্র তোমার সত্তা, আর আমি অবশ্যি অপরাধ করেছি।" (সূরা ২১ আল আম্বিয়া : আয়াত ৮৭)

তিন দিন তিন রাত আল্লাহর নবী ইউনুস আলাইহিস সালাম এভাবে আল্লাহকে ডাকলেন।

আল্লাহ তাঁকে উদ্ধার করেন

অতপর মহান আল্লাহ তাঁর নবী ইউনুসের প্রতি সদয় হন। মাছকে নির্দেশ দেন তাঁকে তীরে নিক্ষেপ করতে। আল্লাহর নির্দেশে মাছ পেট থেকে তাঁকে সমুদ্র তীরে নিক্ষেপ করে। তিনদিন মাছের পেটে থেকে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। আল্লাহর হুকুমে তরুলতাহীন সমুদ্র তীরে একটি লতাগাছ জন্মে। তাতে ফলও হয়। তিনি সেটির ছায়ায় অবস্থান করেন এবং তার ফল খান। এভাবে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউনুসকে কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন :

"অবশ্যি ইউনুস একজন রসূল। স্মরণ করো, যখন সে বোঝাই করা নৌকার দিকে পালিয়ে গেলো, তারপর লটারিতে অংশগ্রহণ করলো এবং তাতে হেরে গেলো। শেষ পর্যন্ত মাছ তাকে গিলে ফেললো এবং তখন সে ছিলো ধিকৃত। সে যদি তসবিহ না করতো, তাহলে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত এ মাছের পেটেই থাকতো। অবশেষে আমি তাকে ভীষণ রুগ্ন অবস্থায় একটি তৃণলতাহীন বিরান প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম এবং তার উপর একটি লতানো গাছ উৎপন্ন করে দিলাম।" (সূরা ৩৭ আস সাফফাত : আয়াত ১৩৯-১৪৫)

মহান আল্লাহ কুরআনে অন্যত্র বলেন : "অতপর আমি তার দুআ কবুল করলাম এবং তাকে সেই চরম দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্ত করলাম। আর এভাবেই আমি মুমিনদের উদ্ধার করে থাকি। (সূরা ২১ আল আম্বিয়া : আয়াত ৮৮)

আল্লাহ হযরত ইউনুসকে কেন এতো বড় বিপদে ফেলে পরীক্ষা করলেন, তাকি বুঝতে পেরেছেন? এর কারণ হলো তিনি আল্লাহর নবী। জাতির ধ্বংস হবার সময় উপস্থিত হলেও আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তাঁর হিজরত করা উচিত হয়নি। সে জন্যেই আল্লাহ তাঁর উপর এই বিপদ চাপিয়ে দেন।

মাছের পেটে কি মানুষ বাঁচে?

আপনাকে কেউ প্রশ্ন করতে পারে, হযরত ইউনুস মাছের পেটে কেমন করে বেঁচে ছিলেন? মাছের পেটে কি বেঁচে থাকা সম্ভব? এর জবাব হলো, আল্লাহ চাইলে সবকিছুই সম্ভব। তিনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। যে আল্লাহ প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডে হযরত ইবরাহিমকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, তিনিই মাছের পেটে হযরত ইউনুসকে জীবন্ত রাখেন। মনে রাখবেন, আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তিনি সমস্ত ক্ষমতার উৎস এবং তিনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। একথাগুলো ঈমানের অপরিহার্য অংশ।

এতো গেলো আল্লাহর ইচ্ছার কথা। এদিকে আধুনিক কালেও মাছের পেটে মানুষ বেঁচে থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে শুনুন এক বিস্ময়কর ঘটনা। ১৮৯১ সালের ঘটনা। আগস্ট মাস, ঘটনা স্থল ইংল্যান্ড। Star of the East নামের জাহাজে চড়ে কয়েকজন লোক মাছ শিকার করতে গভীর সমুদ্রে চলে যায়। তারা ২০ ফুট লম্বা ৫ ফুট চওড়া ১০০ টন ওজনের এক বিশাল মাছকে আহত করে। কিন্তু মাছটির সাথে লড়াই করার সময় সে জেম্‌স বার্ডলে নামক তাদের একজন সাথিকে হা করে গিলে ফেলে। একদিন পরে জাহাজের লোকেরা মাছটিকে মৃত দেখতে পায়। বহু কষ্টে সেটিকে তারা জাহাজে উঠায়। তারপর দীর্ঘ প্রচেষ্টা চালিয়ে তারা সেটির পেট কাটলে জেমস মাছটির পেট থেকে ৬০ ঘণ্টা পর জীবন্ত বেরিয়ে আসে। (উর্দু ডাইজেস্ট, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪ সংখ্যা)

এখন এ বিষয়ে আরো পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্যে যে কেউ তিমির পেটে ঢুকে দেখতে পারে । কি বলেন?

জাতির কাছে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ

এদিকে হযরত ইউনুস লতা গাছের তলায় থেকে সুস্থ হয়ে উঠেন। তিনি যতোটুকু ভুল করেছিলেন তার জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করায় আল্লাহ তাঁকে মাফ করে দেন এবং এর জন্যে কিছুটা ভোগান্তিও তাকে পোহাতে হয়। এভাবে নবীরা মানুষ হিসেবে কিছু ভুল ভ্রান্তি করলেও আল্লাহ তা'আলা অচিরেই তাঁদের সে ভুল শুধরে দেন। ভুলের মধ্যে তাদের থাকতে দেননা। তাদেরকে ভুল ত্রুটি থেকে মুক্ত করে নেন। এজন্যই নবীদের কোনো পাপ থাকে না। তাঁরা সবাই নিষ্পাপ অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। এবার আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউনুসকে তাঁর জাতির কাছে ফিরে যাবার নির্দেশ দেন। আল্লাহর নির্দেশে তিনি আবার নিনোভায় রওয়ানা করেন।

জাতির লোকেরা ঈমান আনে

এদিকে হযরত ইউনুসের জাতির খবর কি? তারা কি ধ্বংস হয়ে গেছে? না, তারা ধ্বংস হয়নি। হযরত ইউনুস তাদের আযাব আসার যে শেষ দিন ধার্য করে দিয়েছিলেন, সেদিন জাতির সমস্ত লোক ধ্বংস হবার ভয়ে ভীত কম্পিত হয়ে পড়ে। তারা আযাব না আসার জন্যে দু'আ করতে হযরত ইউনুসকে খোঁজাখুজি করে। কিন্তু কোথাও তাঁকে না পেয়ে তারা আরো চরম ভীত কম্পিত হয়ে পড়ে। তারা ভাবে, আযাব আসা অনিবার্য। সে কারণে আল্লাহর নবী দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। ফলে তারা রাজা প্রজা, ছেলে মেয়ে, পরিবার পরিজন এবং গবাদি পশুসহ সবাই খোলা প্রান্তরে বেরিয়ে আসে। আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে, তওবা করে এবং ঈমান আনে। মহান আল্লাহ্ই তো হিদায়াত দানকারী এবং বিপদ থেকে রক্ষাকারী প্রকৃত ত্রাণকর্তা। মহান আল্লাহ এ ঘটনা সম্পর্কে বলেন :

"হে মুহাম্মদ! এমন কোনো দৃষ্টান্ত আছে কি না যে, কোনো নগরবাসী আযাব দেখে ঈমান এনেছে এবং তার ঈমান তার জন্যে সুফলদায়ক হয়েছে। হ্যাঁ, ইউনুসের জাতি ছাড়া এর আর কোনো দৃষ্টান্ত নেই। তারা যখন ঈমান আনলো, আমি অবশ্যি তাদের উপর থেকে পার্থিব জীবনের লাঞ্ছনার আযাব হটিয়ে দিয়েছি এবং একটি সময় পর্যন্ত তাদেরকে জীবন উপভোগ করার সুযোগ দিয়েছি।" (সূরা ১০ ইউনুস : আয়াত ৯৮)

হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম তাদের মাঝে ফিরে এসে দেখেন তারা সবাই ঈমান এনেছে। যারা এতোদিন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবার তারা তাঁকে ফিরে পেয়ে জড়িয়ে ধরেছে। তাঁকে স্বাগত জানিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছে। এবার তারা নবীর নেতৃত্বে আল্লাহর পথে চলতে শুরু করে। এ সময় আসিরীয়দের সংখ্যা ছিল এক লাখের বেশি। কেউ কেউ বলেছেন একলাখ বিশ হাজার। এ সময়কার অবস্থা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ্ বলেন :

"অতপর আমি তাকে (ইউনুসকে) একলাখ বা তার চেয়ে কিছু বেশি লোকের কাছে (ফেরত) পাঠালাম। তারা ঈমান আনলো আর আমি একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত তাদের টিকিয়ে রাখলাম।" (সূরা আস সাফফাত : আয়াত ১৪৭-৪৮)

হযরত ইউনুসের পরও আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে আরো কয়েকজন নবী পাঠান। এরপর এ জাতি আবার আল্লাহদ্রোহী হয়ে যায়। অবশেষে ৬১২ খৃষ্ট পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময় আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর মিডিয়াবাসীদের বিজয়ী করান। এদের সাথে তারা অনেক যুদ্ধ করে। শেষ পর্যন্ত এদের হাতে তারা পরাজিত হয়। এরা নিনোভায় প্রবেশ করে গোটা নগরী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়। প্রত্নতত্ত্ববিদরা এখন সেই ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করছেন।

হযরত ইউনুসের মর্যাদা

হযরত ইউনুসকে আল্লাহ তা'আলা বিরাট মর্যাদা দান করেছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁকে শ্রেষ্ঠ রসূলদের মধ্যে গণ্য করেছেন। আল্লাহ বলেন : "আর ইসমাঈল, আলইয়াসা, ইউনুস ও লুত-এদের সবাইকে আমি বিশ্ববাসীর উপর মর্যাদা দান করেছি।" (সূরা ৬ আল আন 'আম : আয়াত ৮৬)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"হে মুহাম্মদ! আমি তোমার কাছে ঠিক তেমনি অহি পাঠাচ্ছি, যেমনি পাঠিয়েছিলাম নূহ এবং তার পরবর্তী নবীদের কাছে। যেমনি পাঠিয়েছি ইবরাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার সন্তানদের কাছে। ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারূণ ও সুলাইমানের কাছে।.... এরা ছিলো সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী রসূল... ।" (সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ১৬৩-১৬৫)

এবার দেখলেন তো হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে কতো মর্যাদাবান নবী। মহান আল্লাহ তাঁকে আদর করে 'মাছওয়ালা' উপাধি দিয়েছেন। কুরআনে তাঁকে দু'জায়গায় মাছওয়ালা বলেছেন। সূরা আল আম্বিয়া- ৮৭ এবং সূরা কলম- ৪৮ আয়াতে। তিনি যে মাছের পেটে ছিলেন, সে জন্যেই আল্লাহ তাঁকে আদর করে মাছওয়ালা বলেছেন। যেমন বিড়ালের বাচ্চা সাথে রাখার কারণে আমাদের প্রিয় নবী তাঁর একজন সাহাবীকে আদর করে 'বিড়ালের বাপ' (আবু হুরাইরা) বলে ডাকতেন। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সা. হযরত ইউনুসের মর্যাদা সম্পর্কে বলেছেন :

১. কোনো নবী ইউনুসের চাইতে বেশি মর্যাদাবান একথা আমি বলতে পারিনা। (সহীহ বুখারি)
২. তোমাদের কেউ কখনো যেনো আমাকে ইউনুস ইবনে মাত্তার চাইতে উত্তম না বলে। (সহীহ বুখারি)

কুরআনে উল্লেখ

কুরআন মজিদে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের নাম উল্লেখ হয়েছে ছয়বার। এর মধ্যে চারবার ইউনুস আর দুইবার 'মাছওয়ালা' বলে উল্লেখ হয়েছে। কোথায় কোথায় উল্লেখ হয়েছে জেনে নিন : সূরা আন নিসা : ১৬৩, সূরা আল আন'আম : ৮৬, সূরা ইউনুস : ৯৮, সূরা আস সাফফাত : ১৩৯, সূরা আল আম্বিয়া : ৮৭ এবং সূরা আল কলম : ৪৮।

টিকা

১. সূত্র: তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস : টীকা: ৯৮
২. সূরা ইউনুস : ৯৮ আয়াত।

যাকারিয়া

আলাইহিস সালাম

শ্রেষ্ঠ রসূলদের একজন

হযরত যাকারিয়ার নাম আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ রসূলগণের একজন। মহান আল্লাহ গোটা বিশ্ববাসীর উপর যাদের সম্মানিত করেছেন, তিনি তাঁদেরই অন্যতম। তাছাড়া তিনি সেইসব নবী রসূলদেরও একজন, মানুষকে সত্য পথে আহ্বান করার কারণে আল্লাহর দুশমনরা যাদের হত্যা করেছিল। তাই তিনি একজন শহীদ নবী। তিনি ছিলেন বনি ইসরাঈলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রসূল। হযরত ইবরাহিম ও ইয়াকুবের বংশধর তিনি। শুনুন আল্লাহর বাণী:

"আর আমি ইবরাহিমকে ইসহাক ও ইয়াকুবের মতো সন্তান দিয়েছি। তাদের প্রত্যেককে আমি সঠিক পথ দেখিয়েছি, যা দেখিয়েছিলাম ইতোপূর্বে নূহকে। একই পথ দেখিয়েছি আমি তার বংশধরদের মধ্যে দাউদ, সুলাইমান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা ও হারূণকে। মুহসিন লোকদের আমি এভাবেই বিনিময় দিয়ে থাকি। আমি একই পথ দেখিয়েছি যাকারিয়া, ইয়াহহিয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকে। এরা সবাই ছিলো সংস্কারক। সেই পথই আমি দেখিয়েছি ইসমাঈল, আলইয়াসা, ইউনুস ও লুতকে। এদের প্রত্যেককেই আমি বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (সূরা ৬ আল আন'আম : আয়াত ৮৪-৮৬)

দীনি নেতৃত্ব

বনি ইসরাঈলের দীনি কার্যক্রমের কেন্দ্র ছিলো বাইতুল মাকদাস। বনি ইসরাঈলের মধ্যে হযরত হারূণ আলাইহিস সালামের বংশধর একটি গোত্রের উপর দায়িত্ব ছিলো বাইতুল মাকদাসের রক্ষণাবেক্ষণের। হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম ছিলেন এ গোত্রের প্রধান। গোত্রীয় প্রধান হিসেবে তিনিই ছিলেন এই মহান দীনি কেন্দ্রের পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক। তাঁকেই করতে হতো এই ঘরের সেবা ও পরিচর্যা। দীনের দাওয়াত ও শিক্ষা প্রচার এবং সৎকাজের আদেশ ও অন্যায় অসৎ কাজ থেকে বারণ ও বাধা দানই ছিলো তাঁর দীনি মিশনের মূল কাজ। তিনি ছিলেন আল্লাহর অনুগত দাস এবং সত্য সততা ও আদর্শের মূর্ত প্রতীক।

একটি ছেলে দাও আল্লাহ!

কিন্তু হযরত যাকারিয়া এই দীনি নেতৃত্বের উত্তরাধিকার নিয়ে ছিলেন খুবই চিন্তিত। তাঁর বংশে এমন কোনো যোগ্য লোক ছিলনা তাঁর মৃত্যুর পর যে এই

মহান দীনি দায়িত্ব পালন করতে পারতো। তিনি ছিলেন নি:সন্তান। তাই পরবর্তী দায়িত্বের ব্যাপারে তিনি সব সময়ই ছিলেন চিন্তিত। এখন তাঁর বয়স প্রায় একশ বছর। চিন্তা তাঁর বেড়েই চললো। হঠাৎ ঘটে গেলো একটি ঘটনা। ঘটনাটির আছে একটি পূর্বকথা! শুনুন তবে সে কথাটি।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের নানী আল্লাহর কাছে মানত করলেন, হে আল্লাহ! আমার এখন যে সন্তানটি হবে, আমি ওকে তোমার জন্যে নজরানা দিলাম। ও তোমার জন্যে উৎসর্গীত হবে। তুমি এই নজরানা কবুল করে নাও।

তিনি আশা করেছিলেন তার একটি ছেলে হবে এবং তিনি ওকে বাইতুল মাকদাসে দীনের কাজের জন্যে বিশেষভাবে নিয়োগ করবেন। কিন্তু মানুষ যা চায় তা হয়না। আল্লাহ যা চান তাই হয়। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর একটি মেয়ে হলো। তিনি মেয়েটির নাম রাখলেন মরিয়ম। মরিয়ম প্রাপ্ত বয়স্ক হলে মানত অনুযায়ী ওকে তিনি পৌঁছে দিলেন বাইতুল মাকদাসে। এখন প্রশ্ন দেখা দিলো, সেখানে ওর দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করবে কে?

মরিয়মকে দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে এলেন অনেকে। এ দায়িত্ব পালনের জন্যে এগিয়ে এলেন হযরত যাকারিয়া। আরো এগিয়ে এলেন অন্যান্য গোত্রের ধর্মীয় নেতারা। তারা সবাই দাবি করলেন এ মহৎ সেবা প্রদানের। নিজের দাবি ত্যাগ করছেন না কেউ। ফলে অনুষ্ঠিত হলো কোরা (লটারি)।

লটারিতে কার নাম উঠেছে জানেন? যাকারিয়া! হ্যাঁ, হযরত যাকারিয়ার নাম। তিনি দেখাশুনা করতে শুরু করলেন মরিয়মকে। এদিকে তিনি মরিয়মের খালু হন। হযরত যাকারিয়ার স্ত্রী এবং মরিয়মের মা সহোদর বোন। ফলে মরিয়মের সেবা ও আদর যত্ন হতে লাগলো সুন্দর ও নিখুঁতভাবে। মরিয়ম ই'তেকাফ ও ইবাদত বন্দেগির মাধ্যমে নিজের আত্মার অনেক অনেক উন্নতি সাধন করেছেন।

একদিনের ঘটনা। হযরত যাকারিয়া বাইতুল মাকদাসের সেই নির্দিষ্ট কক্ষে দেখতে এলেন মরিয়মকে। কক্ষে ঢুকেই তিনি অবাক। দেখলেন মরিয়মের সামনে সাজানো রয়েছে অনেক সুস্বাদু ফল। এইসব ফল এই মওসুমের ফল নয়। জেরুজালেমে তো এখন এ ফল পাওয়া যায়না। বিস্মিত হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন : মরিয়ম এ ফল তুমি কোথায় পেলে?

মরিয়াম : আল্লাহ পাঠিয়েছেন।

এ জবাব শুনে হযরত যাকারিয়ার অন্তরে আশার উদয় হলো। তিনি ভাবলেন, যে মহান আল্লাহ মরিয়মকে বেমওসুমের ফল দান করতে পারেন, তিনি ইচ্ছে করলে তো আমাকেও বুড়ো বয়েসে ছেলে দান করতে পারেন। তিনি দু'হাত উঠালেন আল্লাহর দরবারে। একটি ছেলে চাইলেন আল্লাহর কাছে। তাঁর সেই দু'আ কুরআনে উল্লেখ হয়েছে এভাবে : "প্রভু! তোমার বিশেষ ক্ষমতা বলে আমাকে একটি সৎ সন্তান দান করো। তুমি তো অবশ্যি দু'আ শ্রবণকারী।" (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৩৭-৩৮)

"যাকারিয়া চুপে চুপে তার প্রভুকে ডাকলো। সে বললো : প্রভু আমার হাড়গুলো পর্যন্ত নরম হয়ে গেছে। মাথা বার্ধক্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে প্রভু! তোমার কাছে কিছু চেয়ে আমি কখনো ব্যর্থ হইনি। আমি আমার পরে নিজের যোগ্য উত্তরাধিকারী না থাকার আশংকা করছি। এদিকে আমার স্ত্রী হলো বন্ধ্যা। তাই তুমি তোমার বিশেষ অনুগ্রহে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান করো, যে হবে আমারও উত্তরাধিকারী আর ইয়াকুবের বংশেরও উত্তরাধিকারী। আর হে প্রভু! তুমি ওকে তোমার পছন্দনীয় মানুষ বানিয়ো।" (সূরা মরিয়ম : আয়াত ২-৬)

"আর যাকারিয়ার কথা স্মরণ করো। যখন সে তার প্রভুকে ডেকে বলেছিল : প্রভু! আমাকে একাকী ছেড়ে দিয়োনা আর সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী তো তুমিই।" (সূরা ২১ আল আম্বিয়া : আয়াত ৮৯)

আল্লাহ সর্ব শক্তিমান। তিনি যা চান তাই করেন। তিনি কিছু করতে চাইলে বলেন : 'হও' আর সাথে সাথে তা হয়ে যায়। তিনি তাঁর দাস ও রসূল যাকারিয়ার দু'আ কবুল করলেন। তিনি বৃদ্ধ পিতা আর বন্ধ্যা মায়ের ঘরে সন্তান দান করলেন। একটি সুপুত্র। নাম তাঁর ইয়াহহিয়া। তিনি হযরত যাকারিয়ার শুধু একটি সুপুত্রই ছিলেন না, সেই সাথে আল্লাহ তাঁকে রিসালাতও দান করেন।

হত্যা করা হলো তাঁকে

এ যাবত পড়ার পর আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন হযরত যাকারিয়া কোন্ সময়কার নবী? হ্যাঁ, তিনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের লাগভাগ পূর্বেকার নবী। তাঁর বয়েসের শেষ আর হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আগমন প্রায় একই সময়। আর এসময়টা ছিলো এখন থেকে মাত্র দু'হাজার বছর পূর্বে। এসময় ফিলিস্তিনের ইহুদিরা প্রকাশ্যে যিনা, ব্যাভিচার ও অশ্লীল কাজ করতো। যে দু'চারজন ভালো মানুষ ছিলেন তারা ছিলেন নির্যাতিত। পাপ ও পাপিষ্ঠদের সমালোচনা করলে জীবনের নিরাপত্তা ছিলনা।

কিন্তু হযরত যাকারিয়া তো ছিলেন আল্লাহর নবী। মানুষকে অন্যায় অপরাধের কাজ থেকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করাই নবীর কাজ। নবী এবং নবীর সত্যিকারের অনুসারী ঈমানদার লোকেরা কখনো অত্যাচার ও নির্যাতনকে ভয় পাননা। তাঁরা যে কোনো পরিস্থিতিতে মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার এবং সঠিক পথে ডাকার কাজ করে যান।

হযরত যাকারিয়া বনি ইসরাঈলকে মন্দ কাজ করতে নিষেধ করেন। পাপের পথে বাধা সৃষ্টি করেন এবং তাদেরকে আল্লাহর পথে তথা সত্য ও ন্যায়ের পথে আসার আহ্বান জানাতে থাকেন। তাঁর ভালো কাজের আদেশ আর মন্দ কাজে বাধাদানকে পাপিষ্ঠ শাসক আর সমাজের অপরাধী নেতারা বরদাশত করতে পারেনি। তারা হযরত যাকারিয়াকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। শেষ পর্যন্ত অন্যায়ের প্রতিবাদে সোচ্চার হবার কারণে ইহুদি রাষ্ট্রের রাজা ইউআসের

নির্দেশে আল্লাহর নবী হযরত যাকারিয়াকে ইহুদিরা হাইকালে সুলাইমানিতে পাথর মেরে হত্যা করে।

এভাবে বনি ইসরাঈল হত্যা করেছে বহু নবীকে। তাদের এইসব জঘন্য হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ করে আল কুরআনে মহান আল্লাহ বনি ইসরাঈলকে লক্ষ্য করে বলেন :

"যখনই তোমাদের প্রবৃত্তির কামনার বিপরীত কোনো জিনিস নিয়ে আমার কোনো রসূল তোমাদের কাছে এসেছে, তখনই তোমরা তার বিরুদ্ধাচরণ করেছো, কাউকেও মিথ্যা বলেছো আর কাউকেও করেছো হত্যা। (সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ৮৭)

কোনো কোনো বর্ণনা থেকে জানা যায়, ইহুদিরা হযরত যাকারিয়াকে করাত দিয়ে দ্বিখন্ডিত করে ফেলেছিল।

আল কুরআনে হযরত যাকারিয়া

আল কুরআনে হযরত যাকারিয়াকে অতি উচ্চ মর্যাদার নবী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন মজিদে তাঁর নাম উল্লেখ হয়েছে সাতবার। যেসব সূরা ও আয়াতে উল্লেখ হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ :

সূরা আলে ইমরান : ৩৭ আয়াতে দুইবার। একই সূরা আয়াত ৩৮। সূরা আল আন'আম আয়াত ৮৫। সূরা মরিয়ম আয়াত ২ ও ৭। সূরা আল আম্বিয়া : ৮৯।

হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে পড়ুন : সূরা আলে ইমরান : ৩৫-৪১ আয়াত। সূরা মরিয়ম : ১-১৫ আয়াত। সূরা আল আম্বিয়া : ৮৯-৯০ আয়াত।

কি শিক্ষা পেলাম

আল কুরআনের আলোকে আমরা হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের জিন্দেগি থেকে কয়েকটি বড় বড় শিক্ষা লাভ করতে পারি। সেগুলো হলো :

১. পূত পবিত্র জীবন যাপন।
২. আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও বিনয়।
৩. যা কিছু চাওয়ার কেবল আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে।
৪. আল্লাহকে সর্বশক্তিমান জানতে হবে।
৫. আল্লাহর কাছে সৎ ও নেককার সন্তান প্রার্থনা করতে হবে।
৬. মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকতে হবে।
৭. মন্দ কাজের প্রতিবাদ করতে হবে এবং বাধা দিতে হবে।
৮. ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর পথে অটল থাকতে হবে।
৯. প্রয়োজনে আল্লাহর পথে শহীদ হবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।

শহীদ ইয়াহ্ইয়া

আলাইহিস সালাম

তাঁর জন্ম আল্লাহর একটি নিদর্শন

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন সমস্ত ক্ষমতার উৎস ও মালিক। এই পৃথিবীর সবকিছুই তাঁর সৃষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মে চলে। সব কিছুই তাঁর বেঁধে দেয়া নিয়ম ও বিধানের অধীন। কোনো কিছুতে তাঁর বেঁধে দেয়া নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে তা হয়ে যায় ধ্বংস। তাঁর বেঁধে দেয়া সুনির্দিষ্ট নিয়মেই জন্ম হয় সব মানুষের।

নিয়ম যেহেতু তিনিই তৈরি করেছেন, তাই নিয়মের ব্যতিক্রম কিছু করলে তিনিই করতে পারেন, আর কেউ নয়। কখনো কখনো তিনি মানুষ সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম কিছু করেছেন। বাবা মা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন হযরত আদম ও হাওয়াকে। বাবা ছাড়া শুধু মা থেকেই সৃষ্টি করেছেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে। আবার প্রায় শতায়ূ বৃদ্ধ পিতা হযরত ইবরাহিম ও অনুরূপ বৃদ্ধ-বন্ধ্যা মাতা হযরত সারাহ্কে দান করেছেন পুত্র ইসহাককে। এই একই রকম ঘটনা ঘটেছে হযরত ইয়াহ্ইয়ার ক্ষেত্রে। প্রায় শতায়ূ বৃদ্ধ পিতা হযরত যাকারিয়া ও অনুরূপ বৃদ্ধ-বন্ধ্যা মাতার ঘরে জন্ম নিয়েছেন হযরত ইয়াহইয়া।

আপনারা হয়তো যাকারিয়ার জীবনীতে দেখেছেন, তাঁর কোনো সন্তান ছিলনা। বৃদ্ধ বয়সে বন্ধ্যা স্ত্রীর ঘরে তিনি আল্লাহর কাছে আল্লাহর পছন্দসই সন্তান প্রার্থনা করেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর দু'আ কবুল করে বলেন, তুমি সন্তান পাবে। আল্লাহ তাঁকে সন্তানের সুসংবাদ দেন এভাবে :

"যাকারিয়া যখন মেহরাবে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিল, তখন ফেরেশতারা তাকে ডেকে বললো : আল্লাহ আপনাকে ইয়াহ্ইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন। সে আল্লাহর একটি হুকুম (অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালাম) কে সত্যায়িত করবে। সে হবে একজন নেতা, সততার প্রতীক এবং একজন সংস্কারক নবী। (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৩৯)

সূরা মরিয়মে বলা হয়েছে : 'হে যাকারিয়া! তোমার প্রার্থনার প্রেক্ষিতে আমি তোমাকে একটি পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি। তার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া। এ নামে কোনো লোক আমি এর আগে সৃষ্টি করিনি।' (সূরা ১৯ মরিয়ম : আয়াত ৭)

সূরা আল আম্বিয়াতে বলা হয়েছে : 'আমি তার (যাকারিয়ার) দু'আ কবুল করেছি আর তাকে দান করেছি ইয়াহ্ইয়াকে আর এ জন্যে তার স্ত্রীকে যোগ্য করে

দিয়েছিলাম গর্ভ ধারণের। কারণ তারা কল্যাণের কাজে আপ্রাণ চেষ্টা করতো, ভয় আর আশা নিয়ে আমাকে ডাকতো এবং আমার প্রতি ছিলো তারা অবনত। (সূরা ২১ আল আম্বিয়া : আয়াত ৯০)

এভাবেই মহান আল্লাহ তাঁর বিশেষ কুদরতে বৃদ্ধ পিতামাতার ঘরে জন্মের ব্যবস্থা করেন হযরত ইয়াহইয়ার। আল কুরআন থেকে আমরা একথাও জানতে পারলাম যে, ইয়াহ্‌ইয়া নামটি সরাসরি আল্লাহর দেয়া নাম। মহান আল্লাহই পিতা যাকারিয়াকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর পুত্রের নাম যেনো ইয়াহইয়া রাখা হয়।

ইয়াহ্‌ইয়া ও ঈসা

হযরত ইয়াহ্‌ইয়া আলাইহিস সালাম হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ছয় বা তিন মাসের বড়। তাঁরা ছিলেন নিকটাত্মীয় এবং পরস্পরের বন্ধু। তাঁরা একজন আরেকজনকে ভাই বলে সম্বোধন করতেন। বয়েস ত্রিশ বছর হবার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা ইয়াহ্‌ইয়াকে নবুয়্যত দান করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী, সত্যপন্থী, আল্লাহভীরু ও পবিত্র জীবনের অধিকারী।

হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ছিলেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সত্যায়নকারী। হযরত ঈসা ছিলেন আল্লাহর বিশেষ নির্দেশ (কলেমা)। আল্লাহর নির্দেশে পিতা ছাড়াই তাঁর জন্ম হয়। লোকেরা তাঁর ব্যাপারে বিভিন্ন মত পোষণ করতে থাকে। হযরত ইয়াহ্‌ইয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে ঈসার বিষয়ে সত্য তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, আল্লাহর নির্দেশেই বিনা বাপে ঈসার জন্ম হয়েছে। তিনি আল্লাহর দাস ও রসূল। আপনারা ঈসাকে আল্লাহর রসূল হিসেবে গ্রহণ করুন এবং তাঁর আনুগত্য করুন।

পাঁচটি কাজের নির্দেশ

হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ছোটবেলা থেকেই সব সময় আল্লাহর ভয়ে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন। আল্লাহর প্রতি বিনয়, আনুগত্য ও ইবাদতের মাধ্যমে তিনি নিজের আত্মাকে অনেক উন্নত করেন। এরি মধ্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নির্দেশ দেন : "হে ইয়াহ্‌ইয়া! আল্লাহর কিতাবকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো।" (সূরা ১৯ মরিয়ম : আয়াত ১২)

এখানে আল্লাহর কিতাব বলতে তাওরাতকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হযরত ইয়াহ্‌ইয়াকে তাওরাতের বিধান কায়েম করতে এবং মানুষকে এ কিতাবের বিধান মতো জীবন যাপন করবার আহ্বান জানাতে নির্দেশ দেন।

তিরমিযি, ইবনে মাজাহ্‌ ও মুসনাদে আহমদে হারেছ আশআরি থেকে বর্ণিত একটি হাদিস থেকে জানা যায়, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইয়াহ্‌ইয়াকে হুকুম দিয়েছিলেন মানুষকে বিশেষভাবে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিতে। এ হাদিসে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) বলেন :

"আল্লাহ তা'আলা ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়াকে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই পাঁচটি কাজ যেনো তিনি নিজে করেন এবং বনি ইসরাঈলকে করবার নির্দেশ দেন। কোনো কারণে বনি ইসরাঈলকে এই কাজগুলো করবার নির্দেশ দিতে তাঁর বিলম্ব হয়। ফলে হযরত ঈসা তাঁকে বললেন : আল্লাহ পাক আপনাকে পাঁচটি কাজ করতে এবং বনি ইসরাঈলকে করবার জন্যে নির্দেশ দিতে বলেছেন। সে নির্দেশ কি আপনি তাদের পৌছাবেন নাকি আমি পৌছে দেবো? ইয়াহইয়া বললেন : হে ভাই! আমার আশংকা হয়, আপনি যদি আমার আগে পৌছান তাহলে আল্লাহ আমাকে শাস্তি দেবেন বা জমিনের নিচে ধ্বসিয়ে দেবেন।

অতপর তিনি বনি ইসরাঈলকে বাইতুল মাকদাসে সমবেত করলেন। মানুষে মসজিদ পূর্ণ হয়ে গেলো। তখন তিনি মসজিদের মিম্বরে উঠলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলি বর্ণনা করলেন এবং বললেন : হে জনগণ! আল্লাহ আমাকে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন যেনো আমি নিজে সেগুলো পালন করি এবং তোমাদেরকেও তিনি সেগুলো পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। শুনো, সেগুলো হলো :

১. তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব করবে। তাঁর সাথে কাউকেও শরিক করবে না।
২. তোমাদের তিনি নির্দেশ দিয়েছেন সালাত কায়েম করতে।
৩. তিনি নির্দেশ দিয়েছেন সিয়াম পালন করতে।
৪. তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন দান করতে।
৫. তিনি তোমাদের আরো নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর স্মরণে তোমাদের যবানকে সিক্ত রাখতে। (এতোটুকু বলার পর আমাদের প্রিয় নবী তাঁর সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বলেন) আমিও তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি। এই পাঁচটি কাজের নির্দেশ আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন। সেগুলো হলো :

১. সব সময় জামাতবদ্ধ থাকবে;
২. নেতার নির্দেশ শ্রবণ করবে;
৩. নেতার নির্দেশ পালন করবে;
৪. হিজরত করবে; (অর্থাৎ মন্দ কাজ ত্যাগ করবে বা এমন মন্দ আবাসভূমি ত্যাগ করবে, যেখানে থেকে আল্লাহর হুকুম পালন করা সম্ভব নয়)
৫. আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। (অতপর তিনি বলেন) সাবধান! যে ব্যক্তি জামাত থেকে এক বিঘতও সরে যাবে, সে মূলত নিজের গলা থেকে ইসলামের রশিই খুলে ফেললো। তবে পুনরায় জামাতে ফিরে আসলে ভিন্ন কথা।" (মুসনাদে আহমদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)

বেশ হয়েছে। হযরত ইয়াহ্ইয়ার পাঁচটি নির্দেশের সাথে সাথে আমরা আমাদের প্রিয় নবীর পাঁচটি নির্দেশও জেনে গেলাম। আসলে হযরত ইয়াহ্ইয়া ছিলেন অত্যন্ত মানব দরদী নবী। আল কুরআনে তাঁর একটি গুণের কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন : 'আমি নিজের পক্ষ থেকে তাকে দান করেছি হৃদয়ের কোমলতা।' (আল কুরআন ১৯:১৩)

দাওয়াত দান পাপ কাজে বাধাদান ও শাহাদাত

হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালাম বনি ইসরাঈলকে শিরক বিদআত ও যাবতীয় মন্দকাজ ত্যাগ করার দাওয়াত দিতে থাকেন। তাদেরকে শুধু এক আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করতে এবং সততার পথে চলতে আহবান জানাতে থাকেন। তিনি ট্রান্স জর্ডান এলাকায় তাঁর দাওয়াতি কাজ সম্প্রসারণ করেন। মানুষকে তিনি পাপ কাজ থেকে তওবা করাতেন এবং যারা তওবা করতো তাদেরকে ব্যাপ্টাইজ বা গোসল করাতেন। সেজন্যে তিনি ব্যাপটিস্ট ইয়াহ্ইয়া নামে পরিচিত হয়ে যান।

হযরত ইয়াহ্ইয়ার সময় ইহুদিদের শাসক ছিলো হিরোদ এন্টিপাস। হিরোদ ইহুদি সমাজে রোমীয় নগ্ন সভ্যতার সয়লাব বইয়ে দেয়। রাষ্ট্রীয়ভাবে জিনা-ব্যভিচার, পাপাচার, নগ্নতা, বেহায়াপনা ও চরিত্রহীনতার প্রসার ঘটানো হতে থাকে। হিরোদ নিজেই ব্যভিচার ও পাপাচারে লিপ্ত হয়। হযরত ইয়াহইয়া তার অনৈতিক পাপাচারের প্রতিবাদ করতে থাকেন। হিরোদ নিজের অবস্থা বেগতিক দেখে হযরত ইয়াহইয়াকে গ্রেফতার করে কারাগারে ফেলে রাখে।

চরিত্রহীনরা দেখলো, হযরত ইয়াহ্ইয়া মানুষের মাঝে সৎকর্ম ও পবিত্র জীবন যাপনের যে চেতনা সৃষ্টি করেছেন, তার ফলে মানুষ তাদেরকে চরমভাবে ঘৃণা করছে। তাদের বিরুদ্ধে বেড়েই চলছে মানুষের ক্ষোভ। কারণ, মানুষ দেখলো আল্লাহর নবীকে আটকে রাখা হয়েছে কারাগারে আর পাপিষ্ঠদের লালন করছে সরকার। এমতাবস্থায় শাসক হিরোদ তার লালিত এক নর্তকীর আবদারে হত্যা করলো আল্লাহর নবী হযরত ইয়াহ্ইয়াকে। তাঁর মস্তককে দ্বিখণ্ডিত করে উপহার দিলো নর্তকীকে। এভাবেই বনি ইসরাঈলের বদবখ্ত লোকেরা একের পর এক আল্লাহর নবীকে হত্যা করে। এদের সম্পর্কেই আল কুরআনে বলা হয়েছে :

"যারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে, অন্যায়ভাবে হত্যা করে আল্লাহর নবীদেরকে আর ঐসব লোকদেরকে যারা ন্যায় ও সুবিচারের নির্দেশ দেয়, এসব অপরাধীদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুখবর দাও।" (সূরা আলে ইমরান : ২১)

আমাদের নবীর সাথে সাক্ষাত

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর যখন মে'রাজ হয়, তখন তাঁর সাথে হযরত ইয়াহ্ইয়ার সাক্ষাত হয়। হযরত জিবরিলের সাথে প্রিয় নবী আকাশ পেরিয়ে উপরে উঠছিলেন। তিনি বলেন :

'অতপর যখন দ্বিতীয় আকাশে পৌছলাম দেখলাম, সেখানে রয়েছেন ইয়াহইয়া ও ঈসা। তাঁরা দুজন পরস্পর খালাতো ভাই। জিবরিল আমাকে বললেন : এরা ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা, এদের সালাম করুন। আমি তাঁদের সালাম করলাম। তাঁরা সালামের জবাব দিয়ে বললেন মারহাবা-স্বাগতম হে আমাদের মহান ভাই ও মহান নবী।' (সহীহ বুখারি)

আল কুরআনে হযরত ইয়াহ্ইয়া

আল কুরআনে হযরত ইয়াহ্ইয়ার নাম উল্লেখ হয়েছে পাঁচবার। যেসব আয়াতে উল্লেখ হয়েছে সেগুলো হলো : সূরা আলে ইমরান : ৩৯, সূরা আল আনআম : ৮৫, সূরা মরিয়ম : ৭, ১২, সূরা আল আম্বিয়া : ৯০। কুরআন মজিদে হযরত ইয়াহ্ইয়ার মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে :

"আমি শৈশবেই তাকে প্রজ্ঞা দান করেছি এবং দান করেছি নিজের পক্ষ থেকে কোমলতা ও পবিত্রতা। সে ছিলো খুবই আল্লাহভীরু আর বাবা-মার অধিকারের ব্যাপারে সচেতন। সে উদ্যত ছিলনা আর অবাধ্যও ছিলনা। তার প্রতি সালাম যেদিন তার জন্ম হয় আর যেদিন তার মরণ হয় এবং যেদিন উঠানো হবে তাকে জীবিত করে।' (সূরা ১৯ মরিয়াম : আয়াত ১২-১৫)

❖

২৪

ঈসা রূহুল্লাহ্

আলাইহিস সালাম

হযরত ঈসার মাতা মরিয়মের মর্যাদা

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ইতিহাস জানার আগে তাঁর মায়ের ইতিহাস জানা জরুরি। মরিয়ম ছিলেন তাঁর মা। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সা. বলেছেন : পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহিলা চারজন। তারা হলেন, ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া, ঈসার মাতা মরিয়ম, খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ (রসূলুল্লাহর স্ত্রী) এবং ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ সা.।

আল কুরআনে সরাসরি কোনো নারীর নাম উল্লেখ করা হয়নি, তবে উল্লেখ করা হয়েছে শুধুমাত্র একজন নারীর নাম। তিনি মরিয়ম, হযরত ঈসার মা। কুরআনে তাঁর নাম উল্লেখ হয়েছে ৩৪ (চৌত্রিশ) বার। তাছাড়া আল কুরআনের একটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে তাঁরই নামে। সেটি হলো 'সূরা ১৯ মরিয়ম'।

আল্লাহর আনুগত্য ও জীবনের পবিত্রতার দিক থেকে তিনি নিজেকে এতোই উন্নত করেছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনে তাঁকে মুমিনদের জন্যে অনুসরণীয় আদর্শ বলে ঘোষণা করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

'আল্লাহ্ ঈমানদার লোকদের জন্যে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ফেরাউনের স্ত্রীর (আসিয়ার)... আরো দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ইমরানের কন্যা মরিয়মের। সে নিজের লজ্জাস্থানকে সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত করেছিল। পরে আমি তার মধ্যে আমার নিজের পক্ষ থেকে ফুঁকে দিয়েছি রূহ আর সে নিজ প্রভুর বাণী ও গ্রন্থাবলির সত্যায়ন করেছিল এবং সে ছিলো আমার একান্ত বিনীতদের একজন।' (সূরা ৬৬ আত-তাহরিম : আয়াত ১১-১২)

তখন মরিয়মের জন্ম হয়নি, ইমরানের স্ত্রী অর্থাৎ মরিয়মের মা একটি মানত করলেন। তিনি মানত করলেন এই বলে : হে আমার প্রভু! আমার এখন যে সন্তানটি হতে যাচ্ছে, ওকে আমি তোমার জন্যে নজরানা দিলাম, সে তোমার জন্যে উৎসর্গীত হবে। তুমি আমার এই নজরানা কবুল করো। তুমি তো সবই শুনো, সবই জানো। (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৩৫)

ইমরানের স্ত্রী নিজের পেটের সন্তানকে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি ও আল্লাহর দীনের কাজের জন্য উৎসর্গ করার মানত করলেন। তিনি আশা করেছিলেন তাঁর একটি পুত্র সন্তান হবে। কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা ছিলো ভিন্ন রকম। আল্লাহ তাঁকে দান করলেন একটি কন্যা সন্তান। কন্যাটি ভূমিষ্ট হবার পর তিনি আল্লাহর কাছে নিবেদন করলেন :

"আমার প্রভু! আমি তো একটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ করেছি। অথচ আল্লাহ ভালো করেই জানেন তার ঘরে কি সন্তান জন্ম নিয়েছে? আর পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের মতো হয়না। যাই হোক আমি তার নাম রেখেছি মরিয়ম। প্রভু! আমি তার এবং তার ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে তোমার কাছে পানাহ চাই অভিশপ্ত শয়তান থেকে।" (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৩৬)

মহান আল্লাহ মরিয়মের মায়ের দু'আ কবুল করলেন :

"অতপর তার প্রভু তার কন্যাটিকে উত্তমভাবে কবুল করলেন, একটি আদর্শ মেয়ে হিসেবে তাকে গড়ে তুললেন এবং (নবী) যাকারিয়াকে বানিয়ে দিলেন তার অভিভাবক।" (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৩৭)

মরিয়মের বুঝ জ্ঞান হলে মরিয়মের মা নিজের মানত অনুসারে তাকে বাইতুল মাকদাসে নিয়ে আল্লাহর ইবাদতের জন্যে উৎসর্গ করে দিয়ে আসেন। সেখানে মহিলাদের ইবাদতের জন্যে আলাদা কক্ষ ছিলো। এ রকম একটি কক্ষ তাঁর জন্যে বরাদ্দ করা হলো। এখানে তিনি ইতেকাফ শুরু করেন। ইখলাস, আনুগত্য, বিনয় ও আল্লাহভীতি সহকারে তিনি এখানে মহান আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকেন।

হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম ছিলেন আল্লাহর নবী। অন্যদিকে তিনি ছিলেন মরিয়মের খালু। এ সময় তিনি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরই উপর ন্যস্ত হয় মরিয়মের দেখাশুনা ও অভিভাবকত্বের দায়িত্ব। এই মেহরাবে অবস্থানকালে মরিয়মের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে বেহেশতি খাবার আসতো।

একদিন হযরত যাকারিয়া মরিয়মের কক্ষে এসে তাঁর সম্মুখে বেমওসুমি সুস্বাদু ফলফলারি দেখতে পান। ওখানে এসব ফল হয়না। তাছাড়া এটা এইসব ফলের মওসুমও নয়। এসব ফল দেখে যাকারিয়া তাজ্জব হয়ে যান। জিজ্ঞেস করেন : মরিয়ম! কোথা থেকে এলো এসব আনকো ফল? মরিয়ম বললেন :

'আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে এসব খাবার। আল্লাহ যাকে চান, তাকে দান করেন অগণিত।' (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৩৭)

এ যাবত যা কিছু আলোচনা হলো, তা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলো, হযরত মরিয়ম ছিলেন আল্লাহর অতিশয় পবিত্র নেককার ও জগত শ্রেষ্ঠ আদির্শ নারী। স্বয়ং আল্লাহই বলেন :

"ফেরেশতারা এসে বললো, হে মরিয়ম আল্লাহ আপনাকে বাছাই করেছেন। পবিত্রতা দান করেছেন এবং গোটা বিশ্বের নারীকুলের মধ্যে আপনাকে একটি বিশেষ দায়িত্ব অর্পনের জন্যে মনোনীত করেছেন। সুতরাং হে মরিয়ম! আপনি প্রভুর অনুগত হোন, তাঁর প্রতি সাজদায় নত হোন।" (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৪২-৪৩)

হযরত ঈসার জন্মকথা

একদিন ঘটে গেলো এক অলৌকিক কাণ্ড। মরিয়ম বাইতুল মাকদাস মসজিদের পূর্ব পাশের একটি কক্ষে ইতেকাফরত। আল্লাহর স্মরণে মগ্ন তিনি। হঠাৎ তার নির্জন কক্ষে উদয় হলেন এক অপরূপ সুপুরুষ। শুনুন কুরআনের বিবরণ :

"এই গ্রন্থে মরিয়মের কথা স্মরণ করো। সে যখন নিজ পরিবার পরিজনের নিকট থেকে এসে (মসজিদের) পূর্ব পাশে অবস্থান করছিল এবং পর্দা টেনে লোকজন থেকে নিজেকে আড়াল করে রেখেছিল, তখন আমি তার কাছে পাঠালাম আমার 'রূহ' (জিবরাঈল)কে। সে মরিয়মের সামনে পূর্ণ মানবিক কায়ায় উপস্থিত হলো। তাকে দেখেই মরিয়ম বলে উঠলো : "তোমার মধ্যে যদি আল্লাহর ভয় থেকে থাকে, তবে আমি তোমার থেকে আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাই। সে বললো : তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি তোমার প্রভুর দূত। তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন এই সুসংবাদ দিতে যে, তিনি তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র দান করবেন।" (সূরা মরিয়ম : আয়াত ১৬-১৯)

সূরা তাহরিমে বলা হয়েছে : "ইমরানের কন্যা মরিয়ম তার লজ্জাস্থানকে সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত করেছিল। পরে আমি তার মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দিলাম" (আয়াত : ১২)

সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে : "ফেরেশতা মরিয়মকে বললো : আল্লাহ আপনাকে তাঁর পক্ষ থেকে একটি ফরমানের (পুত্রের) সুসংবাদ দিচ্ছেন। তার নাম হবে 'মসিহ' ঈসা ইবনে মরিয়ম। সে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত হবে। আল্লাহর নৈকল্য লাভকারী লোকদের একজন হবে। সে আতুরঘরে ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবে। আর সে হবে যোগ্য লোকদের একজন।" (আয়াত : ৪৫-৪৬)

ফেরেশতার মুখ থেকে নিজের পুত্র হবার সংবাদ শুনে মরিয়ম বিস্মিত ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি তাজজুবের সাথে ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করেন : "আমার পুত্র হবে কেমন করে? কখনো কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। আর আমি তো ব্যাভিচারিণীও নই। কি করে হবে আমার পুত্র?" (সূরা মরিয়ম : ২০)

মরিয়মের বিস্ময়ের জবাবে ফেরেশতা তাঁকে বলেন, আপনার সন্তান হবে আল্লাহর ইচ্ছায় কুদরতিভাবে। ফেরেশতা মরিয়মকে যা বলেছিল, কুরআনে তা উল্লেখ হয়েছে এভাবে :

ফেরেশতা বললো : "আল্লাহর নিয়ম এটাই, তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোনো কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন শুধু এতোটুকুই বলেন : 'হও' আর সাথে সাথেই তা হয়ে যায়। আপনার পুত্রও এভাবেই হবে। আল্লাহ তাকে কিতাব ও প্রজ্ঞা দান করবেন। তাকে তাওরাত ও ইনজিল শিক্ষা দেবেন আর

তাকে বনি ইসরাঈলের জন্যে নিজের রসূল নিয়োগ করে পাঠাবেন।" (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৪৭-৪৯)

সূরা মরিয়মে ফেরেশতার জবাব উল্লেখ হয়েছে এভাবে :

"ফেরেশতা বললো : এমনটি হবেই। আপনার প্রভু বলেছেন : এ কাজ আমার জন্যে খুবই সহজ। আর একাজ আমি এ জন্যে করবো যে, আমি তাকে মানুষের জন্যে নিদর্শন এবং আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহে পরিণত করতে চাই।" (সূরা ১৯ মরিয়ম : আয়াত ২১)

ফেরেশতার সংবাদ দিয়ে যাবার পর আল্লাহ তা'আলার 'হও' নির্দেশে মরিয়ম হযরত ইসাকে গর্ভে ধারণ করেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বে মরিয়ম ইতেকাফ থেকে বের হয়ে একটু পূর্বদিকে বাইতুল লাহাম (বেথেলহেম) চলে যান। মানুষ তাঁকে অপবাদ দিতে পারে একথা ভেবে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর পায়ের দিক থেকে ফেরেশতা তাঁকে ডেকে বললেন, আপনি লোকদের ইংগিতে বলবেন, আজ আমি কথা না বলার রোজা রেখেছি। তাই আমি আজ কারো সাথে কথা বলবনা।

অচিরেই ভূমিষ্ঠ হলেন আল্লাহর নিদর্শন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম। কী অপরূপ সুন্দর শিশু! কুদরতি নিয়মে জন্ম তাঁর। মহান আল্লাহ তাঁর এই কুদরতি নিয়মের জন্ম সম্পর্কে বলেন : "আল্লাহর কাছে ঈসার উপমা হলো আদমের মতো। যেমন করে তিনি আদমকে সৃষ্টি করেছেন (বাবা মা ছাড়া) শুধু মাটি থেকে। তিনি শুধু বলেছিলেন 'হও' আর সাথে সাথে সে হয়ে গেলো।" (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৫৯)

অর্থাৎ হযরত আদম আলাইহিস সালামেরই মতো হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মও কুদরতিভাবেই হয়েছে। তাই হযরত ঈসা হলেন আল্লাহর 'কলেমা, আল্লাহর নিদর্শন'। আল্লাহ যে সর্ব শক্তিমান এটা তারই নিদর্শন।

ভূমিষ্ঠ হয়েই কথা বললেন ঈসা

ঈসা ভূমিষ্ঠ হবার পর মরিয়ম ছেলেকে বুকে করে নিজের আত্মীয় স্বজনের কাছে ফিরে এলেন। লোকেরা মরিয়মের কোলে বাচ্চা দেখে তাকে নানা কথা বলে তিরস্কার করতে লাগলো। তারা বললো, কিভাবে হলো তোমার ছেলে? মরিয়ম ইশারা করে বললেন, আমি কথা না বলার রোজা রয়েছি, আপনাদের প্রশ্ন ছেলেটাকেই জিজ্ঞাসা করুন। লোকেরা বললো : কোলের শিশুর সাথে কি কথা বলবো আমরা? লোকেরা একথা বলতেই ঈসা বলে উঠলেন :

"আমি আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব দান করেছেন এবং নবী বানিয়েছেন। আমাকে তিনি বরকতময় করেছেন যেখানেই আমি থাকি। আর তিনি আমাকে সালাত ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন যতোদিন আমি

জীবিত থাকি। তিনি আমাকে আমার মায়ের অধিকারের বিষয়ে সচেতন করেছেন। আমাকে তিনি অহংকারী ও হতভাগা বানাননি। আমার জন্ম, মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের দিন আমার প্রতি সালাম।" (সূরা মরিয়ম : আয়াত ২৭-৩৩)

হযরত ঈসার শৈশব

হযরত ঈসার শিশুবেলা সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায়না। বারনাবাস নামে হযরত ঈসার একজন হাওয়ারী (সাহাবী) ছিলেন। তিনি হযরত ঈসার জীবনী ও বাণী সংকলন করে গেছেন। ইন্জিল কিতাবের যেসব বাণী তাঁর জানা ছিলো, সেগুলোও তিনি এ গ্রন্থে সংকলন করেছেন। এ গ্রন্থটি 'বারনাবাসের ইনজিল' নামে খ্যাত। ইনজিল বা বাইবেল নামে যতো ব্যক্তি গ্রন্থ সংকলন করেছেন, তন্মধ্যে এটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। কারণ ইনি হযরত ঈসার সাথি ছিলেন আর অন্যান্য সংকলকরা হযরত ঈসাকে দেখেননি। আর বারনাবাসের ইনজিল ছাড়া বাকি বাইবেলগুলোকে লোকেরা বার বার নিজেদের মনমতো সম্পাদনা করেছে এবং রদবদল করেছে।

যাই হোক, বারনাবাস তাঁর সংকলিত ইনজিলে লিখেছেন, ঈসার বয়েস আট দিন হলে তাঁর মা তাঁকে নিয়ে বাইতুল মাকদাসের হাইকেলে আসেন। এখানে তাকে খতনা করান এবং তাঁর নাম রাখেন ইসু (ঈসা)। ফেরেশতা যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে মরিয়মকে পুত্র হবার সংবাদ দিতে এসেছিলেন, তখনই বলে গিয়েছিলেন তাঁর পুত্রের নাম হবে 'ঈসা'। সে হিসেবে মরিয়ম খতনা করিয়ে পুত্রের নাম রাখেন ঈসা।

হযরত ঈসার জন্মকালে জেরুজালেম এলাকার শাসক ছিলো হিরোদস। এ ব্যক্তি ছিলো রোম সম্রাট কাইজার অগস্টাসের অধীনস্থ শাসক। গণকরা হিরোদসকে বললো, বেথেলহামে এক শিশুর জন্ম হবে, যে গোটা ইহুদি জাতির ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হবে। একথা শুনে হিরোদস বেথেলহামের সব শিশুকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করে। ফলে ঘাতকদের হাত থেকে প্রিয় পুত্রকে বাঁচাবার জন্যে মরিয়ম ঈসাকে নিয়ে মিশর চলে আসেন। কয়েক বছর পর হিরোদস মারা গেলে মরিয়ম ঈসাকে নিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

হযরত ঈসার বয়স যখন ১২ বছর তখন থেকেই তিনি বাইতুল মাকদাসে নিয়মিত সালাত, সাওম ও অন্যান্য ইবাদত বন্দেগিতে মশগুল হয়ে পড়েন। ছোট বেলাতেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে দান করেছিলেন অগাধ জ্ঞান ও প্রভুত প্রজ্ঞা। তিনি এসময় থেকেই ইহুদি আলেমদের সভায় বসতেন। দীনি বিষয়ে তাদের সাথে আলোচনা করতেন। ইহুদি আলেমরা তাওরাত কিতাবকে যে বিকৃত করছিল এবং আল্লাহর কিতাবের মনগড়া ব্যাখ্যা দিচ্ছিল কিশোর ঈসা এসব বিষয়ে তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতেন। তাঁর গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য দেখে সবাই হতবাক হয়ে যেতো।

নবুয়্যত লাভ

ঈসার বয়স যখন ত্রিশ তখন একদিন তিনি হযরত ইয়াহইয়ার কাছে আসেন। ইয়াহইয়া তাঁকে গোসল করান এবং তাওবা করান। অতপর ঈসা অনবরত চল্লিশ দিন রোযা রাখেন।

এ সময় আল্লাহর দূত রূহুল কুদুস জিবরিল আমিন তাঁর কাছে আসেন অহি নিয়ে। আল্লাহ তাঁকে নবুয়্যত দান করেন এবং তাঁর প্রতি নাযিল করেন আল কিতাব ইনজিল। আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি ত্রিশ বছর বয়সেই নবুয়্যত লাভ করেন। নবুয়্যত লাভ করে তিনি বনি ইসরাঈলের জনগণকে উদ্দেশ্য করে ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণ কুরআনে উল্লেখ হয়েছে এভাবে :

"স্মরণ করো, মরিয়মের পুত্র ঈসা বলেছিল : হে বনি ইসরাঈল! আল্লাহ তোমাদের নিকট আমাকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। আমি আমার পূর্বে প্রেরিত তাওরাতের সত্যতা স্বীকার করি। তাছাড়া আমি সুসংবাদ দানকারী সেই রসূলের যিনি আমার পরে আসবেন এবং যার নাম হবে 'আহমদ'।" (সূরা ৬১ আস সফ : আয়াত ৬)

হযরত ঈসার দাওয়াত

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার নবুয়্যতি মালারই একটি কড়ি। তিনি ছিলেন আল্লাহর দাস ও রসূল। অন্য সকল নবী রসূলের মতোই তিনিও মানুষকে এক আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করার আহ্বান জানান। মানুষের মনগড়া আইন ও হুকুম বিধান পরিত্যাগ করতে বলেন। তিনি মানুষকে কি দাওয়াত দিতেন আল কুরআনে তা সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি মানুষকে বলতেন :

"তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর আমি যা বলি তা মেনে নাও। জেনে রাখো, কেবলমাত্র আল্লাহই আমার এবং তোমাদের প্রভু। সুতরাং শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত (দাসত্ব ও আনুগত্য) করো। এটাই সঠিক পথ।" (আল কুরআন ৩:৫০-১, ১৯:৩৬, ৪৩: ৬৪)

সূরা আল মায়িদায় বলা হয়েছে :

"ঈসা মসিহ বলেছিল : হে বনি ইসরাঈল! তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহর উপাসনা ও দাসত্ব করো। তিনিই আমার ও তোমাদের প্রভু। জেনে রাখো, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার বানাবে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তার আবাস হবে জাহান্নাম, আর এ রকম যালিমদের কোনো সাহায্যকারী হবেনা।" (সূরা ৫ আল মায়িদা : আয়াত ৭২)

আল কুরআন থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলো, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম মানুষকে সেই দাওয়াতই প্রদান করেন, যে দাওয়াত প্রদান করেছেন সকল নবী

রসুল। কুরআনের আলোকে তাঁর দাওয়াতকে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় তিনি মানুষকে নিম্নরূপ দাওয়াত দিয়েছিলেন :

১. এক আল্লাহর একত্ব, সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার আহ্বান।
২. মানুষের মনগড়া আইন নয়, আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান মেনে নেয়ার ও অনুকরণ করার আহ্বান।
৩. নবীর আনুগত্য ও অনুসরণের আহ্বান।
৪. শিরক পরিত্যাগ করার আহ্বান।
৫. আল্লাহই সব মানুষের মালিক ও প্রভু। নবী এবং সব মানুষ তাঁর দাস। সুতরাং কেবল আল্লাহর দাসত্ব মেনে নেয়ার আহ্বান।
৬. জাহান্নাম থেকে সতর্ক হবার আহ্বান।

ইহুদিদের বিরোধিতা

হযরত মূসা আলাইহিস সালামের পরে বনি ইসরাঈল ইয়াহুদা নামক একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের নামানুসারে নিজেদের ইহুদি বলে পরিচয় দিতে শুরু করে। ইহুদিরা বিভিন্ন সময় নিজেদের সুবিধামতো আল্লাহর কিতাব তাওরাতকে বিকৃত করে ফেলে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সংশোধনের জন্যে তাদের মধ্য থেকে বহু নবী প্রেরণ করেন। অল্প কিছু লোক ছাড়া অধিকাংশ লোকই নবীগণের বিরোধিতা করে। তাঁদের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালায়, এমনকি বহু নবীকে তারা হত্যা করে। ইতোপূর্বে আমরা একথাও জানতে পেরেছি যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের পরও তারা দু'জন নবীকে হত্যা করে। অর্থাৎ হযরত যাকারিয়া ও হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিমুস সালামকে। এভাবে নবীগণ তাদের কামনা বাসনা ও পার্থিব স্বার্থের বিরুদ্ধে কোনো কথা বললেই তারা তাঁদের বিরোধিতা শুরু করতো।

ইহুদি ধর্মের রাব্বি তথা পুরোহিতরাই হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সবচাইতে বেশি বিরোধিতা শুরু করে। তারা ধর্মকে উপার্জনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছিল। নিজেদের সুবিধামতো তারা আল্লাহর কিতাব তাওরাতকে রদবদল করে নিয়েছিল।

আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উপর ইনজিল কিতাব নাযিল করেন। ইহুদি রাব্বিরা তাওরাতে যে সব রদবদল করে ফেলেছিল সেগুলোর সংশোধনীসহ আল্লাহ তা'আলা বনি ইসরাঈলের জন্যে এই পূর্ণাঙ্গ কিতাব ইনজিল নাযিল করেন। এই কিতাবের মাধ্যমে তারা মনগড়াভাবে যেসব জিনিস হালাল করে নিয়েছিল আল্লাহ সেগুলো হারাম করে দেন এবং মনগড়াভাবে যেসব জিনিস তারা হারাম করে নিয়েছিল সেগুলো তিনি হালাল করে দেন। এতে ইহুদি পুরোহিতদের স্বার্থে আঘাত লাগে। ফলে তাদের গায়ে আগুন জ্বলে উঠলো। তারা কোমরে গামছা বেঁধে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে

ময়দানে নেমে পড়লো। শাসকগোষ্ঠী ও জনগণকে তারা হযরত ঈসার বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত ও উত্তেজিত করে তুলতে লাগলো।

উপদেশ দান ও মু'জিযা প্রদর্শন

আল্লাহর নবী হযরত ঈসা বনি ইসরাঈলকে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় আল্লাহর দিকে আহ্বান জানান। তিনি তাদেরকে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে বলেন। ভ্রান্ত পথ ত্যাগ করতে বলেন। তিনি তাদেরকে অনেক উপদেশ নসিহত প্রদান করেন। বনি ইসরাঈল যেনো তাঁকে আল্লাহর রসূল হিসেবে মেনে নেয় সে জন্যে আল্লাহ তাঁকে অনেকগুলো মুজিযাও প্রদান করেন। এ সম্পর্কে আমরা আল কুরআন থেকে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারি। মহান আল্লাহ আল কুরআনে বলেন :

"ঈসা তাদের বলেছিল : আমি তোমাদের মালিকের নিকট থেকে তোমাদের কাছে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। দেখো, আমি তোমাদের সামনে মাটি দিয়ে পাখির মূর্তি তৈরি করে তাতে ফু দিচ্ছি, আল্লাহর হুকুমে সেটি সত্যিকার পাখি হয়ে যাবে। আল্লাহর হুকুমে আমি জন্মগত অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করে দিতে পারি এবং মৃতকে জীবিত করতে পারি। তাছাড়া আমি বলে দিতে পারি তোমরা ঘরে কি খাও আর কি সঞ্চয় করো। তোমরা যদি মুমিন হও, তবে এগুলোর মধ্যে তোমাদের জন্যে (আমাকে রসূল মেনে নেয়ার) নিদর্শন রয়েছে। দেখো আমি তো সেই শিক্ষা ও হিদায়াতকেই সত্য বলে ঘোষণা করছি, যা আমার পূর্বে তাওরাতে নাযিল হয়েছে। তোমাদের জন্যে যেসব জিনিস হারাম ছিলো তার কতককে হালাল করার জন্যে আমি এসেছি। আমি তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে তোমাদের কাছে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। কাজেই আল্লাহকে ভয় করো আর আমার কথা মেনে নাও।" (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৪৯-৫০)

আল কুরআনের এই বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারলাম আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে অনেকগুলো মুজিযা দান করেছিলেন। সেগুলো হলো :

১. মাটি দিয়ে পাখি তৈরি করে তাতে জীবন দান করা।

২. জন্মগত অন্ধকে দৃষ্টি দান করা।

৩. কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করা।

৪. মৃতকে জীবিত করা।

৫. কে কি খেয়ে এসেছে তা বলতে পারা এবং

৬. কে ঘরে কি সঞ্চয় করে রেখেছে তা বলতে পারা।

বনি ইসরাঈলের চোখের সামনে তিনি এসব মু'জিযা দেখান। কিন্তু তারা মতবিরোধে লিপ্ত হয়। মহান আল্লাহ বলেন :

"ঈসা যখন সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে বনি ইসরাঈলের কাছে এসেছিল, বলেছিল: আমি তোমাদের কাছে হিকমাহ নিয়ে এসেছি। এ জন্যে এসেছি, তোমরা যেসব বিষয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছো, সেগুলোর কোনো কোনোটার মর্ম তোমাদের আমি খুলে বলবো। তাই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর আমার কথা মেনে চলো। সত্য কথা হলো, একমাত্র আল্লাহই আমার এবং তোমাদের মনিব। সুতরাং তোমরা কেবল তাঁরই হুকুম পালন করো। এটাই সরল সঠিক পথ। কিন্তু তার এই বক্তব্য সত্ত্বেও তারা নিজেদের মধ্যে মতবিরোধে লিপ্ত থাকলো। যারা যুলুম করেছে তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তি।" (সূরা ৪৩ যুখরুফ : আয়াত ৬৩-৬৫)

মুজিযা, যুক্তি ও মর্মস্পর্শী উপদেশের মাধ্যমে হযরত ঈসা তাদের বুঝাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তারা সত্যকে গ্রহণ করলনা। তারা কুফরিকে আঁকড়ে ধরলো। তারা আল্লাহর নবীকে পরিত্যাগ করলো। নবীর বিরোধিতায় এগিয়ে চললো।

কে আছো আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী?

ইহুদি পুরোহিতরা যখন ঈসার বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হলো এবং সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে দিলো, তখন আল্লাহর নবী হযরত ঈসা বিবেকবান লোকদেরকে আল্লাহর দীনের কাজে তাঁর সাহায্যকারী হবার আহ্বান জানান। তাঁর এ আহ্বানের কথা কুরআনে উল্লেখ হয়েছে এভাবে :

"ঈসা যখন অনুভব করলো, বনি ইসরাঈল কুফরির পথে অগ্রসর হচ্ছে, তখন সে বললো : কে আছো আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী? হাওয়ারিরা বললো : আমরা আছি আল্লাহর (পথে আপনার) সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। সাক্ষী থাকুন আমরা আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণকারী- মুসলিম। হে আমাদের মালিক আল্লাহ! তুমি যে বিধান অবতীর্ণ করেছো আমরা তা মেনে নিয়েছি এবং এই রসূলের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছি। তুমি সাক্ষীদানকারীদের মধ্যে আমাদের নাম লিখে নাও।" (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৫২-৫৩)

সূরা আস সফ-এ বলা হয়েছে : "মরিয়মের পুত্র ঈসা হাওয়ারীদের বলেছিল : আল্লাহর দিকে আহ্বানের কাজে কে আছো আমার সাহায্যকারী? হাওয়ারিরা বললো : আমরা আছি আল্লাহর (পথে আপনার) সাহায্যকারী। এ সময় বনি ইসরাঈলের একটি ক্ষুদ্র দল ঈমান আনলো আর বাকিরা করলো কুফরি।"(আয়াত ১৪)

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের চূড়ান্ত আহ্বানে আত্মোৎসর্গে প্রস্তুত কিছু লোক আল্লাহর পথে তাঁর সাথি হয়ে যায়। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সাথি বা সাহাবীগণকে কুরআনে হাওয়ারি বলা হয়েছে। হাওয়ারির শাব্দিক অর্থ- ধোপা বা সাফাইকারী। খাঁটি ও অনাবিল জিনিসকেও হাওয়ারি বলা হয়। এই

লোকগুলো খাঁটি ও অবিচল ঈমান নিয়ে সাফাই ও সংস্কারের কাজে আল্লাহর নবীর সাথি হওয়ায় তাদের হাওয়ারি বলা হয়েছে। তবে হযরত ঈসার এ খাঁটি হাওয়ারিদের সাথে কিছু মুনাফিকও ঢুকে পড়ে। হযরত ঈসার খাঁটি হাওয়ারি বা সাহাবীর সংখ্যা ছিলো বারজন।

হত্যা করো ঈসাকে

ইহুদি সমাজপতি ও পুরোহিতরা ভাবলো, ঈসাকে যদি আরো অবকাশ দেয়া হয়, তাহলে সে আমাদের ব্যাপারে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলবে। তারা এক জায়গায় সমবেত হয়ে শলাপরামর্শ করলো। তারা প্রস্তাব পাশ করলো, আর কিছুদিন অবকাশ দিলে ঈসা ইহুদিদের তাঁর অনুসারী বানিয়ে ফেলবে। তারা তাদের মনগড়া ধর্মীয় ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে বলে আশংকা করলো। একজন বললো, আমাদের জাতি আমাদের ধর্ম ত্যাগ করে ঈসার অনুসারী হবে, এর চাইতে এক ঈসাকে হত্যা করে ফেললেই সব লেটা চুকে যায়। এভাবে তারা আল্লাহর নবী হযরত ঈসাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলো।

ইহুদি নেতা পুরোহিতরা সম্রাটের কাছে গিয়ে অভিযোগ করে আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে। তারা তাকে বলে, ঈসা জনগণকে আপনার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে। আপনাকে কর দিতে নিষেধ করে। তাছাড়া সে ধর্মদ্রোহী এবং নিজেই ক্ষমতা দখল করতে চায়। এভাবে তারা রাজার কাছ থেকে হযরত ঈসার জন্যে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ আদায় করে।

হযরত ঈসা অহির মাধ্যমে ওদের ষড়যন্ত্রের বিষয়ে অবহিত হন। তাই তিনি নিজ শিষ্যদের প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করেন। অতপর শিষ্যদের সাথে নিয়ে তিনি সেই বিশেষ ঘরে ফিরে আসেন যেখানে সাধারণত তিনি এবং তাঁর শিষ্যরা অবস্থান করেন।

হযরত ঈসার হাওয়ারিদের মধ্যে ছিলো ইয়াহুযা নামে এক মুনাফিক। বাদশাহর সৈন্যরা হযরত ঈসাকে হত্যা করার জন্যে খোঁজাখুজি করছে। ইয়াহুযা সৈন্যদের আসতে দেখে তাদেরকে হযরত ঈসার অবস্থানস্থল দেখিয়ে দেয়।

আল্লাহ উঠিয়ে নেন ঈসাকে

ওরা আল্লাহর নবী হযরত ঈসাকে হত্যা করার জন্যে এগিয়ে আসছে তাঁর অবস্থানের সেই জায়গাটির দিকে। ওরা কাছাকাছি আসতেই মহাশক্তিমান আল্লাহ তাঁর রসূল হযরত ঈসাকে সেখান থেকে উঠিয়ে নেন নিরাপদে।

অপরদিকে হাওয়ারি বেশে যে মুনাফিকটি হযরত ঈসার অবস্থান নির্দেশ করে ঘাতকদের নিয়ে আসছিল, হযরত ঈসার কক্ষে প্রবেশ করতেই আল্লাহ তা'আলা ঐ মুনাফিকটি চেহারা ও কণ্ঠস্বর হযরত ঈসার চেহারা ও কণ্ঠস্বরের মতো করে দিলেন। ঘাতকরা পড়ে গেলো মহাসন্দেহে। তারা বলাবলি করতে লাগলো, এই

পেয়ে গেছি ঈসাকে। কেউ বললো, এ যদি ঈসা হয় তবে আমাদেরকে যে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল, সে কই?

- এ-ইতো ঈসা।
- তবে পথ প্রদর্শকটি কই?
- আমাদের সাথে তো এ-ই এসেছিল।
- ওর চেহারা তো এরকম নয়।
- এতো বিলকুল ঈসার চেহারা।
- ধরো একে, এ-ই ঈসা।
- না, আমি ঈসা নই; আমি....
- আসলে এতো ঈসা হতে পারেনা।
- না, না এ-ই ঈসা। পাকড়াও করো একে।
- আমি ঈসা নই... আমি...
- তুমিই ঈসা, তুমিই...

অতপর তারা ঈসার আকৃতির ঐ গাদ্দারটিকে ঈসা মনে করে হত্যা করলো, শুল বিদ্ধ করলো। কিন্তু তাদের মনে সন্দেহ থেকেই গেলো। কেউ মনে করলো তারা হযরত ঈসাকেই হত্যা করেছে, আবার কেউ মনে করলো, না তারা যাকে হত্যা করেছে, সে প্রকৃতপক্ষে ঈসা নয়। এভাবে ঘাতকদের মনে সন্দেহ থেকে গেলো। একই রকম সন্দেহ হযরত ঈসার হাওয়ারিদের মনেও থেকে গেলো। কেউ মনে করে হযরত ঈসাকে হত্যা করা হয়েছে, আবার কেউ মনে করে, তিনি বেঁচে গেছেন। বিষয়টির জট খুলে দিয়েছে আল কুরআন। মহান আল্লাহ আল কুরআনে বলেন :

"তারা অভিশপ্ত হয়েছে 'আমরা আল্লাহর রসূল মরিয়মের পুত্র ঈসা মসিহকে হত্যা করেছি' তাদের এই উক্তির জন্যে। অথচ আসল ঘটনা হলো, তারা ঈসাকে হত্যাও করেনি, ক্রুশবিদ্ধও করেনি, বরং তাদের সামনে গোলক ধাঁধা সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছিল। আসলে এ বিষয়ে তাদের প্রকৃত জ্ঞান নেই। তারা চলছে আন্দাজ অনুমান নিয়ে। একথা নির্ঘাত সত্য যে, আল্লাহ তাকে নিজের দিকে তুলে নিয়ে গেছেন। আসলে আল্লাহ মহাকৌশলী ও অপরাজিত শক্তিধর।" (সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ১৫৭-১৫৮)

হারিয়ে গেলো ইনজিল

ইনজিল কোনো লিখিত কিতাব ছিলনা। এ কিতাব হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি অহি করা হয়েছে। তিনি অহির মাধ্যমে আল্লাহর আয়াত লাভ করতেন এবং সে অনুসারে মানুষকে দাওয়াত দিতেন এবং সাথিদের শিক্ষা দিতেন। আল্লাহ যখন তাঁকে উঠিয়ে নিলেন এবং তাঁর সাথিরাও ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। তখন এ কিতাব দুনিয়া থেকে মুছে গেলো।

হযরত ঈসার সাথিরা পরবর্তীকালে তাঁর শিক্ষা প্রচার করেন। কেউ কেউ নিজের স্মৃতি থেকে হযরত ঈসার শিক্ষা সংকলন করেন। কয়েকশ বছর পর্যন্ত সেসব সংকলন বার বার সম্পাদনা সংযোজন ও রদবদল হতে থাকে। খৃষ্টানরা বর্তমানে তাদের নিজেদের হাতে তৈরি করা চারখানা ইনজিল চালু রেখেছে। এগুলো সংকলন করেছেন মথি, ইউহান্না, যোহন ও লুক।

এগুলো হযরত ঈসাকে উঠিয়ে নেয়ার সত্তর থেকে একশত বছর পরে লিখিত হয়েছে। তিনি যে ভাষায় ইনজিল প্রচার করেছিলেন সে ভাষায় নয় বরং গ্রিক ভাষায় এগুলো লেখা হয়েছে। অতপর এগুলো বারবার রদবদল করা হতে থাকে। গ্রিক ভাষায় মূল পাণ্ডুলিপিগুলিও হারিয়ে গেছে। হযরত ঈসার উর্ধ্বগমনের চারশ বছর পরের অনুলিখিত কিছু গ্রিক পান্ডুলিপি থেকে বর্তমান বাইবেলগুলো সম্পাদনা করা হয়েছে। এ চারশ বছর যাবত তারা মূল সংকলনগুলোতে বহু রদবদল করেছে। (ইনসাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকা 'বাইবেল' শীর্ষক অধ্যায় ১৯৪৬ সংস্করণ)

ফলে আল্লাহর কিতাব ইনজিলের আর কোনো অস্তিত্ব পৃথিবীতে নাই। একদিকে হযরত ঈসা মূল কিতাব লিখিত রেখে যাননি। অপরদিকে সত্তর থেকে একশ বছর পর ভিনদেশী ভাষায় লিখিত ইমজিল নামক পান্ডুলিপিগুলি বার বার রদবদল হয়ে চূড়ান্তভাবে মানব রচিত গ্রন্থে পরিণত হয়েছে।

তবে হযরত ঈসার একজন খাঁটি হাওয়ারি বার্নাবাস একখানা গ্রন্থ নিজের স্মৃতি থেকে সংকলন করেছিলেন। সেটা অনেকটা বিশুদ্ধ। কিন্তু বর্তমান খৃষ্টানরা সেটা মানছেনা।

নবী ও নবীর মাকে খোদা বানিয়েছে যালিমরা

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে উঠিয়ে নেয়ার পর মানুষের মাঝে তাঁর প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর হাওয়ারিরা এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়েন দাওয়াতি মিশন নিয়ে। ফলে দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে এখানে সেখানে। লোকেরা হযরত ঈসার প্রতি ঈমান আনতে থাকে। পরবর্তীকালে ঈসার অনুসারীদের মন মগজে তাঁর ব্যাপারে বিভ্রান্তি ঢুকে পড়ে। হযরত ঈসা ও তাঁর মাতার সাথে আল্লাহর যেসব নিদর্শন জড়িত ছিলো, সেগুলোর কথা ভেবে তারা বিস্ময়বোধ করে। বিশেষ করে;

১. হযরত মরিয়মের অলৌকিক গর্ভধারণ।

২. বিনা বাপে ঈসার জন্ম।

৩. আঁতুর ঘরে হযরত ঈসার কথা বলা।

৪. তাঁর মৃতকে জীবিত করতে পারাসহ অন্যান্য মু'জিযা এবং

৫. তাঁকে উঠিয়ে নেয়া বা ক্রুশবিদ্ধ করা সংক্রান্ত গোলক ধাঁধা।

এই জিনিসগুলো চিন্তা করতে করতে তাদের মধ্যে নতুন নতুন আকিদা বিশ্বাস সৃষ্টি হয়। তারা ভাবে, ঈসা মানুষ হতে পারেনা, ঈসা খোদা বা খোদার পুত্র হবে। আরো পরে এসে তারা সিদ্ধান্ত নিলো, ঈসার মাতা মরিয়মও একজন খোদা। তিনি খোদার মাতা। এভাবে তারা ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাসের জালে জড়িয়ে পড়লো। হযরত ঈসার প্রচারিত তাওহীদের ধারণা বিশ্বাস থেকে তারা দূরে সরে গিয়ে শিরকের মাঝে নিমজ্জিত হলো। আর এই ভ্রান্ত শিরকি ধারণা বিশ্বাসকে তারা হযরত ঈসার ধর্ম বলে প্রচার করে বেড়ায়। কিয়ামতের দিন হযরত ঈসা খৃষ্টানদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবেন। আল কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

"সেদিন আল্লাহ বলবেন : হে মরিয়মের পুত্র ঈসা! আমার সেসব দান ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যা আমি তোমাকে ও তোমার মাকে দিয়েছিলাম। আমি পবিত্র রূহের মাধ্যমে তোমাকে সাহায্য করেছিলাম। আমার অনুগ্রহেই তুমি দোলনায় থেকেও মানুষের সাথে কথা বলেছিলে এবং পরিণত বয়সেও। আমি তোমাকে কিতাব, হিকমাহ এবং তাওরাত ও ইনজিল শিক্ষা দিয়েছিলাম। তুমি আমার অনুমতিক্রমে পাখির আকৃতির মাটির পুতুল তৈরি করে তাতে ফু দিতে এবং আমার হুকুমে তা পাখি হয়ে যেতো। আমার হুকুমে তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করে দিতে। আমার হুকুমে তুমি মৃতদের বের করে আনতে। তারপর তুমি যখন এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন বনি ইসরাঈলের সামনে পেশ করলে, তখন তাদের ওখানকার কাফিররা বললো, এগুলো যাদু ছাড়া আর কিছু নয়। তখন আমিই তোমাকে তাদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম। আর আমি যখন হাওয়ারিদের ইংগিত করলাম : আমার ও আমার রসূলের প্রতি ঈমান আনো, তারা বলেছিল : আমরা ঈমান আনলাম, সাক্ষী থাকো আমরা মুসলিম হলাম।... আল্লাহ যখন বলবেন : হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তুমি কি লোকদের বলেছিলে : আল্লাহ ছাড়া আমাকে এবং আমার মাকেও খোদা হিসেবে গ্রহণ করো? তখন সে জবাব দেবে : প্রভু পবিত্র আপনার সত্তা! যে কথা বলার কোনো অধিকার আমার ছিলনা, সে ধরনের কোনো কথা আমি বলতে পারিনা। আমি যদি এমন কথা বলতাম তবে আপনি নিশ্চয়ই তা জানতেন। আমার মনে কি আছে আপনি জানেন। কিন্তু আপনার মনের বিষয় আমি জানিনা। আপনি তো সমস্ত গোপন বিষয়ের জ্ঞান রাখেন। আপনি যা নির্দেশ দিয়েছিলেন, আমি তার বাইরে তাদের কিছুই বলিনি। আপনার নির্দেশ মতো তাদের আমি বলেছিলাম : তোমরা কেবল আল্লাহর দাসত্ব ও ইবাদত করো। তিনিই আমার এবং তোমাদের প্রভু।" (সূরা আল মায়িদা : আয়াত ১১০-১১৮)

সূরা আন নিসায় আল্লাহ বলেন :

"হে আহলে কিতাব! কাজেই তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান আনো। তিন (খোদা) বলোনা। এ থেকে নিবৃত্ত হও। এটাই তোমাদের জন্য

কল্যাণকর। আল্লাহই একমাত্র ইলাহ। কেউ তাঁর পুত্র হবে- এ থেকে তিনি পবিত্র। পৃথিবী ও আকাশের সব কিছুই তো তাঁর।" (আয়াত : ১৭১)

"যারা বলে মরিয়মের পুত্র মসিহ আল্লাহ, তারা কুফরির নীতি গ্রহণ করেছে। তাদের জিজ্ঞেস করো, আল্লাহ যদি মরিয়মের পুত্র ঈসা ও তার মাকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেন, তবে তাঁর সংকল্প থেকে তাঁকে বিরত রাখার ক্ষমতা কার আছে? মহাবিশ্ব, এই পৃথিবী এবং এগুলোর মাঝে যা কিছু আছে এ সব কিছুই তো আল্লাহর। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি সর্ব শক্তিমান। (সূরা আল ৫ মায়িদা : আয়াত ১৭)

ব্যাস্ আল কুরআন থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো, খৃষ্টানরা নিজেদের জন্যে ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাস তৈরি করে নিয়েছে। হযরত ঈসা অন্য সকল রসূলের মতো আল্লাহর দাস ও রসূল ছিলেন, এর বেশি তিনি কিছুই ছিলেননা :

"মরিয়মের পুত্র ঈসা আল্লাহর রসূল ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। তার পূর্বেও এরকম বহু রসূল অতীত হয়েছে। তার মা ছিলো সতী সাধ্বী সত্যবাদিনী। তারা দু'জনেই খানা খেয়ে বেঁচে থাকতো। না খেয়ে যাদের চলতোনা, তারা কেমন করে খোদা হয়?" (সূরা ৫ মায়িদা : আয়াত ৭৫)

খৃষ্টানরা আরেকটি ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করে। তাহলো যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মানুষের পাপ মোচন করে গেছেন। নাউযুবিল্লাহ! অথচ কুরআন পরিষ্কার বলেছে, ঈসা ক্রুশ বিদ্ধ হননি, তারা তাকে হত্যাও করেনি। তাছাড়া কুরআন একথাও বলছে : প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই নিজের কৃত পাপ পুণ্য নিয়ে আল্লাহর কাছে হাজির হবে। কেউ কারো পাপের বোঝা বইবেনা।

আবার আসবেন ঈসা

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সা. আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, হযরত ঈসা কিয়ামতের পূর্বে আবার পৃথিবীতে আসবেন। আমরা জানতে পেরেছি পৃথিবীতে হযরত ঈসার মৃত্যু হয়নি। আল্লাহ তাঁকে জীবিত উঠিয়ে নিয়ে গেছেন। উঠিয়ে নেয়ার সময় হযরত ঈসার বয়েস ছিলো তেত্রিশ বছর। তিনি পুনরায় পৃথিবীতে এসে চল্লিশ বছর ইসলামের পক্ষে কাজ করে মৃত্যুবরণ করবেন।

হযরত মুহাম্মদ সা. বলেছেন, ঈসা এসে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন এবং শুকর বিনাশ করবেন। মুসলমানদের ইমাম যখন ফজর নামায পড়াবার জন্যে প্রস্তুত হবেন, তখনই তাঁর আবির্ভাব ঘটবে। তিনি মুসলিম ইমামের পিছে নামায পড়বেন। মুহাম্মদ সা.-এর অনুসারী হিসেবে ইসলামের জন্যে কাজ করবেন। দাজ্জাল মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিরাট ইহুদি বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসবে।

তখন ঈসা তার দিকে এগিয়ে যাবেন। ঈসাকে দেখে সে ভীত জড়সড় হয়ে যাবে। সে তার বাহিনী নিয়ে পালাতে থাকবে। তখন মুসলমানরা হযরত ঈসার নেতৃত্বে তাদের তাড়া করবে। হযরত ঈসা দাজ্জালকে হত্যা করবেন। ইহুদিরা

পালাবে। গাছপাথর ডেকে বলবে : হে মুসলমান, এই যে আমার আড়ালে ইহুদি পালিয়েছে তাকে হত্যা করো। এভাবে দাজ্জাল বাহিনী নির্মূল হবে। পৃথিবীতে ইসলাম কায়েম হবে। তখন মানুষ এক আল্লাহর দাসত্ব করবে। খৃষ্টানরাও দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে। আপনার কি মনে হয় হযরত ঈসার পুনরাগমন ঘনিয়ে এসেছে? ইসলামের জাগরণ তো সৃষ্টি হয়েছে।

এক নজরে হযরত ঈসা

তাঁর জন্ম এখন থেকে দু'হাজার বছর আগে। তাঁর জন্ম সন অনুযায়ী খৃষ্ট সন গণনা করা হয়।

আল্লাহর ইচ্ছায় বিনা বাপে জন্ম। মাতার নাম মরিয়ম বিনতে ইমরান। ভূমিষ্ঠ হয়েই কথা বলেন।

ত্রিশ বছর বয়সে নবুয়্যতপ্রাপ্ত হন।

তাঁর প্রতি ইনজিল কিতাব অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহ তাঁকে বেশ কয়েকটি মু'জিযা দান করেন।

তিনি মানুষকে এক আল্লাহর দাসত্ব-আনুগত্য করতে বলেছেন। আল্লাহর সাথে কাউকেও শরিক করতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহর রসূল হিসেবে তিনি বনি ইসরাঈলকে তাঁর আনুগত্য করতে বলেন।

তিনি মানুষকে আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা গ্রহণ করতে এবং আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা বর্জন করতে বলেন।

তিনি মানুষকে সালাত কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে নির্দেশ দিতেন।

তিনি সকল নবী রসূলের মতোই একজন রসূল ছিলেন।

তিনি নিজেকে আল্লাহর দাস এবং রসূল বলে ঘোষণা করেন। এছাড়া নিজের সম্পর্কে অন্য কোনো দাবি তিনি করেননি।

তিনি মুহাম্মদ সা.-এর আগমনের সুসংবাদ প্রদান করে গেছেন।

স্বার্থবাদী ইহুদি আলেম ও সমাজপতিরা তাঁর বিরোধিতা করে এবং তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে।

কিছু সংখ্যক হাওয়ারি তাঁর প্রতি ঈমান আনে ও তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসে।

রাজার সৈন্যরা তাঁকে হত্যা করতে এগিয়ে এলে আল্লাহ তাঁকে নিজের দিকে উঠিয়ে নেন।

তাঁকে হত্যার ব্যাপারে আল্লাহ তাদেরকে গোলক ধাঁধায় ফেলে দেন। তারা তাঁকে হত্যা করেছে কিনা সে ব্যাপারে তারা নিজেরাই নিশ্চিত ছিলনা।

খৃষ্টানরা হযরত ঈসাকে খোদা ও খোদার পুত্র আখ্যা দিয়ে শিরকে নিমজ্জিত হয়েছে। কিয়ামতের দিন হযরত ঈসা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবেন।

ইনজিল কিতাব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে প্রচলিত বাইবেলসমূহ আল্লাহর কিতাব ইনজিল নয়। এগুলি মানব রচিত গ্রন্থ।

অন্য সকল নবী রসূলের মতো আল্লাহর রসূল হিসেবে হযরত ঈসার প্রতি ঈমান রাখা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানের অংশ।

হযরত ঈসা আবার পৃথিবীতে আসবেন। তখন আসবেন হযরত মুহাম্মদ সা.-এর অনুসারী উম্মত হিসেবে। তখন তিনি খোদাদ্রোহী ইহুদিদের নির্মূল করবেন এবং খৃষ্টানদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের অবসান ঘটাবেন। তখন তাঁর নেতৃত্বে সারা বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে।

হযরত ঈসা নিজে তাঁর পূর্বেকার সকল নবী রসূল এবং তাঁর পরে আগত হযরত মুহাম্মদ সা. বিশ্ববাসীকে একই মূল বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দিয়েছিলেন। সে বিষয়গুলো হলো :

১. আল্লাহকে এক, একক, অনন্য এবং সার্বভৌম মালিক ও ক্ষমতাধর বলে বিশ্বাস করা।
২. কেবল এক আল্লাহর দাসত্ব, আনুগত্য ও ইবাদত উপাসনা করা। তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করা।
৩. আল্লাহ নবীর মাধ্যমে জীবন যাপনের যে বিধান পাঠিয়েছেন, একনিষ্ঠভাবে তার ভিত্তিতে জীবন যাপন করা।
৪. সকল কাজে নবীর আনুগত্য ও অনুসরণ করা।
৫. আল্লাহর দাসত্ব ও নবীর আনুগত্যের পথে পরকালীন মুক্তির জন্যে একমুখী হয়ে কাজ করা।

আল কুরআনে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম

আল কুরআনে শ্রেষ্ঠ নবী রসূলগণের সাথে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের নাম উল্লেখ হয়েছে। তিনি ছিলেন একজন উচ্চ মর্যাদার রসূল। আল কুরআনে তাঁর নাম উল্লেখ হয়েছে ২৫ বার। যে সব সূরায় উল্লেখ হয়েছে সেগুলো হলো :

আল বাকারা : ৮৭, ১৩৬, ২৫৩। আলে ইমরান : ৪৫, ৫২, ৫৫, ৫৯, ৮৪। আন নিসা : ১৫৭, ১৬৩, ১৭১। আল মায়িদা : ৪৬, ৭৮, ১১০, ১১২, ১১৪, ১১৬। আল আন'আম : ৮৫। মরিয়ম : ৩৪। আল আহ্যাব : ৭। আশ শুরা : ১৩। যুখরুফ : ৬৩। আল হাদিদ : ২৭। আস সফ : ৬, ১৪।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে আল কুরআনের নিম্নোক্ত অংশগুলো পড়বেন :

সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৩৫-৬০। সূরা আন নিসা: আয়াত ১৫৩-১৬৫ ও ১৭১-১৭৩। সূরা আল মায়িদা : আয়াত ৪৬-৫১, ৬৩-৭৮, ১০৯-১৬০। সূরা মরিয়ম : আয়াত ১৬-৪০। সূরা যুখরুফ : আয়াত ৫৭-৬৫। সূরা আস সফ : আয়াত ৬, ১৪।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রকৃত অনুসারী হলেন তারা, যারা হযরত মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি ঈমান এনে তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করছেন।

২৫

বিশ্বনবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ*

আলাইহিস্ সলাতু ওয়াস্ সালাম

নবুয়্যতের ধারা একটি কড়ির মালার মতো। এ মালার প্রথম কড়ির নাম আদম এবং শেষ কড়ির নাম মুহাম্মদ। এ দুটি কড়ির মাঝখানে রয়েছে শত শত হাজার হাজার কড়ি।

১. অনন্য তিন বৈশিষ্ট্য

অন্যসব নবী রসূলের মতোই মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. ছিলেন একজন মানুষ, একজন নবী, একজন রসূল। তবে মহাবিশ্বের মালিক মহান আল্লাহ্ তাঁকে এমন তিনটি বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যা অন্য কোনো নবী রসূলকে দান করেননি। সে তিন বৈশিষ্ট্য হলো:

এক: সর্বশেষ নবী ও রসূল। তাঁর মাধ্যমে মহান আল্লাহ নবুয়্যত ও রিসালাতের ধারা শেষ করে দিয়েছেন। তাঁর নবুয়্যতি আদর্শই কিয়ামত পর্যন্ত অনুসরণীয়।

দুই: বিশ্বনবী। মহান আল্লাহ্ তাঁকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে কিয়ামত পর্যন্তকার সমস্ত মানুষের নবী ও রসূল নিযুক্ত করেছেন।

তিন: সমগ্র মানবজাতির জন্যে রহমত ও আশীর্বাদ। তাঁকে পাঠানো হয়েছে রহমত, আশীর্বাদ ও অনুকম্পা স্বরূপ সমগ্র মানবজাতির জন্যে।

এ তিনটি বিষয়ের প্রমাণ হলো আল কুরআনের নিম্নোক্ত তিনটি আয়াত:

১. মুহাম্মদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নয়; বরং আল্লাহর রসূল এবং সর্বশেষ নবী। আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞাত। (সূরা ৩৩ আহযাব: আয়াত ৪০)

২. আমরা অবশ্যি তোমাকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে। তবে অধিকাংশ মানুষই এলেম রাখেনা। (সূরা ৩৪ সাবা: আয়াত ২৮)

৩. (হে মুহাম্মদ!) আমরা তোমাকে রসূল মনোনীত করে পাঠিয়েছি সমগ্র জগদ্বাসীর জন্যে রহমত (অনুকম্পা ও আশীর্বাদ) হিসেবে। (সূরা ২১ আল আম্বিয়া: আয়াত ১০৭)

---

* আমরা 'বিশ্বনবীর শ্রেষ্ঠ জীবন' নামে যুব সমাজের জন্যে বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরো বিস্তারিত আলাদা জীবনী গ্রন্থ লিখেছি। সেটা এ গ্রন্থের সাথে মিলিয়ে পড়লে আরো প্রশস্ত ধারণা লাভ করা যাবে। –গ্রন্থকার

২. জীবনকাল

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা-এর জীবনকাল পূর্বকালের নবীগণের জীবনকালের মতো অজ্ঞাত নয়, অস্পষ্ট নয়। ইতিহাসে তাঁর জীবনকাল জ্ঞাত ও সুস্পষ্ট।

ঈসা আ.-এর পরে তাঁর জন্ম হয়েছে। ঈসা আ.-এর জন্ম সাল থেকে খৃষ্ট সন চালু হয়েছে।

মুহাম্মদ সা.-এর জন্মকালের হিসাব রাখা হয়েছে চন্দ্রমাসের হিসেবে। পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকরা সেটাকে খৃস্ট বর্ষের সাথে সংযুক্ত করেছেন। সে হিসেবে তাঁর জন্ম তারিখ হলো ৯ রবিউল আওয়াল, সোমবার, ২২ এপ্রিল, ৫৭১ খৃষ্টাব্দ। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন, ১২ রবিউল আওয়াল, সোমবার, ৫৭০ খৃষ্টাব্দ। তবে পূর্বে মতটাই ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সঠিক।

এই পার্থক্যটা হয়েছে পরবর্তীকালে চন্দ্র মাসের হিসাবকে খৃষ্ট সনের সাথে মিলাতে গিয়ে এবং চান্দ্র বর্ষ এবং সূর্য বর্ষের মধ্যে আট/দশদিন ফারাক থাকার কারণে।

তাঁর বয়েস যখন চল্লিশ বৎসর ছয় মাস ষোল দিন, তখন তিনি নবুয়্যত লাভ করেন। এটা ছিলো ৬১০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস। চন্দ্রমাস ছিলো রমযান।

তিনি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন ৬২২ খৃষ্টাব্দে। এ সময় তাঁর বয়েস ছিলো ৫৩ বছর।

তাঁর ওফাত বা মৃত্যু হয়েছিল সোমবার। এটা ছিলো ১২ রবিউল আউয়াল, ১১ হিজরি, ৬৩২ খৃষ্টাব্দ।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর জীবনকাল ছিলো ৬৩ বছর। নবুয়্যতকাল ছিলো ২৩ বছর। নবুয়্যতপূর্ব জীবন ছিলো ৪০ বছর। ফলে তাঁর জীবনকাল একেবারেই সুস্পষ্ট।

৩. জন্ম কোথায়, কোন্ বংশে

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর জন্মস্থান মক্কায়। এটি একটি প্রাচীন শহর। মক্কা বর্তমান সৌদি আরবের অন্তরভুক্ত। এটি লোহিত সাগরের পূর্ব তীরের জেদ্দা নৌ-বন্দর থেকে পঞ্চাশ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত।

চৌদ্দ শত বছর পূর্বের মক্কা ছিলো তরুলতা বিহীন পাহাড় টিলা আর পাথর কংকরময় এক মরু শহর। তখন তাদের প্রধান ফসল ছিলো খেজুর, কোনো কোনো এলাকায় আংগুর ও যব। শহরটি প্রধানত ছিলো ব্যবসা এবং আমদানি নির্ভর। এ ছাড়া এখানকার লোকেরা উট এবং মেষ পালন করতো। আর ঘোড়া ছিলো তাদের বাহাদুরির প্রতীক।

খৃষ্টপূর্ব দুই হাজার বছরেরও কিছু আগের কথা। তখন মক্কায় কোনো মানুষ বসবাস করতোনা। এটি ছিলো জ মানবহীন পাথর পর্বতের এক ভুতুড়ে

নির্জনভূমি। তখন মহানবী ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাঁর দুই পুত্রের একজনকে এই নির্জন মক্কায় পুনর্বাসন করেন। তিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল ইসমাঈল আলাইহিস সালাম।

অতপর আল্লাহর নির্দেশে ইবরাহিম এবং ইসমাঈল আ. মক্কার বুকে নির্মাণ করেন আল্লাহর ঘর কা'বা ঘর। ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে ইসমাঈলের বংশধর। বাইরের কিছু লোকও পরবর্তীতে এই শহরের আশে পাশে এসে বসবাস করতে থাকে। এভাবেই গড়ে উঠে মক্কানগরী।

হযরত ইবরাহিম ও ইসমাঈলের বংশধররা পরবর্তীতে কুরাইশ বংশ নামে খ্যাতি অর্জন করে। এ বংশেরই একটি শাখার নাম বনু হাশেম। বনু হাশেমই কুরাইশদের নেতৃত্ব দান করতো।

এই বনু হাশেম বংশেই কুরাইশ নেতা আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আবদুল্লাহর ঔরসে এবং মা আমিনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন বিশ্বনবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

সুতরাং মুহাম্মদ সা. ইবরাহিম আ.-এর শ্রেষ্ঠ বংশধর।

৪. নবুয়্যতপূর্ব জীবন : শৈশব

বিশ্বনবী সা. মাতৃগর্ভে। এসময় তাঁর পিতা আবদুল্লাহ সিরিয়ায় বাণিজ্যিক সফরে যান। সেখান থেকে ফেরার পথে তিনি পথিমধ্যে মদিনায় মৃত্যুবরণ করেন। বিধবা হয়ে পড়েন মা আমিনা। মাতৃগর্ভে থাকতেই ইয়াতিম হয়ে পড়েন বিশ্বনবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.।

তাঁর জন্মকালে জীবিত ছিলেন তাঁর দাদা কুরাইশ নেতা আবদুল মুত্তালিব, বড় চাচা আবু তালিব, অন্যান্য চাচা এবং ফুফুরা।

কুরাইশদের বংশীয় রীতি অনুযায়ী জন্মের কয়েকদিনের মধ্যে লালন পালন ও বিশুদ্ধ আরবি ভাষা শেখানোর উদ্দেশ্যে তাঁকে ন্যস্ত করা হয় বেদুইন ধাত্রী মা হালিমার দায়িত্বে। ছয় বছর বয়েস হলে হালিমা তাঁকে মায়ের কোলে ফেরত দিয়ে যান। মা আমিনা ফিরে পান বুকের ধন মুহাম্মদকে।

দাদা আবদুল মুত্তালিবের সবচেয়ে প্রিয় নাতি মুহাম্মদ। চাচা এবং ফুফুদের কাছেও সর্বাধিক প্রিয়। শিশুকাল থেকেই সবাই হয়ে পড়েন তাঁর গুণমুগ্ধ। সুন্দরতম গুণাবলি আর মহোত্তম আচরণে তিনি শিশুকাল থেকেই সবার সেরা। ফলে সবার প্রিয় মুহাম্মদ। ভবিষ্যতে নেতা এবং সেরা মানুষ হবার সব গুণাবলিই ফুটে উঠেছে শিশু মুহাম্মদের চরিত্রে।

মুহাম্মদের বয়েস ছয় কি আট। এ সময় মা আমিনা সিদ্ধান্ত নেন ছেলেকে দেখাতে নিয়ে যাবেন মদিনায় ওর মাতুলালয়। তাছাড়া ওর বাবার কবরও

ওখানে। দেখিয়ে আনবেন বাবার কবরও। ফলে তারা মদিনায় এলেন। থাকলেন মাস খানেক। তারপর–

তারপর ফিরে চললেন মক্কার উদ্দেশ্যে। কিন্তু পথিমধ্যে প্রচণ্ড জ্বর আক্রমণ করলো মা আমিনাকে। শেষ পর্যন্ত তিনি পথেই মারা গেলেন। সাথে ছিলেন মায়ের সেবিকা উম্মে আয়মান। মায়ের মতোই তিনি মুহাম্মদকে লালন পালন করেছেন সারাজীবন। তিনি মুহাম্মদকে কোলে জড়িয়ে ফিরে এলেন মক্কায়।

দাদা আবদুল মুত্তালিব পরম আদর যত্নে গড়ে তুলছিলেন নাতি মুহাম্মদকে। কিন্তু এরি মধ্যে দু'বছরের মাথায় তিনিও ইহকাল ত্যাগ করেন। পরিবর্তন হয় অভিভাবক। এবার মুহাম্মদের অভিভাবকের দায়িত্ব নেন বড় চাচা আবু তালিব। আবু তালিব নিজ সন্তানদের চেয়েও অধিক স্নেহ এবং আদর যত্ন করতেন এতিম ভাতিজা মুহাম্মদকে। আবু তালিব একবার মুহাম্মদকে বারো বছর বয়েসে সিরিয়ায়ও নিয়ে যান বাণিজ্যিক সফরে। এ সফরে আবু তালিব মুহাম্মদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন অনেক অলৌকিকত্ব।

এভাবে তিনি উপযুক্ত অভিভাবকের দায়িত্বেই বেড়ে উঠেন ছোট বেলা থেকে। এ প্রসঙ্গেই মহান আল্লাহ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন : 'তিনি কি তোমাকে এতিম পাননি, তারপর আশ্রয় দেননি?' (আল কুরআন ৯৩:৬)

৫. নবুয়্যতপূর্ব জীবন: যৌবনকাল

এরি মধ্যে মুহাম্মদ নিজেকে দক্ষ ও সৎ ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। অপরদিকে সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার ও সমাজসেবার মাধ্যমে তিনি মক্কার জনগণের নয়নমণিতে পরিণত হন। জনগণ তাঁকে উপাধি দেয় 'আল আমিন' ও 'আস্ সাদিক'। এর মানে পরম বিশ্বস্ত ও মহা সত্যবাদী।

পঁচিশ বছর বয়েসে বিয়ে করেন খাদিজাকে। তিনি ছিলেন খাদিজা তাহিরা- পবিত্র নারী খাদিজা। রূপে, গুণে এবং সহায় সম্পদে তিনি ছিলেন মক্কার সেরা নারী। মক্কার সেরা নেতা ও ধনীদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তিনি নিজেই স্বামী হিসেবে পছন্দ করে নেন ভবিষ্যতের মহাপুরুষ মুহাম্মদকে।

খাদিজার গর্ভে জন্ম হয় বিশ্বনবীর চার কন্যা- উম্মে কুলসুম, যয়নব, রুকাইয়া ও ফাতিমা। প্রথমে কাসেম নামে একটি পুত্রের জন্ম হয়, কিন্তু জন্মের পর স্বল্প সময়ের মধ্যেই কাসেম মারা যান।

ইতোমধ্যে সামাজিক বিবাদ ফায়সালায়ও মুহাম্মদের প্রশংসনীয় কৃতিত্ব সবার কাছে সমাদৃত হয়। জনগণ তাঁকে তাদের ভবিষ্যত নেতা ভাবতে থাকে। তাছাড়া সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা ও মহত মানবীয় গুণাবলির দিক থেকে জনগণ এমন সেরা মানুষ আর কখনো দেখেনি। আলাইহিস সলাতু ওয়াস্‌সালাম।

৬. অন্ধকারে নিমজ্জিত সমাজ

সেকালে মানব সমাজ ছিলো সকল দিক থেকে অন্ধকারে নিমজ্জিত। তারা ডুবে ছিলো অন্ধ ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের অতল গহ্বরে। তাদেরকে গ্রাস করে ফেলেছিল চরিত্রহীনতা ও নৈতিক অধ:পতন। গোত্রীয় ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামায় ছিলো তারা পর্যদুস্ত। কুসংস্কারের বলিতে তারা ছিলো ধ্বংসোন্মুখ। তাদের উপর ছায়া বিস্তার করে রেখেছিল অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্ব। অধিকাংশ মানুষ ছিলো দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। নারীরা ছিলো সম্পূর্ণ অসহায় ও মর্যাদাহীন। ভাস্কর্য পূজা তাদের নামিয়ে দিয়েছিল মানবতার সর্বনিম্নস্তরে।

এমতাবস্থায় মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে আসার প্রয়োজন ছিলো এক সাহায্যপ্রাপ্ত মহাবীর মুক্তিদূত। এতিম মুহাম্মদকেই মহান আল্লাহ্ গড়ে তুলছিলেন সেই মুক্তিদূত হিসেবে।

৭. নবুয়্যত লাভ

এদিকে তাঁর বয়েস যখন চল্লিশের কাছাকাছি তখন তিনি নির্জনতা অবলম্বন করতে থাকলেন। ক্রমান্বয়ে নির্জনতা তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে থাকলো। কাবা থেকে মাইল তিনেক পূর্বদিকের একটি পাহাড়। এর বর্তমান নাম 'জাবালুন নূর' বা জ্যোতির পাহাড়। এ পাহাড়ের চূড়ায় রয়েছে পশ্চিমমুখী বা কা'বামুখী একটি গুহা। গুহাটির নাম হেরা।

জাবালুন নূরের চূড়ায় অবস্থিত হেরা গুহায় গিয়ে মুহাম্মদ নীরবে নির্জনে ধ্যান করতে থাকেন। অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মানব সমাজের মুক্তির জন্যে তিনি এক আল্লাহর করুণামুখী হন। তিনি এক আল্লাহকে ধ্যান করতে থাকেন। তাঁর মহিমা ও সৃষ্টিকে নিয়ে ভাবতে থাকেন। তাঁর সমস্ত মন-মস্তিষ্কে এক আল্লাহর ধ্যান এবং ভাবনা গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

এভাবে তাঁর বয়েস যখন চল্লিশ বছর ছয়মাস, তখন রমযান মাসের এক শুভরাত্রে তাঁর কাছে আগমন করেন আল্লাহর দূত জিবরিল আমিন। তখনো তিনি হেরা গুহায় ধ্যানরত। জিবরিল এসে তাঁকে বললেন: 'পড়ুন'। তিনি বললেন: 'আমি পড়তে জানিনা (আমি নিরক্ষর)।'

জিবরিল তিনবার বললেন: 'পড়ুন'। জবাবে তিনবারই তিনি বলেছেন: আমি পড়তে জানিনা। এবার জিবরিল প্রচণ্ড জোরে তাঁকে নিজের বুকে আলিঙ্গন করেন। তারপর ছেড়ে দিয়ে বলেন: 'পড়ুন'। জ্ঞানের আলোকে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠলো তাঁর হৃদয়। সাথে সাথে তিনি পড়তে শুরু করলেন:

"ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযি খালাক। খালাকাল ইনসানা মিন আলাক। ইক্রা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম। আল্লাযি আল্লামা বিল কালাম। আল্লামাল ইনসানা মা লাম ঈ'লাম।"

অর্থ: "পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে শক্তভাবে আটকে থাকা শিশু থেকে। পড়ো, আর তোমার প্রভু বড়ই দয়াবান, মহিমা মণ্ডিত। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতোনা।"

এ অংশটি পরবর্তীতে রসূল সা. আল কুরআনের সূরা ৯৬-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত হিসেবে সংকলন করেন।

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর প্রতি এটাই ছিলো কুরআন নাযিলের সূচনা। এটাই ছিলো তাঁর নবুয়্যতি জীবনের সূচনা। আর এটা ছিলো ৬১০ খৃষ্টাব্দ। ফেব্রুয়ারি মাস।

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. কোনো অভিনব নবী ছিলেন না। তাঁর পূর্বেও বিগত হয়েছেন বহু নবী-রসূল। ইতোপূর্বে আমরা চব্বিশজন নবী রসূলের জীবনী আলোচনা করে এসেছি।

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. নবুয়্যতি মালার সর্বশেষ কড়ি। তাঁর প্রতি অবতীর্ণ আল কুরআন সর্বশেষ আসমানি কিতাব। তাঁর রিসালাত এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ আল কুরআন চিরন্তন এবং সার্বজনীন।

৮. আল্লাহর দিকে আহ্বানের গুরু দায়িত্ব

নবুয়্যত ও রিসালাত হলো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এক মহান দায়িত্ব। এ হলো, মানব সমাজের কাছে মহান আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব। এ হলো মানব সমাজকে এক অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান আল্লাহর দিকে আহ্বানের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব মানবতার মুক্তির দায়িত্ব।

তাই, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. মানব সমাজের জন্যে মহান আল্লাহর নিযুক্ত :

১. বার্তাবাহক (রসূল)।
২. আল্লাহর দিকে আহ্বায়ক (দা'য়ী ইলাল্লাহ)।
৩. সুসংবাদদাতা (বাশীর)।
৪. সতর্ককারী (নাযীর)।
৫. সত্যের সাক্ষী (শাহেদ)।
৬. সর্বোত্তম আদর্শ (উস্ওয়াতুন হাসানা) এবং
৭. মহাসত্যের অনাবিল আলো বিতরণকারী এক সমুজ্জ্বল প্রদীপ (সিরাজাম মুনিরা)।

এ দায়িত্বগুলো তাঁর প্রতি অর্পিত হয়েছে স্বয়ং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে।

এ গুরু দায়িত্ব পালন করার জন্যে তিনি পাহাড়ের চূড়া থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মানব সমাজে। গুহায় বসে ধ্যান করার দিন শেষ। মানবতার মুক্তির যে মহান উদ্দেশ্যে তিনি ধ্যানে মগ্ন হয়েছিলেন, সেই মহান উদ্দেশ্য হাসিলের সঠিক দিশা

এবং নির্দেশিকা এবার তিনি পেয়ে গেছেন। তাই এবার মানব সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে মুক্তির লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মানুষের সমাজে।

তাঁকে প্রদত্ত দায়িত্বসমূহ সম্পর্কে স্বয়ং মহান আল্লাহ বলেন:

- হে মুহাম্মদ! বলো: হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর বার্তাবাহক। (আল কুরআন ৭: ১৫৮)
- গোটা মানব জাতির জন্যে আমরা তোমাকে বার্তাবাহক নিযুক্ত করেছি। (আল কুরআন ৪: ৭৯)
- যাতে করে রসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হয়। (আল কুরআন ২:১৪৩, ২২:৭৮)
- হে নবী! আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী হিসেবে আর আলো বিতরণকারী সমুজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে। (আল কুরআন ৩৩: ৪৫-৪৬)

এসব দায়িত্ব পালনে তিনি নিজেকে এতোটাই নিবেদিত করেছিলেন যে তিনি নিজের জীবনের প্রতিও অনেকটা বেপরোয়া বা বেখেয়াল হয়ে উঠেন। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ তাঁকে এভাবে সতর্ক করেন:

"তারা এ বাণীর প্রতি ঈমান আনেনা বলে সম্ভবত দুঃখে শোকে আর হতাশায় তুমি নিজেকেই বিনাশ করে ছাড়বে।" (আল কুরআন: ১৮: ০৬)

৯. মানব সমাজকে মুক্তি ও সাফল্যের দিকে আহ্বান

মহান আল্লাহ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহকে রিসালাতের দয়িত্বে নিযুক্ত করার পর তিনি মানুষকে যেসব বিষয়ের প্রতি আহ্বান করেন এবং যেসব বার্তা তাদেরকে পৌঁছান, সংক্ষেপে তাহলো:

১. মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টা আছেন, তিনিই আল্লাহ। মহাবিশ্ব, পৃথিবী, মানুষ এবং সবকিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি সবার প্রভু। তিনিই মহাজগত মহাবিশ্বের প্রতিপালক, পরিচালক ও শাসক।

২. তিনি এক ও একক। তিনি সন্তান গ্রহণ করেননা। তিনিও কারো সন্তান নন। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। কোনো বিষয়েই তাঁর কোনো শরিক বা অংশীদার নেই। কোনো বিষয়েই তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। কোনো বিষয়েই কারো কাছ থেকে তাঁর কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বোচ্চ, সকল ক্রটি থেকে পবিত্র। সবাই ও সব কিছুই তাঁর সৃষ্টি এবং তাঁর দয়া, অনুগ্রহ ও সাহায্যের মুখাপেক্ষী।

৩. তিনি মানুষ সৃষ্টি করে তাকে একটি সময়ের জন্যে এই পৃথিবী পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। শুধুমাত্র তাঁর হুকুম ও বিধান মতো জীবন যাপন করার জন্যেই তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর বার্তাবাহক

হিসেবে নবী রসূল পাঠিয়েছেন। মানুষের জন্যে জীবন যাপনের নির্দেশিকা সম্বলিত কিতাব পাঠিয়েছেন এবং পৃথিবীকে তাঁর বিধান মতো পরিচালনা করার জন্যে মানুষেরই উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

৪. তিনি বিবেক বুদ্ধি দিয়ে মানুষকে জ্ঞানী ও যুক্তিবাদী বানিয়েছেন। মানুষের মধ্যে পাশবিক প্রবৃত্তি এবং নৈতিক প্রবৃত্তি অন্তর্গত করে দিয়েছেন। পাশবিক প্রবৃত্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করে বিবেক বুদ্ধি তথা নৈতিক শক্তিকে বিকশিত করতে বলেছেন। তাকে আল্লাহর বিধান ও নৈতিক শক্তিতে বলিয়ান হয়ে পার্থিব জীবন পরিচালনা করতে বলেছেন।

৫. পার্থিব জীবনের কার্যক্রমের জন্যে মানুষের বিচার হবে। আল্লাহর বিধান এবং মহত মানবীয় নৈতিক গুণাবলির ভিত্তিতে সে তার সামগ্রিক জীবন পরিচালনা করেছে কিনা, সেটাই হবে বিচারের বিষয়। এ উদ্দেশ্যে মানুষকে পুনরুত্থিত করা হবে। বিচারে সাফল্য অর্জনকারী লোকদের তিনি অনন্তকালের জন্যে মহাপুরস্কারে ভূষিত করবেন। অপরদিকে বিচারে যারা অপরাধী সাব্যস্ত হবে তাদেরকে নিমজ্জিত করা হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মধ্যে।

৬. হে মানুষ! মহান আল্লাহ্ আমাকে তাঁর বার্তাবাহক নিযুক্ত করেছেন। তোমরা আমাকে আল্লাহর রসূল (বার্তাবাহক) মেনে নাও। আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের কোনো কিছুই বলছিনা। আমি তোমাদের কাছে কেবল আল্লাহর বার্তা ও নির্দেশাবলিই পৌঁছে দিচ্ছি।

৭. হে মানুষ! তোমরা আল্লাহকে এক, অদ্বিতীয় ও সর্বশক্তিমান মেনে নাও। তোমরা কেবল তাঁরই হুকুম পালন করো। তাঁর সাথে কাউকেও এবং কোনো কিছুকেই শরিক করোনা। তোমরা তোমাদের মহত মানবীয় ও নৈতিক গুণাবলিকে উন্নত ও বিকশিত করে সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা অর্জন করো। তোমরা আল্লাহকে সর্বাধিক ভালোবাসো। সারাজীবন সমস্ত কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে করো। আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করো। পরকালীন সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করো। সর্বপ্রকার অন্যায়, অপরাধ, পাপ, পংকিলতা ও যুলুম অবিচার পরিহার করো। এটাই তোমাদের মুক্তি ও সাফল্যের একমাত্র পথ।

১০. মক্কায় তের বছর দাওয়াত ও আহ্বান

উপরে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলো, সেগুলোই ছিলো মুহম্মদ রসূলুল্লাহ্র দাওয়াত ও আহ্বানের মূল বক্তব্য।

মক্কায় তের বছর তিনি মানুষকে এই মূল বিষয়গুলোর দিকেই আহ্বান করেন। সর্বোত্তম পন্থা আর মর্মস্পর্শী উপদেশের মাধ্যমে তিনি মানুষকে আহ্বান করেন। তাঁর আহ্বানের উপকরণ ছিলো আল কুরআন। এই তের বছর তাঁর কাছে কুরআন নাযিল হয়েছে ঐ বিষয়গুলোকে চমৎকার যুক্তি, উপমা ও ঐতিহাসিক

দৃষ্টান্ত সহকারে বাস্তব ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে উপস্থাপনের মাধ্যমে। তিনি তাঁর দাওয়াত ও আহ্বান হিসেবে মানুষের কাছে হুবহু উপস্থাপন করেন আল্লাহর বার্তা আল কুরআন।

যারা তাঁর আহ্বান গ্রহণ করেন, তাদের তিনি জামায়াতবদ্ধ করেন। তাদের মাঝে কুরআনের আলো বিতরণ করেন। তাদেরকে আল কুরআন শিক্ষা দেন। তাদের মানবিক গুণাবলি বিকশিত ও উন্নত করেন। তাদের নৈতিক চরিত্র সংশোধন করেন। তাদের মাধ্যমে গঠন করেন একটি নতুন সমাজ। মূলত তাঁর দাওয়াত ও আহ্বানের ছিলো পাঁচটি স্তর। সেগুলো হলো:

১. মানুষের জীবন লক্ষ্যের পরিবর্তন।

২. মানুষের ধ্যান ধারণা, চিন্তা চেতনা ও দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন।

৩. মানুষের নৈতিক চরিত্রের পরিবর্তন।

৪. সমাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন

৫. নেতৃত্বের পরিবর্তন।

কুরআনের আলো বিতরণ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, দৃষ্টান্ত স্থাপন, এক আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য এবং সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের মাধ্যমে তিনি সমাজ ও সাথিদের মাঝে এসব পরিবর্তন সাধন করেন।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

"এমনি করে আমরা তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের মাঝে পাঠিয়েছি একজন রসূল। সে তোমাদের প্রতি তিলাওয়াত করে আমাদের আয়াত (অর্থাৎ বিতরণ করে কুরআনি জ্ঞানের আলো), তোমাদের জীবনকে করে উন্নত ও বিকশিত, তোমাদের শিক্ষা দেয় আল কিতাব (আল কুরআন) ও হিকমা, আরো শিক্ষা দেয় তোমরা যা কিছু জানতে না। (আল কুরআন ২:১৫১, ৩: ১৬৪, ৬২: ০২)

তিনি তাঁর দাওয়াত ও আহ্বানের আওতায় নিয়ে এসেছিলেন:

১. প্রতিভাবান যুব সমাজকে,

২. সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে,

৩. মজলুম ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষদেরকে,

৪. নারী সমাজকে এবং

৫. সত্য সন্ধানী ব্যক্তিদেরকে।

তিনি তাঁর এই দাওয়াত ও আহ্বানের কাজে সায়াহ্নের সেই মরুপথিকের মতোই মানুষের দ্বারে দ্বারে ছুটে বেড়িয়েছিলেন, যে পথিক সূর্যাস্তের পূর্বেই পেরেশান হয়ে পৌঁছুতে চায় মানব বসতিতে। তিনি দাওয়াত দিয়েছেন:

১. তাঁর বন্ধুদেরকে বন্ধুতার ভালোবাসায়,

২. দাওয়াত দিয়েছেন আত্মীয়স্বজনকে আত্মীয়তার হক আদায়ে,

৩. দাওয়াত দিয়েছেন ব্যক্তি পর্যায়ে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করে,

৪. দাওয়াত দিয়েছেন হাট-বাজারে জনসমষ্টিকে সম্বোধন করে,

৫. দাওয়াত দিয়েছেন মেলায় গিয়ে, পূজা পার্বনে গিয়ে,

৬. দাওয়াত দিয়েছেন হজ্জে আগত হাজীদেরকে,

৭. দাওয়াত দিয়েছেন মক্কায় আগত বণিক ও পর্যটকদেরকে।

১১ দাওয়াতের প্রতিক্রিয়া

সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের দিকে আহ্বানের প্রতিক্রিয়া আছে। সমস্ত নবী রসূল মানুষকে সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের দিকে আহ্বান করেছেন এবং তাঁদের আহ্বানের প্রতিক্রিয়া হয়েছে। একইভাবে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর দাওয়াতেরও প্রতিক্রিয়া হয়েছে। তাঁর দাওয়াতের প্রতিক্রিয়া ছিলো নিম্নরূপ:

১. সত্য সন্ধানী ব্যক্তিবর্গ, বিশেষভাবে যুবক যুবতীরা তাঁর দাওয়াতে সাড়া দেয়। তারা ঈমান এনে রসূলের সাথে কুরআনের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়।

২. কিছু লোক এই দাওয়াতকে সত্য বলে জেনেও অত্যাচার নির্যাতনের ভয়ে কিংবা স্বার্থহানির আশংকায় ঈমান আনা থেকে বিরত থাকে।

৩. সমাজের কর্ণধাররা, ধর্মীয় পুরোহিতরা এবং অর্থনৈতিক শোষকরা কোমর বেঁধে তাঁর বিরোধিতায় নেমে পড়ে।

৪. অধিকাংশ মানুষ নীরবে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকে।

৫. আর কিছু লোক বিভিন্নভাবে বিরুদ্ধবাদীদের শিকলে আঁটকা থাকায় গোপনে ঈমান আনে এবং ঈমান আনার বিষয়টি সময় সুযোগের অপেক্ষায় গোপন রাখে।

প্রতিক্রিয়া যদিও এই পাঁচটি ধারায় বিভক্ত ছিলো, তবু এর মূল ধারা ছিলো দুটি। অর্থাৎ

১. ঈমান এনে রসূলের সাথিত্ব গ্রহণকারী ধারা এবং

২. বিরুদ্ধবাদী ধারা।

এই তেরো বছরে তিন শতাধিক নারী পুরুষ প্রকাশ্য ঈমান এনে ইসলামি কাফেলায় শরিক হয়ে যান। এরা আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ইসলামের পথে সব ধরনের ত্যাগ ও কুরবানি দিচ্ছিলেন। এদের মধ্যে প্রথম দিকেই ঈমান আনেন খাদিজা তাহেরা, আবু বকর, আলী, যায়েদ বিন হারিসা, সায়ীদ বিন যায়েদ, ফাতিমা বিনতে খাত্তাব, যুবায়ের, সা'দ বিন আবি ওয়াককাস, উসমান বিন আফফান, আবদুর রহমান, জাফর বিন আবু তালিব, আবু সালামা, উম্মে সালামা, আবু উবায়দা, তালহা, উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান, উমর বিন খাত্তাব, আবু যর, হামযা বিন আবদুল মুত্তালিব, বিলাল বিন রিবাহ, মুসআব, আম্মার, ইয়াসার, সুমাইয়া, খাব্বাব, আরকাম, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ,

সুহায়েব রুমি, উসমান বিন মাযউন, উম্মে শুরাইক, রুকাইয়া বিনতু মুহাম্মদ, উম্মু কুলসুম বিনতু মুহাম্মদ, যয়নব বিনতু মুহাম্মদ, ফাতিমা বিনতু মুহাম্মদ, নঈম বিন আবদুল্লাহ, লুবাইনা, উম্মে আবদুল্লাহ বিনতু হাশমা, তার স্বামী আমের বিন রবিয়া, তোফায়েল দাওসি এবং আরো অনেকে রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

অপরদিকে মানুষকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বানের এই মহোত্তম কাজের বিরোধিতায় অগ্রণি ভূমিকা পালন করে স্বয়ং রসূল সা.-এর চাচা আবু লাহাব, তার স্ত্রী উম্মে জামিল, আবু জাহেল, হাকাম বিন আস, উকবার বিন আবু মুয়ীত, উতবা, শাইবা, আবুল বুখতরি, আস্ বিন হিশাম, উমাইয়া বিন খাল্ফ, মুনাব্বিহ, হিন্দা, আবু সুফিয়ান, সুহায়েল, আমর বিন আস্, আকরামা, খালিদ বিন অলিদ এবং আরো অনেকে। অবশ্য এদের মধ্যে কয়েকজন পরবর্তীতে ইসলাম কবুল করে আল্লাহর সৈনিক হয়ে যান। তবে তাদের অনেকেই বদর যুদ্ধে নিহত হয়।

সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে সাহসী দৃঢ় প্রতীজ্ঞ যুবকরাই বেশিরভাগ ইসলাম গ্রহণ করেন। অবশ্য নেতৃস্থানীয় অধিকাংশ ব্যক্তিই রসূল সা. ও তাঁর সত্যের দাওয়াতের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়। তারা ঈমানে দীক্ষিত তাদের যুবক ছেলে মেয়েদের, আত্মীয়-স্বজনদের এবং দাস-দাসীদের উপর চরম নির্যাতন চালাতে থাকে। এমতাবস্থায় রসূল সা.-এর নির্দেশে তাঁর আশির অধিক সাহাবী নবুয়্যতের পঞ্চম বর্ষে পার্শ্ববর্তী দেশ আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন।

১২. বন্দী জীবন

কিন্তু রসূল সা. এবং তাঁর সাথিরা ইসলামের পথ এবং দাওয়াত ও আহ্বানের কাজ ত্যাগ না করায় কাফির নেতারা আরো কঠোর সিদ্ধান্ত নেয়। তারা রসূল, তাঁর সাথিবৃন্দ এবং তাঁর গোত্র বনু হাশিমকে বয়কোট করে। ফলে তারা শি'বে আবু তালিব নামক পার্বত্য উপত্যকায় অন্তরীণ হয়ে পড়েন।

এখানে চরম দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে তাঁদের দিন কাটতে থাকে। চরম খাদ্যাভাবে তারা গাছের পাতা এবং গাছের ছাল আহার করেন। তাঁরা ক্ষুধা এবং রোগক্লিষ্ট হয়ে পড়েন। নবুয়্যতের সপ্তম বর্ষ থেকে দশম বর্ষের সূচনা পর্যন্ত তিন বছর তাঁরা এখানে বন্দী থাকেন। অতপর পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হয়ে বিরোধী নেতারা রসূল সা. ও তাঁর সাথিদেরকে বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করে দেয়।

এই তিন বছরের নিপীড়নের ফলে এ বছরই অর্থাৎ নবুয়্যতের দশম বর্ষেই ইহকাল ত্যাগ করেন রসূল সা.-এর অভিভাবক চাচা আবু তালিব এবং প্রেরণাদায়িনী স্ত্রী খাদিজা তাহেরা। এখন থেকে রসূল সা. নিরংকুশভাবে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হয়ে যান।

১৩. তায়েফে দাওয়াত

মক্কার পরেই তায়েফ ছিলো অধিকতর প্রভাবশালী শহর। মক্কার লোকদের আর ঈমান আনার লক্ষণ ক্ষীণ দেখে রসূল সা. তায়েফের সরদারদের কাছে মহাসত্যের দাওয়াত পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে তায়েফ যান। তাদের দাওয়াত দেন আল্লাহর দিকে।

মক্কার নেতারা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ না করায় এবং বিরোধিতা করায় তারাও তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। শুধু তাই নয়, তারা আল্লাহর রসূলকে লাঞ্ছিত করার জন্যে তাঁর পেছনে বখাটে যুবকদের লেলিয়ে দেয়। তারা রসূল সা.-কে চরমভাবে নির্যাতিত করে, লাঞ্ছিত করে। তাঁর সাথে গিয়েছিলেন তাঁর সেবক যায়েদ। অতপর তিনি যায়েদকে নিয়ে ফিরে আসেন মক্কায়।

১৪. মে'রাজ

চরম নির্যাতনের ফলে এযাবত রসূল সা.-এর একজন মহিলা সাহাবীসহ দুইতিন জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেছেন। অনেকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছেন। রসূল সা. তায়েফের দিক থেকেও নিরাশ হয়েছেন। কিন্তু তাঁকে তো নিজের রসূল নিযুক্ত করেছেন স্বয়ং মহাবিশ্বের মালিক মহান আল্লাহ পাক। তিনি তাঁর রসূলগণকে এবং রসূলদের সাথিদেরকে সব সময়ই বিরোধিতা, অত্যাচার নির্যাতন এবং প্রত্যাখ্যানের মুখোমুখি করে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হিসেবে গড়ে তুলেছেন। তাইতো আল্লাহ পাক মুহাম্মদ সা.-কেও বলে দিয়েছেন:

"তোমার পূর্বেও বহু রসূলকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কিন্তু প্রত্যাখ্যানের মোকাবেলায় তারা অটল থেকেছে।" (সূরা ৬: আয়াত ৩৪)

এ সময় আল্লাহ পাক তাঁর রসূলকে সামনে যে ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্র উপহার দিতে যাচ্ছিলেন তার মূলনীতিগুলো জানিয়ে দিতে চাইছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁকে মে'রাজ (ঊর্ধ্বগমন) করান। দশম নবুয়্যত বর্ষে মে'রাজ সংঘটিত হয়।

আল্লাহ পাক তাঁর রসূলকে ঊর্ধ্বজগতে নিয়ে ইসলামি সমাজের মূলনীতি প্রদান করেন। এসময় আল্লাহ তায়ালা তাঁর উম্মতের জন্যে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতও ফরয করে দেন। তাছাড়া আল্লাহ পাক তাঁর রসূলকে নির্দেশ দেন তাঁর কাছে রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রার্থনা করতে। মে'রাজ উপলক্ষে নাযিল হয়েছে সূরা ১৭ বনি ইসরাঈল। তখনকার প্রাসংগিক উপদেশ ও মূলনীতিগুলো মওজুদ রয়েছে এই সূরা বনি ইসরাঈলে।

১৫. মদিনায় ইসলামের আলো

মক্কায় রসূল সা.-এর নবুয়্যতি জীবনের তেরো বছরের শেষ পর্যায়। নবুয়্যত বর্ষ বারো।

হজ্জ উপলক্ষে মদিনা থেকে আগত ১২ জন ব্যক্তি গোপনে রসূল সা.-এর সাথে সাক্ষাত করেন। তারা ঈমান আনার ঘোষণা দেন এবং মদিনায় ইসলাম প্রচারের

দায়িত্ব নিয়ে ফিরে যান। রসূল সা. সাহাবী মুসআব রা. কে মদিনার লোকদের ইসলাম শিক্ষা দান এবং সেখানে ইসলামের দাওয়াতি কাজ প্রসারের উদ্দেশ্যে তাদের সাথে মদিনায় পাঠিয়ে দেন।

ফলে পরের বছর হজ্জ উপলক্ষে পঁচাত্তর ব্যক্তি এসে গোপনে আকাবা নামক স্থানে রসূল সা.-এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন। তারা রসূল সা.কে মদিনায় হিজরত করার দাওয়াত দিয়ে যান। মদিনা আক্রান্ত হলে জান-মাল দিয়ে তা প্রতিরোধ করারও শপথ নিয়ে যান।

১৬. হিজরতের প্রস্তুতি

সাহাবীগণের উপর অত্যাচার নির্যাতনের মাত্রা চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল। রসূল সা. মনে মনে মদিনায় হিজরত করার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। সে হিসেবে সাহাবীদেরকে যার যেভাবে সম্ভব গোপনে হিজরত করে মদিনায় চলে যাবার অনুমতি দেন। ফলে যাদেরই হিজরত করার সামর্থ ছিলো, তারা হিজরত করে মদিনায় চলে যান। থেকে যান আবু বকর। রসূল সা. তাঁকে নিজের হিজরতের সাথি বানানোর কথা জানিয়ে দেন।

১৭. হত্যার ষড়যন্ত্র

নবুয়্যতের তেরো বছর মাত্র পূর্ণ হয়েছে। অধিকাংশ সাহাবী হিজরত করে মক্কা ছেড়েছেন। এসময় ইসলামের শত্রুরা আল্লাহর রসূলকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এক রাত্রে এসে তারা তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে ফেলে। সকালে বের হলেই তাঁকে হত্যা করা হবে। তাদের এ ষড়যন্ত্রের কথা পরবর্তীতে কুরআনে উল্লেখ হয়েছে এভাবে:

"স্মরণ করো, কাফিররা তোমাকে বন্দী করার, কিংবা হত্যা করার, অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করার ষড়যন্ত্র করছিল। তারা লিপ্ত ছিলো তাদের চক্রান্তে। এদিকে আল্লাহও তাঁর পরিকল্পনা পাকা করে রাখেন। আল্লাহই সবচে দক্ষ পরিকল্পনাকারী।" (সূরা ৮ আনফাল: আয়াত ৩০)

মহান আল্লাহ তাদের চক্রান্তের খবর আগেই তাঁর রসূলকে জানিয়ে দেন। তিনি তাদের চোখে ধূলো দিয়ে বেরিয়ে পড়েন হিজরতের উদ্দেশ্যে। ব্যর্থ হয়ে যায় আল্লাহর রসূলকে হত্যার ষড়যন্ত্র।

১৮. রসূলুল্লাহর হিজরত

রসূলুল্লাহ সা. হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে প্রিয় সাথি আবু বকরের বাড়িতে আসেন। আবু বকরও আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন।

এবার দু'জনে বেরিয়ে পড়েন মদিনার উদ্দেশ্যে। শত্রুদের ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় কৌশল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মক্কা থেকে মদিনা উত্তর দিকে হলেও তাঁরা

প্রথমে রওয়ানা করেন দক্ষিণ দিকে। কয়েক মাইল দক্ষিণের সওর নামক পাহাড়ের গুহায় তিনদিন অবস্থান করেন। তিন দিন পর সেখান থেকে মদিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। এদিকে তাঁর রক্ত পিপাসুরা হন্যে হয়ে খুঁজেও তাঁর নাগাল পায়নি। তারা তাঁকে, ধরার জন্যে শত উট পুরস্কার ঘোষণা করে।

১৯. মদিনায় মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.

রসূলুল্লাহ সা. আসছেন এ খবর আগেই পৌঁছে গেছে মদিনায়। আনন্দে মাতোয়ারা মদিনা। সম্বর্ধনার বিরাট আয়োজন। মদিনার আবাল বৃদ্ধ জনতা সানিয়াতুল বিদা উপত্যকা পর্যন্ত এগিয়ে এসে তাঁকে সম্বর্ধনা জানায়।

মক্কা তাঁকে ত্যাগ করে। মদিনা তাঁকে বরণ করে নেয়। তিনিও বরণ করে নেন মদিনাকে। মক্কা বিজয়ের পরও তিনি ত্যাগ করেননি মদিনা।

২০. মদিনায় ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা নির্মাণের কাজ শুরু

মদিনার পূর্ব নাম ছিলো ইয়াসরিব। রসূলুল্লাহর আগমনের ফলে পাল্টে যায় ইয়াসরিবের নাম। তখন থেকে এ শহরের নাম হয়ে যায় মদিনাতুন্নবী বা নবীর শহর। সংক্ষেপে 'মদিনা'।

মদিনায় আগমনের পরপরই তিনি এখানে ইসলামি সমাজ নির্মাণের কাজ শুরু করে দেন। শুরুর দিকে তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেন। যেমন:

১. প্রথমে চৌদ্দ দিন কুবা নামক স্থানে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

২. তারপর আসেন মূল অবস্থানের জায়গায়। এখানে জমি ক্রয় করেন। কেন্দ্রীয় মসজিদ 'মসজিদে নববী' প্রতিষ্ঠা করেন।

৩. এই মসজিদকে ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্রের কেন্দ্র ঘোষণা করেন। এখান থেকেই তিনি পরিচালনা করেন ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্র।

৪. হিজরত করে আসা সহায় সম্বলহীন মুহাজির মুসলিম এবং মদিনার স্থানীয় আনসার মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। ফলে মুহাজিররা আনসারদের পরিবারের সদস্য হয়ে যান।

৫. 'মদিনা সনদ' নামক খ্যাত মদিনার প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করে নেন মদিনার স্থানীয় আনসার মুসলিমদেরকে, মুহাজির মুসলিমদেরকে, মদিনায় অবস্থানরত বিভিন্ন গোত্র ও কবিলাকে এবং সেখানকার ইহুদি গোত্রগুলোকে। এদের সবাইকে একটি ভৌগলিক জাতি ঘোষণা করেন। শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যাপারে সবাই মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর নেতৃত্বে চুক্তিবদ্ধ হয়।

২১. ইসলামি কল্যাণ রাষ্ট্রের কার্যক্রম

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. মহান ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে মদিনায় একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন করেন। এ রাষ্ট্রের আদর্শকে ভবিষ্যতের বিশ্ব ব্যবস্থায় রূপদানের কার্যক্রম তিনি হাতে নেন। এ মহান রাষ্ট্রের কয়েকটি প্রধান প্রধান মূলনীতি ও কার্যক্রম হলো:

১. তিনি এ রাষ্ট্র পরিচালনা করেন এক আল্লাহর সার্বভৌম বিধানের ভিত্তিতে।

২. এ রাষ্ট্রের আদর্শ, প্রেরণা ও আইনের উৎস ছিলো আল্লাহর কিতাব আল কুরআন এবং তাঁর রসূলের সুন্নাহ।

৩. এ রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য ছিলো জনগণের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তি, কল্যাণ ও সাফল্য।

৪. এ রাষ্ট্রের সরকার ও নাগরিকদের প্রধান দায়িত্ব ছিলো স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য পালন এবং সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য পালন।

৫. এ রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মসূচি ও কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি ছিলো জননিরাপত্তা, সুবিচার ও মানবকল্যাণ।

৬. এ রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান কর্মসূচি ছিলো: ১. রাষ্ট্র ও জনগণের নিরাপত্তা বিধান। ২. এক আল্লাহর ইবাদত প্রবর্তন ও সালাত কায়েম। ৩. শোষণমুক্ত ইনসাফ ভিত্তিক কল্যাণমুখী অর্থব্যবস্থার প্রচলন ও যাকাত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। ৪. পরামর্শ ভিত্তিক শাসন পরিচালনা। ৫. সততা, সুনীতি, সৎকর্ম ও সদাচারের সম্প্রসারণ। ৬. দুর্নীতি ও দুষ্কর্মের অপসারণ। ৭. ভালো কাজে প্রেরণা ও সহযোগিতা প্রদান। ৮. মন্দ কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি। ৯. জনগণের মানসিক ও নৈতিক উন্নয়নের জন্যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপক সম্প্রসারণ। ১০. জনস্বাস্থ্যের নিরাপত্তা বিধান ও গণপূর্ত।

৭. বিশ্বব্যাপী মানবসমাজকে শান্তি ও কল্যাণের দিকে আহ্বান।

২২. কুরাইশদের আশংকা ও যুদ্ধের প্রস্তুতি

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. হিজরত করে মদিনায় চলে আসার কারণে কুরাইশরা নিজেদেরকে বড় ধরনের বিপদের ঝুঁকির মধ্যে অনুভব করছিল। তারা চিন্তা-ভাবনা করে দেখলো:

১. মদিনায় থেকে মুহাম্মদ স্বাধীনভাবে তার ধর্মীয় মতাদর্শ প্রচার করার সুযোগ পেয়ে গেলো।

২. মুহাম্মদ গোটা আরবে তার ধর্ম ছড়িয়ে দেবে এবং সব গোত্র ও কবিলার উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করবে।

৩. মুহাম্মদ রাষ্ট্রীয় শক্তি অর্জন করবে।

৪. তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

৫. সুযোগ মতো মুহাম্মদ মক্কা আক্রমণ করে আমাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে এবং আমাদেরকে মক্কা থেকে উৎখাত করবে।

এসব ভেবে কুরাইশরা রসূল সা.-এর ভিত মজবুত হবার আগেই মদিনা আক্রমণ করে তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে।

২৩. রসূলের বিরুদ্ধে কুরাইশদের যুদ্ধ

এদিকে কুরাইশদের পক্ষ থেকে মদিনা আক্রমণ হতে পারে, একথা রসূল সা. নিজেও চিন্তা করে রেখেছেন।

বদর যুদ্ধ: কুরাইশরা আবু জাহেলের নেতৃত্বে এক হাজার সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে। তাদের কাছে ছিলো ঘোড়া এবং আধুনিক সব সমরাস্ত্র। রসূল সা. তাদের প্রতিহত করার জন্যে তিনশো তের জনের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে রওয়ানা করেন। বাহিনীর কাছে অশ্ব এবং আধুনিক অস্ত্র বলতে তেমন কিছুই ছিলনা।

দ্বিতীয় হিজরির ১২ বা ১৭ রমযান বদর প্রান্তরে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ ছিলো এক ঐতিহাসিক আদর্শিক যুদ্ধ:

১. এক পক্ষ যুদ্ধ করতে এসেছিল আল্লাহর জন্যে, আল্লাহর পথে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের লক্ষ্যে। অপর পক্ষ যুদ্ধ করতে এসেছিল তাগুতের পক্ষে, মিথ্যা বাতিলকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে এবং নিজেদের অবৈধ স্বার্থ হাসিলের পথ নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে।

২. এক পক্ষ নির্ভর করেছিল আল্লাহর সাহায্যের উপর। অপর পক্ষ নির্ভর করেছিল নিজেদের সমর শক্তির উপর।

৩. এক পক্ষ যুদ্ধ করতে এসেছিল জীবন দিয়ে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করার জন্যে। অপর পক্ষ যুদ্ধ করতে এসেছিল নিজেদের জীবন রক্ষা করার জন্যে।

৪. এক পক্ষের যুদ্ধ ছিলো প্রতিরক্ষামূলক। অপর পক্ষের যুদ্ধ ছিলো আগ্রাসী।

৫. এক পক্ষের যুদ্ধ ছিলো ব্যক্তিগত ও পার্থিব স্বার্থের উর্ধ্বে। অপর পক্ষের যুদ্ধ ছিলো ব্যক্তিগত পার্থিব স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে।

অবশেষে এ যুদ্ধে ইসলামি বাহিনী জয়ী হয়। আগ্রাসী কুরাইশ বাহিনী চরমভাবে পরাজিত হয়। এ যুদ্ধে আগ্রাসী কুরাইশদের সেনাপতি আবু জাহেলসহ ৭০ জন নিহত হয় এবং আরো ৭০ জন মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়। এদিকে ২২ জন মুসলিম সেনা শাহাদাত বরণ করেন। পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে কুরাইশরা মক্কায় ফিরে যায়।

উহুদ যুদ্ধ: কুরাইশরা বদর যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে পরের বছর তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে আবার মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে। এবার তারা তাদের প্রভাবিত পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকদের সাথে নেয়। তারা তিন হাজার সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে।

রসূল সা. যথাসময়ে তাদের যাত্রার সংবাদ পেয়ে যান। যুবকদের আগ্রহের কারণে তিনি মদিনার বাইরে উহুদ পাহাড়ের কাছে গিয়ে শত্রু বাহিনীর মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত নেন। সাতশো জানবাজ সাহাবীর বাহিনী নিয়ে তিনি উহুদে এসে পৌঁছান।

উহুদ পাহাড়কে পেছনে রেখে রসূল সা. যুদ্ধ লড়ার স্থান নির্ধারণ করেন। পেছনের আইনান পাহাড়ে একটা সুড়ঙ্গ ছিলো। শত্রু বাহিনী এ সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকে তাঁদেরকে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করতে পারে এ আশংকায় রসূল সা. সুড়ঙ্গ মুখে পঞ্চাশজন তীরন্দাজের একটি বাহিনী নিযুক্ত করেন। তাদের নির্দেশ দেন, যুদ্ধে আমাদের জয়-পরাজয় যাই হোক না কেন, তোমরা কোনো অবস্থাতেই এ স্থান ত্যাগ করবেনা।

যুদ্ধ শুরু হলো। মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের তীব্রতায় টিকতে না পেরে কুরাইশ বাহিনী তাদের সাজ সরঞ্জাম ফেলে পালাতে শুরু করলো। মুসলিম বাহিনী তাদের চরম তাড়া করে।

এদিকে সুড়ঙ্গ মুখে নিয়োজিত তীরন্দাজ বাহিনীর লোকেরা ভাবলো, যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী জয়ী হয়েছে। ফলে তারা তাদের সেনাপতি আবদুল্লাহর নির্দেশ উপেক্ষা করে মূল বাহিনীর সাথে যোগদানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে। আবদুল্লাহ রা. মাত্র বারো জন তীরন্দাজ নিয়ে নিজের অবস্থানে অটল থাকেন।

এদিকে শত্রুপক্ষের অশ্বারোহী দলের প্রধান খালিদ বিন অলিদ সুড়ঙ্গ পথ অরক্ষিত পেয়ে তার বাহিনী নিয়ে এখান দিয়ে ঢুকে পড়েন। আবদুল্লাহ এবং তার স্বল্প সংখ্যক সাথিরা তাদেরকে প্রতিহত করার জন্যে প্রাণপণ লড়াই করে শাহাদাত বরণ করেন।

খালিদ তার অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে মুসলিম বাহিনীর পেছন দিক থেকে আক্রমণ শুরু করে। মুসলিম বাহিনী এদেরকে প্রতিহত করার জন্যে পেছনমুখী হলে পলায়নপর শত্রুবাহিনী ঘুরে দাঁড়ায়। শুরু হয় দ্বিমুখী আক্রমণ। ফলে মুসলিম বাহিনী হতভম্ব হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

পরে রসূল সা. সবাইকে একত্রিত করেন এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে শত্রুপক্ষকে তাড়া করেন এবং তারা মক্কায় ফিরে যায়।

এরই মধ্যে মুসলিম বাহিনীর বিরাট ক্ষতি হয়ে যায়। ৭০ জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। আহত হন অনেকে। কয়েকজন সৈনিক কর্তৃক সেনাপতির নির্দেশ লঙ্ঘনের ফলে মুসলিম বাহিনীর উপর নেমে আসে এই বিরাট বিপর্যয়।

খন্দকের যুদ্ধ : পঞ্চম হিজরি সন। উহুদ যুদ্ধে মুসলিমরা বিজয়ী হতে না পারলেও কুরাইশরা ভালোভাবেই বুঝেছিল, তারাও বিজয়ী হতে পারেনি। ইসলামি রাষ্ট্র পূর্বের অবস্থায়ই সদর্পে দাঁড়িয়েছিল। তাই তারা বিশাল প্রস্তুতি নেয়। আশেপাশের সব মিত্র গোত্রের যোদ্ধাদের সাথে নিয়ে তারা অগ্রসর হয় মদিনার দিকে।

এদিকে রসূল সা. যথাসময়ে তাদের যাত্রার সংবাদ পেয়ে যান। এবার তিনি এক অভিনব কৌশল গ্রহণ করেন। তাহলো, মদিনায় প্রবেশের গোটা এলাকা জুড়ে তিনি পরিখা খননের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি নিজে এবং সক্ষম সাহাবীরা সকলেই পরিখা খননের কাজে অংশ নেন। দশ গজ চওড়া, পাঁচ গজ গভীর সাড়ে তিন মাইল দীর্ঘ পরিখা তাঁরা খনন করে ফেলেন। এতে প্রায় তিন লাখ আট হাজার বর্গগজ মাটি খনন ও স্থানান্তর করতে হয়েছে। সাড়ে তিন হাজার জনবল নিয়ে রসূল সা. মাত্র পনেরো দিনে এ বিশাল যুদ্ধ কৌশল বাস্তবায়ন করেন। এতেই বুঝা যায় তাঁরা কতোটা পরিশ্রম করেছেন! মাথা প্রতি প্রায় একশত বর্গগজের চাইতে বেশি মাটি কাটতে ও স্থানান্তর করতে হয়েছে।

পরিখা খননের কাজ শেষ হতে না হতেই কমবেশি দশ হাজার সৈন্যের সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে কুরাইশরা মদিনার উপকণ্ঠে এসে হাজির হয়। কিন্তু অভিনব কৌশলের পরিখা দেখে তাদের মাথায় হাত। তবে মদিনার ঘরের শত্রু ইহুদিরা কুরাইশদের সাথে গোপনে হাত মিলিয়ে ফেলে। ফলে মুসলিমদের বাড়িঘরগুলো অরক্ষিত হয়ে পড়ে।

কিন্তু মহান আল্লাহর সাহায্যে কুরাইশ বাহিনী দীর্ঘ একমাস মদিনা অবরোধ করে রেখেও কোনো সুবিধা করতে পারেনি। এ সময় এক রাত্রে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়। ঝড় কুরাইশদের তাঁবুগুলো উড়িয়ে নিয়ে যায়। তাদের বাহিনী পুরোপুরি মনোবল হারিয়ে ফেলে এবং রাতের অন্ধকারেই তারা মদিনা অবরোধ ত্যাগ করে পালিয়ে চলে যায়।

এ ঘটনার পরপরই রসূল সা. মদিনা সনদ ভঙ্গকারী ইহুদি গোত্র বনু কুরাইযাকে চরমভাবে শায়েস্তা করেন।

মহান আল্লাহ এ যুদ্ধের পর্যালোচনা করেছেন সূরা ৩৩ আল আহযাবের ৯-২৭ আয়াতে। এ সূরার নবম আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন : "হে মুমিনরা স্মরণ করো তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের এখানে এসে পড়েছিল, তখন আমরা তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম ঝড়ো হাওয়া আর এমন এক বাহিনী, যাদের তোমরা দেখতে পাওনি।"

কুরাইশরা চলে যাবার পর রসূল সা. ঘোষণা দিলেন: "কুরাইশরা আর কখনো মদিনা আক্রমণ করতে পারবেনা।" এ এগুলো ছিলো বড় বড় যুদ্ধ। এ ছাড়া ছোটখাটো অভিযান পরিচালিত হয়েছে আরো অনেক।

২৪. হুদাইবিয়ার সন্ধি এবং এর সুফল

ষষ্ঠ হিজরি সন। রসূলুল্লাহ সা. স্বপ্নে হজ্জ, উমরা ও আল্লাহর ঘর যিয়ারত করার নির্দেশ পান। জেনে রাখা ভালো, নবীদের স্বপ্নও অহি। সে অনুযায়ী তিনি এবছর জিলকদ মাসের শেষের দিকে চৌদ্দ শত সাহাবীকে সাথে নিয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। সাথে করে নেন কুরবানির উট।

হজ্জ, উমরা ও আল্লাহর ঘর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আসা লোকদের বাধা দেয়া মক্কার সনাতন ধর্মেও নিষেধ ছিলো। কিন্তু কুরাইশরা রসূল সা.-এর কাফেলাকে মক্কার নিকটবর্তী হুদাইবিয়া নামক স্থানে এসে বাধা দেয়। তিনি উসমান রা.-কে মক্কায় পাঠান তাদের নেতাদেরকে একথা বলার জন্যে যে, আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি। যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে আসিনি। আমরা হজ্জ, উমরা, যিয়ারত ও কুরবানি সেরে চলে যাবো। আমরা কুরবানির পশু সাথে নিয়ে এসেছি।

কিন্তু তারা তাঁর কথা শুনেনি। তারা তাঁকে আটক করে রাখে। উমসানকে অর্থাৎ রসূলের দূতকে আটক করার খবর শুনে সাহাবীগণ উসমানকে উদ্ধার করার প্রতিজ্ঞা করেন। তারা এ উদ্দেশ্যে রসূল সা.-এর হাতে হাত রেখে বাইয়াত (শপথ) গ্রহণ করেন। এ শপথে সন্তুষ্ট হয়ে মহান আল্লাহ সাহাবীগণের প্রসঙ্গে বলেন : 'আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।" (সূরা ৪৮ আল ফাত্‌হ : ১৮)

অবশ্য পরে কুরাইশরা উসমান রা.-কে ছেড়ে দেয়। তিনি ফিরে আসেন। তারা সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আসে। রসূল সা. তাদের আরোপিত শর্তানুযায়ী সন্ধি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। সন্ধির অধিকাংশ শর্তই ছিলো মুসলিমদের জন্যে বাহ্যিকভাবে অপমানজনক। কিন্তু তাতে দশ বছর যুদ্ধ বিগ্রহ না করার একটি ধারা ছিলো।

সাহাবীগণ মনোক্ষুণ্ন হওয়া সত্ত্বেও রসূল সা. এই ধারাটিকে লুফে নিয়ে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তিতে এ বছর উমরা না করে পরের বছর এসে উমরা করার একটি শর্ত ছিলো। সে অনুযায়ী রসূল সা. কাফেলাকে নিয়ে ফিরে চললেন মদিনার দিকে। পথিমধ্যেই নাযিল হলো সূরা ৪৮ আল ফাত্‌হ। এ সূরার প্রথম আয়াতেই বলা হয়েছে: "(হে নবী!) আমরা তোমাকে এক সুস্পষ্ট বিজয় দিয়ে দিলাম।"

সত্যিই এ ছিলো এক সুস্পষ্ট বিজয়। রসূল সা. সাহাবীগণকে নিয়ে নির্বিঘ্নে ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণ করতে থাকলেন। দু' বছরের মধ্যেই কুরাইশরা নির্বীর্য ও বন্ধুহীন হয়ে পড়লো। খালিদ বিন অলিদ এবং আমর ইবনুল আস্‌সহ কুরাইশদের অনেক বড় বড় সেনাপতি এরই মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন।

২৫. মক্কা বিজয়

হুদাইবিয়ার সন্ধিতে কুরাইশরা যে অন্যায় শর্তাবলি দিয়ে চুক্তি সম্পাদিত করেছিল সেগুলো তাদের জন্যেই বুমেরাং হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সে চুক্তি তারা

নিজেরাই ভঙ্গ করে। অপরদিকে রসূল সা. নির্বিঘ্নে ইসলামের দাওয়াতি কাজ করতে থাকেন। ইসলামি জনবল বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। আরবের অধিকাংশ গোত্রই পর্যায়ক্রমে কুরাইশদের সাথে মিত্রতা ত্যাগ করে।

যাই হোক, চুক্তি ভঙ্গের কারণে রসূল সা. মক্কা অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন।

অষ্টম হিজরি সনের ১০ রমযান। রসূল সা. দশ হাজার জিন্দাদিল ইসলামি সেনাদল সাথে নিয়ে রওয়ানা করলেন মক্কা অভিমুখে। ২০ রমযান মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেন মক্কায়। আজ আর তাঁকে বাধা দেয়ার কোনো শক্তি কারো ছিলো না। সম্পূর্ণ বিনা বাধায় আল্লাহর প্রশংসা করতে করতে তিনি এবং তাঁর সাথিরা মক্কার হারাম শরিফে প্রবেশ করেন।

ভেঙ্গে ফেলেন আল্লাহর ঘরে রাখা ৩৬০টি ভাস্কর্য মূর্তি। তাঁকে চরম কষ্ট দিয়ে থাকলেও তিনি ক্ষমা করে দেন মক্কার লোকদের। তিনি তাদের বলেন: 'আজ আর তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। যাও, তোমরা মুক্ত।'

মক্কার আশেপাশের গোত্রগুলোতে রক্ষিত মূর্তিগুলোও নির্মূল করা হলো। মক্কা ভূমি থেকে উৎপাটিত করা হলো শিরকের শিকড়। ঘোষণা করা হলো আল্লাহর একত্ব, মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব।

আল্লাহর রসূল সা. কয়েকদিন মক্কায় অবস্থান করেন। এখান থেকে গিয়ে অভিযান চালিয়েই জয় করেন, হাওয়াযিন ও বনু সাকিফ। হোনায়েন প্রান্তরে যুদ্ধ হয় এদের সাথে। তারা চরমভাবে পরাজিত হয়। এ সময় তিনি তায়েফও অধিকার করেন। মক্কা বিজয় উপলক্ষে রসূল সা. উনিশ দিন মক্কায় অবস্থান করেন। হোনায়েন ও তায়েফ যুদ্ধের পর পুনরায় ফিরে আসেন মদিনায়।

২৬. ইসলামের ছায়াতলে জনতার ঢল

মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণের জন্যে জনতার স্রোত প্রবাহিত হতে শুরু করে মদিনার অভিমুখে। আরব উপদ্বীপের ছোট বড় সব গোত্র তাদের প্রতিনিধি দল পাঠাতে থাকে আল্লাহর রসূলের কাছে তাদের ইসলামের ছায়াতলে আগমনের সংবাদ জানাবার জন্যে। মক্কা বিজয়ের পরবর্তী বছর বড় ছোট শতাধিক প্রতিনিধিদল মদিনায় এসে তাদের এবং তাদের গোত্রের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়। ইসলামের ছায়াতলে এই জনস্রোতের আগমনের কথা মহান আল্লাহ কুরআন মজিদে উল্লেখ করেন। মহান আল্লাহ বলেন:

"যখন এসেছে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়, এবং তুমি দেখতে পাচ্ছো লোকেরা দলে দলে প্রবেশ করছে আল্লাহর দীনে, তখন তোমার প্রভুর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং ক্ষমা প্রার্থনা করো তাঁর কাছে, অবশ্যি তিনি পরম ক্ষমাশীল দয়াবান।" (সূরা ১১০ আন নাস্‌র)

২৭. তবুক যুদ্ধ

রসূলুল্লাহ সা. কর্তৃক সবচেয়ে বড় অভিযান ছিলো তবুক অভিযান। এ অভিযান ছিলো বর্তমান সিরিয়া ও জর্ডান পর্যন্ত বিস্তৃত তৎকালীন বৃহৎশক্তি রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে।

অভিযানের রয়েছে পূর্ব ঘটনা। তাহলো, হুদাইবিয়ার সন্ধির পর রসূল সা. মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে গোটা আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে দাওয়াতি প্রতিনিধি দল পাঠান। এছাড়া সরদার ও শাসকদের কাছে পত্র মাধ্যমে দাওয়াত দিয়ে দূত পাঠান। সিরিয়া সীমান্তের কাছাকাছি তাঁর পনের সদস্যের একটি দাওয়াতি প্রতিনিধি দলকে খৃষ্টানরা হত্যা করে। প্রাণে বেঁচে আসেন শুধুমাত্র দলনেতা কাব বিন উমায়ের গিফারি। একই সময় রসূল সা. বুসরার গভর্নরের কাছে দাওয়াত নিয়ে পাঠিয়েছিলেন হারিস বিন উমায়েরকে। কিন্তু রোম সম্রাটের অনুগত এই খৃস্টান সরদার আল্লাহর রসূলের দূতকে হত্যা করে।

রোম সাম্রাজ্যের এসব অন্যায় ও অপরাধমূলক আগ্রাসি থাবা থেকে আরব অঞ্চলকে নির্বিঘ্ন করার উদ্দেশ্যে অষ্টম হিজরির জমাদিউল উলা মাসে রসূল সা. হযরত যায়েদ বিন হারেছার নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী সিরিয়া সীমান্তের দিকে পাঠান। কিন্তু এই সেনা দলটি মাআন নামক স্থানে পৌঁছে জানতে পারেন, বুসরার গভর্নর শুরাহবিল এক লাখ সৈন্য নিয়ে তাদের মোকাবেলা করার জন্যে এগিয়ে আসছে।

সামনে অগ্রসর হয়ে মুতা নামক স্থানে শুরাহবিলের এক লাখ সুসজ্জিত বাহিনীর সাথে তিন হাজার জিন্দাদিল মুসলিম এক অসম যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ব্যাপক হতাহত হয় শুরাহবিল বাহিনী। এ যুদ্ধে বারো জন মুসলিম সেনাও শহীদ হন। এই বারো জনের মধ্যে মুসলিম বাহিনীর তিনজন সেনাপতিও অন্তর্ভুক্ত। তারা হলেন যায়েদ বিন হারিছা, জাফর বিন আবু তালিব এবং আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

পরের বছর নবম হিজরিতে রোম সম্রাট কাইজার মুসলমানদের থেকে মুতা যুদ্ধের প্রতিশোধ নেয়া এবং তাদের অগ্রযাত্রা স্তব্ধ করার উদ্দেশ্যে সিরিয়া সীমান্তে ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতি নিতে থাকে। জানা যায়, তারা সীমান্তে দুইলাখ সৈন্যের সমাবেশ ঘটায়। আরব ভূ-খণ্ডের দিকে আর এক কদমও অগ্রসর হবার আগেই রসূল সা. তাদেরকে প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্ত নেন। এ অভিযান ছিলো ব্যাপক দূরত্বের অভিযান। ছিলো গরমের মওসুম, অর্থনৈতিক সমস্যা, ফসল পাকার মওসুম, সোয়ারীর অভাব। তা সত্ত্বেও রসূল সা. বৃহৎ শক্তির হামবড়া ভাব স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন।

নবম হিজরির রজব মাসে তিনি ত্রিশ হাজার জিন্দাদিল মুজাহিদকে সাথে নিয়ে রওয়ানা করেন সিরিয়া সীমান্তের দিকে। এদিকে রোম সম্রাট ত্রিশ হাজার মুসলিম সৈন্যের আগমনের সংবাদ পেয়ে বিচলিত হয়ে পড়েন। বিশ্বনবী সা. তবুক নামক স্থানে পৌঁছে সংবাদ পান কাইজার সিরিয়া সীমান্ত থেকে তার বাহিনী গুটিয়ে নিয়েছে।

ফলে সিরিয়া প্রবেশ না করে রসূল সা. বিশ দিন তবুকে অবস্থান করেন। আরব ভূ-খণ্ডে কাইজারের যেসব ছোট ছোট করদ রাজ্য ছিলো তিনি সেগুলোর সরদারদের উদ্দেশ্যে ছোট ছোট বাহিনী পাঠান। এতে করে তারা মদিনার ইসলামি রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। এভাবে আল্লাহ্ পাক স্বল্প সময়ের মধ্যে ইসলামের প্রভাব সিরিয়া সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেন।

সূরা ৯ আত তাওবার ৩৮-৭২ আয়াত তবুক যুদ্ধে যাত্রার প্রাক্কালে এবং ৭৩ থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত আয়াতগুলো তবুক থেকে ফিরে আসার পর নাযিল হয়। এ আয়াতগুলোতে তবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্যে উৎসাহ প্রদান এবং তবুক যুদ্ধের পর্যালোচনা করা হয়েছে। সূরা তাওবার এ আয়াতগুলো পড়লে এ যুদ্ধ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা যাবে।

২৮. বিদায় হজ্জ

হজ্জ ফরয হবার পর রসূল সা. একবারই হজ্জ করেন। আবার এ হজ্জেই তিনি সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। সে কারণে এ হজ্জকে বিদায় হজ্জ বলা হয়। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সা.-এর বিদায়ী হজ্জ।

দশম হিজরি সন। এ বছর বিশ্বনবী বিশ্বনেতা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. হজ্জ করার সিদ্ধান্ত নেন। তখন পর্যন্তকার গোটা মুসলিম মিল্লাতের কাছে ঘোষণা দিয়ে জানিয়ে দেয়া হয় রসূলুল্লাহর হজ্জে যাবার খবর। সব গোত্র ও কবিলার সামর্থবান মুসলিমরা হজ্জে যাবার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। চতুর্দিকে বইয়ে চলছে আনন্দের বন্যা।

দশ হিজরি সনের ২৬ জিলকদ তারিখে আল্লাহর রসূল সা. হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। ৫ জিলহজ্জ তারিখে মক্কায় পৌঁছেন। হজ্জ শেষে ১৪ জিলহজ্জ তারিখে ফিরে রওয়ানা করেন মদিনা অভিমুখে।

এ হজ্জ উপলক্ষে আল্লাহর রসূল সা. দুটি ভাষণ প্রদান করেন। একটি আরাফার ময়দানে এবং অপরটি মিনায়। তাঁর এ ভাষণ ছিলো ইসলামি রাষ্ট্রের মেনিফেস্টো।

এক লক্ষ চব্বিশ হাজার, কোনো কোনো বর্ণনায় এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার সাহাবী তাঁর সাথে হজ্জে শরিক হয়েছিলেন। তাঁর এ হজ্জই মুসলিম উম্মাহর জন্যে হজ্জের মডেল।

২৯. বিদায় হজ্জের ভাষণ

হজ্জ উপলক্ষে রসূলুল্লাহ সা. দু'টি প্রধান ভাষণ প্রদান করেছিলেন। একটি ৯ জিলহজ্জ তারিখে আরাফার ময়দানে। অপরটি ১০ জিলহজ্জ তারিখে মিনায়। এ দু'টি ভাষণে ইসলামের অনেকগুলো মৌলিক নির্দেশনা তিনি প্রদান করেছিলেন। তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো :

০১. আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোনো শরিক নেই। মুহাম্মদ তাঁর দাস ও রসূল।

০২. আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা কেবল এক আল্লাহর ইবাদত ও উপাসনা করবে।

০৩. তোমাদের প্রত্যেকের জীবন ও সম্পদ পরস্পরের নিকট পবিত্র ও সম্মার্হ। পরস্পরের জীবন ও সম্পদের ক্ষতি সাধন নিষিদ্ধ করা হলো।

০৪. আমানত তার প্রাপকের কাছে ফিরিয়ে দেবে।

০৫. সুদ প্রথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হলো।

০৬. জাহেলি যুগের সমস্ত কুসংস্কার রহিত করা হলো।

০৭. খুনের প্রতিশোধযুদ্ধ রহিত করা হলো।

০৮. ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। অনিচ্ছাকৃত হত্যার দণ্ড একশত উট।

০৯. তোমরা শয়তানের আনুগত্য করোনা।

১০. তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে। স্ত্রীদের উপর স্বামীদের অধিকার হলো তারা স্বামী ছাড়া আর কারো সাথে যৌনাচার করবেনা। স্বামীর অনুমতি ছাড়া তারা তার অর্থ সম্পদ খরচ করবেনা।

১১. স্বামীদের উপর স্ত্রীদের অধিকার হলো, তারা পবিত্র জীবন যাপন করলে স্বামী প্রচলিত উত্তম পন্থায় তাদের জীবন সামগ্রী প্রদান করবে।

১২. একজনের অপরাধের জন্যে আরেকজনকে দণ্ড দেয়া যাবেনা।

১৩. তোমাদের নেতা কোনো নাক বোঁচা হাবশি হলেও সে যদি আল্লাহর কিতাবের আনুগত্য করে, তবে তার আদেশ পালন করবে।

১৪. মুসলিমরা পরস্পর ভাই ভাই।

১৫. সমস্ত মানুষের স্রষ্টা একজন। সবার পিতাও একজন। সুতরাং কোনো মানুষের উপর অপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

১৬. তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান সে, যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু ও ন্যায়নীতিবান।

১৭. তোমাদের অধীনস্থদের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন হও। তাদের প্রতি অন্যায় করোনা। তাদের আঘাত করোনা। তোমরা যা খাবে, পরবে, তাদেরকেও তাই-ই খেতে ও পরতে দেবে।

১৮. বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

১৯. উত্তরাধিকার কে কতটুকু পাবে, স্বয়ং আল্লাহ তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং ওয়ারিশের জন্যে আর অসিয়ত করা যাবেনা।

২০. মনে রেখো, ঋণ অবশ্যি পরিশোধ করতে হবে।

২১. মনে রেখো, দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবেনা (দলাদলি ও কট্টরপন্থা অবলম্বন করবেনা)।

২২. আমার পরে আর কোনো নবী আসবেনা। আমি তোমাদের কাছে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতোদিন এ দুটোকে আঁকড়ে ধরে রাখবে, ততোদিন তোমরা বিপথগামী হবেনা। একটি হলো আল্লাহর কিতাব (আল কুরআন), আর অপরটি হলো তাঁর রসূলের সুন্নাহ।

যারা এখানে উপস্থিত আছো, তারা এ ফরমানগুলো অনুপস্থিতদের কাছে, পরবর্তীদের কাছে পৌছে দেবে।

৩০. মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর মৃত্যু সা.

কোনো নবী রসূলই চিরজীবী হননি। সবারই মৃত্যু হয়েছে। প্রতিটি মানুষেরই মৃত্যু অবধারিত। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. সম্পর্কেও মহান আল্লাহ বলেন: "(হে মুহাম্মদ!) তুমিও মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।" (আল কুরআন ৩৯: ৩০)

হজ্জ শেষে রসূল সা. জিলহজ্জ মাসের শেষার্ধেই মদিনায় ফিরে আসেন। এরপর মহররম মাস মোটামুটি ভালোভাবেই অতিবাহিত করেন। সফর মাস থেকে তাঁর অসুস্থতা দেখা দেয়। ১১ হিজরির ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে তিনি ইহজগত ত্যাগ করেন। দুনিয়া থেকে ইনতিকাল করেন আখিরাতের দিকে।

মৃত্যুর চার পাঁচদিন আগে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী লোকেরা ধরাধরি করে তাঁকে মসজিদে নিয়ে এসেছিল। সেদিন তিনি সাহাবীগণের মজলিসে সর্বশেষ একটি ছোট্ট ভাষণ প্রদান করেন। তাতে তিনি বলেন :

"তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবী ও পুণ্যবান লোকদের কবরকে সাজদার জায়গা বানিয়ে নিয়েছিল। তোমরা এমনটি করোনা। আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমার কবরকে সাজদা ও উপাসনার জায়গা বানিয়োনা। যারা নবী ও পুণ্যবানদের কবর পূজা করবে, তাদের উপর আল্লাহর গজব। আমি তোমাদেরকে একাজ করতে নিষেধ করছি। আমি তোমাদের কাছে সত্য বাণী পৌছে দিয়েছি। হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো।"

৩১. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর মৃত্যুর মাধ্যমে শেষ হয়ে গেলো নবী রসূল আগমনের সিলসিলা। পৃথিবীতে আর কোনো নবী রসূল আসবেন না। তাই মহান আল্লাহ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর মাধ্যমে দীন ইসলাম বা ইসলামি জীবন ব্যবস্থাকে কিয়ামত

পর্যন্ত সকল মানুষের উপযোগী করে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন। বিদায় হজ্জ উপলক্ষে আরাফার ভাষণের সময় মহান আল্লাহ অহি নাযিল করে এ সংক্রান্ত ডিক্রি জারি করেন। তিনি বলেন :

"আজ আমি তোমাদের জন্যে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম তোমাদের দীন (জীবন ব্যবস্থা), পরিপূর্ণ করে দিলাম তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত (কুরআন) এবং তোমাদের জন্যে দীন (ধর্ম ও জীবন ব্যবস্থা) মনোনীত করলাম ইসলামকে।" (আল কুরআন ৫:৩)

এছাড়াও মহান আল্লাহ্ কুরআন মজিদে আরো বলে দিয়েছেন :

১. "নিশ্চয়তই আল্লাহ্র কাছে দীন হলো ইসলাম।" আল কুরআন ৩:১৯

২. "যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন (ধর্ম, মতাদর্শ, জীবনপদ্ধতি) গ্রহণ করবে, তার থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না। আর আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" –আল কুরআন ৩:৮৫

৩. "আল্লাহ্ কাউকেও সঠিক পথে চলার তৌফিক দিতে চাইলে ইসলামের জন্যে তার হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দেন। আর তিনি যাকে বিপথগামী করতে চান, তার অন্তরকে করে দেন সংকীর্ণ। তখন তার কাছে ইসলামে প্রবেশ করাটা সিঁড়ি বেয়ে আকাশে উঠার মতোই কষ্টসাধ্য মনে হয়। যারা ঈমান আনেনা, আল্লাহ্ এভাবেই তাদের লাঞ্ছিত করেন।" –আল কুরআন ৬:১২৫

৪. "আল্লাহ্ যার হৃদয় উন্মুক্ত করে দেন ইসলামের জন্যে এবং যে রয়েছে তার প্রভুর প্রদত্ত আলোর মধ্যে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য, যার অবস্থান এ রকম নয়?" – আল কুরআন ৩৯:২২

৫. "ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় যালিম আর কে, যাকে ইসলামের দিকে ডাকা হলে সে মিথ্যা রচনা করে আল্লাহ্র প্রতি আরোপ করে?" – আল কুরআন ৬১:৭

৬. "আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে একটি আলোকবর্তিকা (রসূল মুহাম্মদ সা.) এবং একটি সুস্পষ্ট কিতাব (আল কুরআন)। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ সেইসব লোকদের সালামের (ইসলামের, শান্তির, নিরাপত্তার) পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তোষ লাভের আকাঙ্ক্ষী। আর তিনি নিজ অনুমতিক্রমে তাদের বের করে আনেন অন্ধকাররাশি থেকে আলোতে এবং তাদের পরিচালিত করেন সরল সঠিক পথে।" –আল কুরআন ৫:১৫-১৬

সমাপ্ত

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. আল কুরআন
২. মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি : আল মু'জাম আল মুফাহ্হারাস লিআলফাযিল কুরআনিল কারিম
৩. মুহাম্মদ ইবনে জরির আত্ তাবারি : তফসিরে তাবারি
৪. ইসমাঈল ইবনে উমর ইবনে কাছির : তফসিরে ইবনে কাছির
৫. জালালুদ্দিন সুয়ুতি ও জালালুদ্দিন মাহেল্লি : তফসিরে জালালাইন
৬. মুহাম্মদ শফি : মা'আরিফুল কুরআন
৭. আশরাফ আলী থানবি : বয়ানুল কুরআন
৮. আবুল আ'লা মওদূদী : তাফহীমুল কুরআন
৯. সাইয়েদ কুতুব : ফি যিলালি কুরআন
১০. সহীহ্ আল বুখারি
১১. সহীহ্ মুসলিম
১২. জামে তিরমিযি
১৩. শামায়েলে তিরমিযি
১৪. মিশকাতুল মাসাবিহ্
১৫. ইসমাঈল ইবনে উমর ইবনে কাছির : আল বিদায়া ওয়ান নেহায়া
১৬. আবদুর রউফ দানাপুরি : আহ্হুস্ সিয়ার
১৭. ইবনুল কায়্যিম : যাদুল মা'আদ
১৮. মুহাম্মদ ইবনে আছির : আত্ তারিখ ফিল কামিল
১৯. মুহাম্ম হুসাইন হাইকল : হায়াতু মুহাম্মদ
২০. আবদুল মালেক ইবনে হিশাম : সীরাতুন নবুবিয়্যা
২১. তওফিক আল হাকিম : মুহাম্মদ
২২. শিবলি নুমানি : সীরাতুন্নবী
২৩. মুহাম্মদ হিফযুর রহমান : কাসাসুল কুরআন
২৪. মুহাম্মদ আলী আস্ সাবুনি : হায়াতুল আম্বিয়া
২৫. আবুল আ'লা মওদূদী : সীরাতে সরওয়ারে আলম
২৬. নঈম সিদ্দিকী : মুহ্সিনে ইনসানিয়াত
২৭. মুহাম্মদ ইবনে সাআদ : আত্ তাবকাতুল কবির
২৮. কাজি সুলাইমান মনসুরপুরি : সাইয়্যেদুল বাশার
২৯. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ : সীরাত বিশ্বকোষ।

শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোন: ৮৩১৭৪১০, ০১৭৫৩ ৪২২২৯৬
E-mail : Shotabdipro@yahoo.com